বরণীয় বিজ্ঞানী স্মরণীয় আবিষ্কার

বীরু চট্টোপাধ্যায়

বরণীয় বিজ্ঞানী স্মরণীয় আবিষ্কার

বীরু চট্টোপাধ্যায়

বর্ণালী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

১

। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রহস্যময় নরঘাতক ।

রাত্রির বাতাসে নেমে এসেছে মৃত্যু-নিস্তব্ধতা। সানফ্রান্সিস্কো নগরী থেকে ঢিল ছোঁড়ার তফাৎ-এ সেই গোট আইল্যাণ্ড দ্বীপের কাঠের জেঠিতে বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সেণ্ট্রিরা প্রহরায় রত।

গ্রীষ্মের কুয়াশা, যা বছরের পর বছর সানফ্রান্সিস্কো নগরীর আকাশকে কম্বলের মত আবৃত করে রাখে, সেই কুয়াশা গোল্ডেন গেট-এর ভেতরেও পাকিয়ে পাকিয়ে প্রবেশ করছে। গোট আইল্যাণ্ডে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল ট্রেনিং স্টেশানের দুজন সেণ্ট্রিগার্ডের মুখমণ্ডল সাদা গেজ মুখোশে আবৃত। সেই মুখোশে ঢাকা পড়েছে তাদের মুখ এবং নাসিকা গহ্বর, শুধু বেরিয়ে আছে তাদের ভীতি-বিহ্বল চোখ দুটি।

প্রতি তিরিশ মিনিট অন্তর তারা দাঁড়িয়ে পড়ে, পকেট ফ্লাস্ক বের করে, তার ভেতরকার তরল পদার্থ নিজ নিজ হাত এবং রাইফেল বাট্-এ সিঞ্চন করছিল। তরল পদার্থটি কিন্তু কোনপ্রকার মদ্য নয়, ওটা হল শক্তিশালী একপ্রকার বীজাণু-নাশক ঔষধ।

—জলে যেন বৈঠার শব্দ পাচ্ছি, টম, একজন সেণ্ট্রি, যার নাম হাস্কিন, সে বলে ওঠে সঙ্গীকে। বৃথাই নজর করবার চেষ্টা করে কিন্তু গভীর কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। তাই সেই অদৃশ্য শব্দ লক্ষ্য করে সে চীৎকার করে ওঠে,

—হল্ট! কে যায় ওখানে? কাছে আসবার চেষ্টা করবে না খবরদার, তাহলেই গুলি করব।

শুনে মুহূর্তের জন্য বৈঠার শব্দ থেমে গেল। তারপর আবার শুরু হল বৈঠাধ্বনী ছপাং ছপাং……। কুয়াশার দুর্ভেদ্য আস্তরণের ভেতর দিয়ে সেণ্ট্রিদের কানে ভেসে এল মেয়েদের খিল খিল হাসি আর পুরুষদের মোটা গলায় হাঃ হাঃ।

সেণ্ট্রি টম তৎক্ষণাৎ একটা মেগাফোন হাতে তুলে নিয়ে সরবে বলে উঠলো :

—এই! যেই হও তোমরা। দৃষ্টি সীমার মধ্যে এলেই গুলি করব। আমাদের প্রতি এই অর্ডার রয়েছে। তোমরা জানো গোট আইল্যাণ্ড এখন অফ লিমিট্-এর আওতায়। আমরা ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে মরতে রাজি নই। কেটে পড়ো। তফাৎ যাও।

নরনারীতে পূর্ণ নৌকোটি যখন প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তখন সেখান থেকে ভারী গলায় একজন বলে উঠলো, শোন, শোন হে নাবিক বন্ধু। এই আইল্যাণ্ডে আমরা প্রায় বন্দী জীবনযাপন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাই নিজেদের কিছু চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে 'ফ্রিস্কো' থেকে কয়েকটি মেয়ে নিয়ে এসেছি ভায়া। আমরা একটা পার্টির আয়োজন করব। স্পোর্টম্যান হও, আমাদের নামতে দাও তীরে।

ত্রাসাক্রান্ত কণ্ঠে, রাইফেল তাক করে দ্বীপের সেন্ট্রি সচিৎকারে বলে উঠলো, তোমরা জানো আমাদের প্রতি কি নির্দেশ রয়েছে। তোমরা কি ঐ ছুঁড়িদের নিয়ে মরতে চাও? গুলি খেয়ে সব্বাইকার সলিল সমাধি হয়ে যাবে হে। সারাদেশ যখন স্প্যানিশ ফ্লুতে একের পর এক মরে যাচ্ছে তখন তোমরা চাইছ কোয়ারান্টাইন বিধিনিষেধ ভঙ্গ করতে?

—আহ্ ব্রাদার। চেপে যাও। আজকের রাতের মত একটু স্ফূর্তি করতে চাই **That's all we want.**

কুয়াশার আবরণ ভেদ করে রাইফেল গর্জে উঠলো।

নৌকো থেকে লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো, ও গড্, লোকটা গুলি করেছে। চেয়ে দেখ আমার বাহু। উন্মাদ বোকাটা গুলি করে দিয়েছে রে, উঃ! হার্ব, রোজ, হেলেন, সিগ্‌গির তোমরা বৈঠা ধরো। ওরা পাগলা হয়ে গেছে। এখুনি আমায় ফিরে গিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

নৌকোর অপর একজন নাবিক আর রঙচঙ মাখা যুবতী দ্রুত বৈঠা চালিয়ে ফিরতি পথ ধরলো। এদিকে তীরে গুলির শব্দ শুনে জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট দৌড়ে জেঠিতে এসে সেন্ট্রিদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলো। ঠিক করেছ, উপযুক্ত কাজই করেছ, মুখোশ ঢাকা মুখ নিয়ে অফিসারটি বলে ওঠে।

—পারফেক্টলি রাইট কাজ করেছ তোমরা। কয়েকজন অপরিণামদর্শীর মেয়ে নিয়ে হুল্লোড় করবার বদামিতে আমরা ফ্লুতে ভুগে অকালে মরবো নাকি! আবার যদি ওরা ফিরে এসে এগুতে চায় তো ওদের শেষ করে দেবে। জাস্ট শুট্ টু কীল! আমি এই অর্ডার দিয়ে গেলাম।

এটা হল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রেট ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ২০৬-তম দিবস।

বিশ্বময় এই ভয়াল "স্প্যানিশ ফ্লুতে" ইতিমধ্যেই আড়াই লক্ষের উপর আমেরিকান নরনারী শিশুর প্রাণ নিয়ে নিয়েছে। এছাড়া আরও ২২,০০০,০০০ জন মানুষ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-পথে ধুঁকছে।

জার্মানদের পশ্চাদপসরণ শুরু হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় সমাপ্তির পথে। বস্তুত-পক্ষে লড়াইয়ে যতটা নয় তার চেয়ে কম মৃত্যু হয়নি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোনিয়ায়, উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই। যুদ্ধ থেমে আসার কারণও অনেকাংশে তাই!

ইতিহাসের কুখ্যাত সেই 'ব্ল্যাক প্লেগ' যা প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী চলেছিল, সেটাও এই 'ফ্লু' মহামারীর কাছে নগণ্য বলে মনে হয়।

এই ১৯১৮-র এপিডেমিক ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে একদা যখন শেষ হল, ততদিনে বিশ্বের ৩৮টি দেশের ২ কোটি ১০ লক্ষ লোক এর কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে গেছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই, বিশ্বব্যাপী মৃত্যুযজ্ঞ থেকে আমেরিকা উপকূলের ১৬০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ট্রিস্টান ডি কুনহা নামক বিন্দুসম একটি দ্বীপের অধিবাসীরা এই মারক রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

অথচ, এমন কি আফ্রিকার জঙ্গলে হাজার হাজার বেবুন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছের ডালেই এক সময় নীলবর্ণ ধারণ করে মরে গিয়ে ভূমিস্যাৎ হয়েছিল।

প্রথমোক্ত গোট আইল্যাণ্ডের নেভাল স্টেশানের ক্যাপ্টেন প্রথমে টেলিফোনে নিম্নোক্ত নিদারুণ খবর পায়ঃ

এক রাত্রির মধ্যেই নতুন ২১ হাজার মানুষ বাল্টিমোর নগরীতে ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছে। ওহিওতে ৬০০ মৃতদেহ ঝটিতি একটা গর্তে ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে ৮০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছে।

মার্কিন দেশের বড় বড় আর্মি ক্যাম্পের অবস্থা নিদারুণভাবে ভয়ংকর। ক্যাম্প ডজ ও আইওয়াতে ৮০০০ সৈনিক এই রোগে পড়ে ২০০০ বেড-এর এক হাসপাতালে গরু-ছাগলের মত ঠাসাঠাসি শুয়ে ধুঁকছে। ক্যাম্প মেডি, মেরিল্যাণ্ডে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ১৫০০ করে মানুষ ফ্লুতে পড়ছে। প্রায় ১১,০০০ সৈনিক মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়ছে এই কালান্তক রোগে।

ফ্রান্স থেকে কেবল এর মাধ্যমে নতুন সৈন্য চেয়ে পাঠানোর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পাঠাবার মত সৈন্যেরা সবাই জ্বরাক্রান্ত, অধিকাংশ মারা পড়েছে, বাদ-বাকিরাও মরণোন্মুখ অবস্থায়। কাইজারের সৈন্যরা যা পারেনি, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি ক্ষতি করে দিল ফ্লু মহামারী মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের।

গোট আইল্যাণ্ডের ক্যাপটেন, সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরে অবস্থিত ঐ দ্বীপকে এ রোগের হাত থেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হল। মূল ভূখণ্ড থেকে যাবতীয় অফিসার ও সাধারণ নেভাল ক্যাডেটদের ডেকে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হল দ্বীপে। ৪০০০ লোকের ওপর পরিপূর্ণ কোয়ার‍্যান্টাইনের আদেশ জারি করা হল।

ক্যাম্পের মেডিকাল স্টাফ নিম্নোক্ত নির্দেশজারি করলো ঃ

—ব্লো-টর্চের দ্বারা প্রতিটি পানীয় জলের ঝর্ণাকে এক ঘণ্টা অন্তর নির্বীজনের ব্যবস্থা করুন।

—প্রতিটি কল করবার পূর্বে অ্যালকোহল দিয়ে টেলিফোনের মাউথ-পীস্ মুছে নিন।

—নতুন ট্রেনিরা পরস্পরের কাছ থেকে ২৫ ফিট দূরত্বে থেকে তবেই মার্চ

করবেন। খাবার সময় পরস্পরের দূরত্ব কমপক্ষে ৩০ ফিট হতেই হবে।

—সিলভার নাইট্রেট দিয়ে দিনে দুবার গার্গল করতে হবে। বীজাণুমুক্ত থাকবার জন্যে গেজ মুখোশ সর্বসময় পরে থাকতে হবে। ফ্লু বীজাণু যাতে হাত থেকে হাতে গিয়ে সক্রামিত না হতে পারে সেজন্যে টাকা পয়সা ব্যবহার নিষিদ্ধ, বইয়ের লাইব্রেরীও বন্ধ থাকবে।

ফেরি-বোট, টাগ ও সরবরাহকারী লঞ্চের নাবিকদের প্রতি নির্দেশ গেল, তারা যেন দ্রুত মাল নামানোর মিনিট খানেকের মধ্যেই দ্বীপের জেঠি ত্যাগ করে দ্রুত চলে যায়। হাইজিনিক মুখোশ-পরা সেন্ট্রিদল তাদের পিস্তল, আগত ষ্টিভেডর ও ক্রুদের প্রতি বাগিয়ে ধরে সর্বক্ষণের জন্য পাহারায় থাকবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত এক মুহূর্ত সময়ও যেন ঐসব সম্ভাব্য বীজাণুবাহী মাঝি-মাল্লার দল এ-দ্বীপের জেটিতে না থাকে এটা সেন্ট্রিরা কঠোরভাবে নজর রাখবে।

সানফ্রান্সিস্কো বা ওকল্যাণ্ড থেকে লঞ্চ-এ মাত্র দশ মিনিটের পথ এই দ্বীপ। যে-সব নাবিকরা বিবাহিত কিংবা যাদের প্রণয়িনী বর্তমান, এই বিচ্ছেদ নির্দেশে খুবই চটে গেল সন্দেহ নেই। অপর দিকে সানফ্রান্সিস্কো বন্দরের গণিকাবৃন্দ, যারা ওই সব নাবিকদের ক্ষণ আনন্দ দিয়ে পয়সা রোজগার করতো, তারাও এই সম্ভাবনার ছেদকারী নির্দেশে খুবই কুপিত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

যে-সব নাবিকরা মদ ও মেয়েমানুষ এই নিষিদ্ধ দ্বীপে স্মাগল করে আনতে গিয়ে ধরা পড়লো তাদের নেভাল কোর্টে বিচার শেষে কঠোর দণ্ডদান করা হতে লাগলো।

আফ্রিকার কঙ্গোতে উইচ-ডক্টররা তাদের স্বজাতিকে এই সহসা আক্রান্ত হওয়া রোগ, যা কিনা অকস্মাৎ মানুষজনকে নীল করে ফেলে, তাদের শ্বাসকষ্ট হয়, হাত-পা পক্ষাঘাতে অসাড় আর ফুসফুস ভর্তি হয়ে যায় শ্লেষ্মাতে এবং অচিরেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই রহস্যজনক ভয়াল রোগ থেকে সকলকে বাঁচাবার জন্য অপদেবতার কাছে অহোরাত্র প্রার্থনা শুরু করে দিল।

ইংল্যাণ্ডের লিভারপুলে জনৈক ধনী ব্যক্তি ১০,০০০ পাউণ্ড খরচা করে দ্রুত একটি কাচের বড় ঘর তৈরী করিয়ে নিলেন তাঁর পরিবারবর্গের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। নাম, 'স্যানি শেলটার'। নিশ্ছিদ্র সেই কাচের ঘরে রইল বৃত্তাকার গজ-আবৃত এক জানালা বাতাস ঢোকবার জন্য। এত সতর্কতা সত্ত্বেও সেই কাচের বাসরে ফ্লু-ঢুকে গেল চুপিসারে এবং সেই ধনী ভদ্রলোক ও তাঁর দুটি শিশুসন্তানকে নিয়ে গেল ইহলোক থেকে।

বিলি সানডে নামক প্রখ্যাত একজন ইহুদি যাজক একটি তাঁবুর মন্দির করে তাতে প্রতি রাতে, "মহামারী প্রশমনার্থে" সারমনযোগে প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগলেন আমেরিকাকে এই "ফ্লু ডেভিলের" হাত থেকে বাঁচাবার মানসে। কিন্তু তাতেও কোন ফল দর্শালো না। মৃত্যুর হার যথারীতি ক্রমবর্ধমানই রয়ে গেল।

আইওয়ার ডেস ময়ইন্স শহরের রাস্তায় কাইজারের গুপ্তচর বলে সন্দিগ্ধ জনৈক জার্মান কশাই ফ্লু-বীজাণু ভরা অ্যামপুল ছড়াবার অভিযোগে ধৃত হল। ক্রুদ্ধ জনতা তার গায়ে গরম আলকাতরা মেখে তাতে পালক ছড়িয়ে দিল। এ-ঘটনায় সে হার্ট অ্যার্টাকে মারা গেল।

স্বাস্থ্যরক্ষার চরম সাবধানতাও বিফল হল।

সিয়েটল-এর পুলিশেরা ট্র্যাফিক ডিউটিকালিন মুখোশ পড়তে লাগলো আর প্রতি ঘণ্টায় গার্গল করতে থাকলো। শিকাগোতে সেনাদল থিয়েটারসমূহ বন্ধ করে দিল। একসঙ্গে বেশি লোকের জমায়েত যাতে পরস্পরকে সংক্রামিত না করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। বহু নগরীতে রাস্তায় থুতু ফেলা ১০০ ডলার জরিমানা বা ৩০ দিন জেলের দণ্ড যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হল।

কিন্তু এ-ধরনের কোন সাবধানতাই ঐ ভয়াবহ রোগকে তার চরম ধ্বংসসাধন থেকে রুখতে পারলো না। মেডিকাল ইতিহাসের তুলনাহীন এই বিপর্যয় অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। দিনেরপর দিন অকল্পনীয় এই রোগ বেড়ে বেড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শহরের যাবতীয় অধিবাসী একই সঙ্গে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গেল। এবার এই রোগ নদী-প্রান্তর ধ্বসিয়ে দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিল। পৌঁছলো গিয়ে অপরাপর মহাদেশে। সমুদ্রগর্ভের সুদূর নিরালা বিন্দুসম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎ-কর দ্বীপের বাসিন্দারাও রক্ষা পেল না এই হানাদারের হাত থেকে।

নিজেদের "মডার্ন প্রফেট অফ দ্য-ডুম" আখ্যা দেওয়া লজএঞ্জেলসের একদল লোক শোকের কালো পোষাক পরে আর হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নিরবে সেখানকার স্প্রিং স্ট্রীট দিয়ে মিছিল করে গেল।

প্ল্যাকার্ডে লেখাছিল :

"সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে প্রস্তুত হোন। ফ্লু-এর দ্বারা পৃথিবী ধ্বংসের শেষ দিনটি আগত প্রায়।"

এটা দেখে কেউ কিন্তু হাসলো না। শিউরে শিউরে উঠে পথচারীরা দ্রুত যে যার পথে চলে গেল।

অনেকে মিছিল থেকে কিছু দূরে যেতে না যেতেই ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পথেই বসে পড়লো। দিন শেষ হবার পূর্বেই মিছিলের তথাকথিত আট জন "প্রোফেট" প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়ে ফুটপাতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রায় জয় হতে চলেছে। কিন্তু সেজন্য কারুর মনেই কোন আনন্দ নেই। সমস্তজাতি শংকিত ত্রাসে অপেক্ষা করে আছে বুঝি পৃথিবীধ্বংসের শেষ ক্ষণটির জন্য।

সব মহামারীরই একটা কারণ থাকে এবং শুরু থাকে। কোন কিছু একটা অবশ্যই এর সর্ব প্রথম ইন্ধন জোগায়। যুগের পর যুগ ধরে রিসার্চার এবং বিজ্ঞানীরা

মাথা ঘামিয়ে গেলেন ১৯১৮-র এই অভাবিত ফ্লু মহামারির কারণ নির্ণয়ে।

অবশেষে কারণ হিসেবে, উৎপত্তিস্থল হিসেবে তাঁদের সন্দিগ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশিত হল একটি বিশেষ স্থানের প্রাত।

স্থানটি হল ক্যানসাসের ফোর্ট রিলে। ইউ. এস. ক্যাভালরির প্রেইরি অঞ্চলের নোংরা ধূলি-ধূসর স্থানে অবস্থিত এক আউটপোষ্ট সেটা। কুড়ি হাজার একর পরিমাণ স্থানে ছড়ানো ছিটানো অট্টালিকা ও তাঁবুসমূহ, মানুষজন, ঘোড়ার পাল ও তাদের পুরীষআকীর্ণ অতি অপরিচ্ছন্ন জনপদ।

এক ৯ই মার্চ, শনিবার সহসা সেখানে উঠলো এক প্রবল ধূলি ঝড়। তৎক্ষনাৎ শুরু হয়ে গেল হুড়ো-হুড়ি, তাঁবুর দড়ি এবং খুঁটি আরো টাইট করা হল। আকাশ কালো করা সেই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে লোকজন যে কোন চালের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রবল তুফানে গাছ-পাছড়া ঝোপ-জঙ্গল মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো।

ব্যারাকসমূহের অভ্যন্তরে জড়ো হওয়া হাজার হাজার ক্যাভালরি, ইনফ্যান্ট্রি সেনা, ইঞ্জিনিয়ার, হাসপাতালকর্মী, রুটিওয়ালা, কশাইগণ প্রচুর পরিমাণ ধূলো-বালি নোংরা নাকে মুখে ঢুকে যাওয়ার দরুণ প্রবলভাবে হাঁচতে কাশতে শুরু করে দিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো কখন এই সর্বনাশা চরাচর আবৃত বাদামী ধূলোঝড় এবং প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ তুফান থেমে যাবে।

হাজার হাজার ঘোড়া ও খচ্চরের পাল তাদের আস্তাবলের মধ্যে-লাফালাফি করতে করতে দারুণভাবে হাঁচতে লাগলো।

অবশেষে এক সময় ঝড় থেমে যেতে জনৈক সার্জেন্ট তার সাথীকে বলে উঠলো, হে লুই, দ্যাখ দ্যাখ এখানকার পশু-বিষ্ঠা সব উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে ঝড়ে। তোদের আর আজ ক্লিন-আপ ডিউটি করতে হবে না

কথাটা সত্যি। প্রায় ৯ হাজার টন শুষ্ক সার ও পশু-বিষ্ঠা, যার কিছু অংশ-স্বাস্থ্যের তাগিদে পুড়িয়ে ছাই গাদা করা হয়েছিল, সমস্ত কিছু উড়ে গিয়ে দিক বিদিকের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা খুশি, দুর্গন্ধভরা যাবতীয় জঞ্জাল প্রবল ঝড় তাদের শহর থেকে বেমালুম উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু একজন অফিসার বুঝি খুশি হতে পারলো না।

সে হল মেডিকাল কর্নেল এডওয়ার্ড শ্রিনার। প্রায়শই তাঁর ভয় হত কখন যে এই আউটপোস্টের ২৬ হাজার মানুষের মধ্যে মহামারী লেগে যায়! এ সম্ভাব্যতায় তার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। ১১-ই মার্চ সোমবার অ্যালবার্ট নামক জনৈক কোম্পানী কুক সকাল ছটায় অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার মতে প্রবল সর্দিতে সে আক্রান্ত হয়েছে। মাথায় যন্ত্রণা, গলা জ্বালা, আর সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। এর আধঘন্টা বাদে কর্পোরাল ড্রেককেও নিয়ে আসা হল একই ধরনের উপসর্গসহ। বেলা দশটার মধ্যে আরও দুজন একই

ধরনের রোগী এসে ভর্তি হতে মেডিকাল কর্নেল এবার আরও বেশি উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু সে দুপুরের মধ্যেই দুশ্চিন্তায় পাগল হবার দাখিল হল, যখন পর পর লাইন দিয়ে ১০৭ জন রোগী এসে হাসপাতাল ভর্তি করে দিল। মনে হল কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যেন ফ্লুর মহামারী লেগে গেছে এই আউটপোস্টে।

মেডিকাল কর্নেল বুঝলেন, শনিবারের সেই প্রবল ধূলিঝড়ই এ-রোগের জন্ম দিয়েছে। হাজার হাজার টন পরিমাণ ধূলি জঞ্জাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সে-সব স্থানে ইতিমধ্যে কি হয়েছে ঈশ্বর জানেন।

ছ'দিনের মধ্যে ৫২২ জন এই ধরনের রোগীকে চিকিৎসা করা হল বেস্-ক্যাম্প-হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অপরাপর আর্মি ক্যাম্প থেকে ভয়াবহ বুলেটিন আসতে লাগলো ঃ

"অকল্পনীয় দ্রুততায় ফ্লু-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ঘন্টায় ঘন্টায় বেড়ে চলেছে। এজঘন্য রোগের উৎপত্তিস্থল ফোর্ট রিলেতে এক মাসের মধ্যে ১১২৭ জন আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৬ জন সৈন্য নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।"

দেশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে এল এক বিচিত্র সংবাদ। দেশের প্রখ্যাত কারাগার স্যান কুয়েন্টিনে বন্দী ১৯০০জন আসামীর মধ্যে ৫০১ জন এরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মাত্র তিনজন মারা গেছে। জেল-এর গার্ডেরা জানিয়েছে দুদিন আগে তাদের নজরে পড়ে বিরাট আকারের আকাশ ছাওয়া এক বাদামী রঙের মেঘ ঠিক কারাগার অঞ্চলের মাথার ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারপরেই শুরু হয়েছে এই বিদঘুটে রোগাক্রমণ।

ফোর্ট রিলেতে সেনারা এবার নিত্য জমে যাওয়া পুরিষ-বিষ্ঠা-সার-এর পাহাড় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগলো। আকাশ কালো হয়ে গেল সেই ধোঁয়ায় যতক্ষণ না বাতাস এসে সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল অন্য স্থানে।

ডিভিসন নং ৯২ সেনাদল গিয়ে জাহাজ থেকে নামলো ফ্রান্সে। সেনারা তীরে নামবার পর থেকেই সেই রণস্থলে শুরু হয়ে গেল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই ডিভিসন চাওমন্ত নামক স্থানে তাঁবু ফেলবার ১১ দিনের মধ্যেই সেখানে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩২-এ।

রণাঙ্গণের জরুরী চাপ থাকায়, আর্মি সার্জনরা শত শত ফ্লু ও নিউমোনিয়া রোগীর ব্যাপারে তেমন কিছু উদ্বিগ্ন হল না।

কিন্তু অচিরেই মার্কিন সৈন্যদের সংস্পর্শে এসে হাজার হাজার ফরাসী ও অন্যান্য মানুষজন সংক্রামিত হয়ে পড়লো এ-রোগে।

দ্রুত ব্রিটিশ টমিরা পড়ে গেল জ্বরে। শিঘ্রই রয়াল নেভির ১০,৩১৪ জন জলসেনা শয্যাশায়ী হয়ে গেল। ১০৫-এর ওপর জ্বর, মাংসপেশির আক্ষেপ,

মুখাবয়ব হয়ে গেল রক্তলাল। জ্যামিতিক হিসেবে মৃত্যুসংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। সুস্থ সমর্থ বলিষ্ঠ কোন সেনা হয়ত রাত দশটায় জ্বরে পড়লো, কিন্তু সকালেই সে নীলবর্ণ মৃতদেহে পরিণত হয়ে গেল। রোগের এহেন ভয়ংকর তীব্রতা দেখে ডাক্তারদের মাথা খারাপ হয়ে গেল।

কাইজারের সেনাদল বেতারে প্রাপ্ত এই রোগের সংবাদ প্রথমটা আদৌ বিশ্বাস করেনি। মিত্রপক্ষীয় সেনারা দলে দলে রোগে পড়ে ট্রেঞ্চ ছেড়ে হাসপাতালে বিছানা নিচ্ছে এসব সংবাদকে তারা তাদের ভড়কি দেবার এক রণকৌশল বলেই ভেবে নিয়েছিল। আরও ভেবেছিল আমেরিকানদের ভীরুতার ও দুর্বলতার কথাকে চাপবার জন্যে এই প্রচার চালানো হচ্ছে।

কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের হাসি অনতিবিলম্বেই এক ফুঁয়ে নিভে গেল। যখন দেখলো এক সপ্তাহের মধ্যে বার্লিনে এক লক্ষ ষাট হাজার নরনারী এতে অসুস্থ হয়ে পড়লো। আর এক সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ১৪০০ তে। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা এই "ব্লিৎস কাটারাহ"-কে রোখবার জন্য সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা নিতে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে ফেললো।

বার্লিনের রাস্তায় চলা যাবতীয় গাড়ি অচল হয়ে গেল। চালাবে কে? অধিকাংশ মোটরমেন রোগাক্রান্ত হল আর বাদবাকিরা কাজে এল না। জেনা, স্ন্যাটসবুর্গ, বন এবং কলোন-এ মহামারী ছড়িয়ে পড়লো। রোম-এ দেড় লক্ষ ইতালীয় বিছানা নিল। এর মধ্যে ৩০০০ জন আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। তারা দ্রুত ও বেদনাদায়কভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ইতালীরা এ রোগের নাম দিয়েছিল—"স্যাণ্ডফ্লাই ফিভার"।

সুইস-আর্মির আর অস্তিত্বই রইল না যখন তাদের শেষ সৈনিকটিও নিউমোনিয়া জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বিছানা নিল। যুদ্ধকালিন পরিস্থিতি ও পরিবেশ ফ্লু-বীজাণু সংক্রমণের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়ে গেল।

প্রায় দশলক্ষ সৈন্যরা সে সময় ক্ষুধার্ত, অপরিচ্ছন্ন ও দারুণ ক্লান্ত। ইউনিফর্ম নোংরা, ঘুম বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নেই।

জানিত সব কিছুর থেকেও এই রহস্যময় ফ্লু-র ভয়ংকর বীজাণু লক্ষ কোটি অর্বুদ সংখ্যায় বাড়তে লাগলো ট্রেঞ্চে, সেসপুল-এ, মলমূত্রাগারে এবং সৈন্যাগারে।

যেদিন অর্থাৎ ২৬শে জুন যখন এরোগ গিয়ে হানা দিল সুদূর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে, তখনই বোঝা গেল এ মহামারী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে এর বিষাক্ত-কালো ডানা। হাওয়াইর স্কুফিল্ড ব্যারাকে ৩৭০ জন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো, মারা গেল ২৩ জন। গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি জাপানও শুয়ে পড়লো তাদেরই নামাঙ্কিত "রেস্লার ফিভার"-এ। ফ্লু নিপ্পণ ইম্পিরিয়াল নেভিকে আউট অফ কমিশন করে ছাড়লো। চীন থেকে খবর এল সেখানেও এই মারক রোগ (চুংকিং ফিভার) তাদের একটিমাত্র প্রদেশ থেকেই ১০ লক্ষ লোককে পরলোকে পাঠিয়ে ছেড়েছে।

এমন কি ইংরেজদের দুর্গ জিব্রালটারের যাবতীয় বানরেরা এ-অসুখে আক্রান্ত হয়ে পালে পালে মরে গেল। ব্রিটিশরা গোপনে বাইরে থেকে প্রচুর বানর দিয়ে এল জিব্রালটারে মৃত বানরদের স্থলে। এর কারণ হল প্রাচীন এক ভবিষ্যদ্বাণী। তাতে নাকি বলা হয়েছে যে, যেদিন জিব্রালটারের শেষ বানরটি মরে যাবে, সেদিন থেকে জিব্রালটার ইংরেজদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

চিন্তিত আমেরিকা বোস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও নিউ অর্লিয়েন্স বন্দরে আগত জাহাজসমূহকে ফোমিং করে নির্বীজন করতে লেগে গেল। কিন্তু ১২ই আগস্ট একটি মৃত্যুবাহী জাহাজ লোক-চক্ষুর অগোচরে সরাসরি এসে নিউইয়র্কের লোয়ার বে দিয়ে ব্রুকলীনের বিশাল আর্মি বেস-এ এসে নোঙর করে। জাহাজটি হল নরওয়ের 'বার্জেন ফিয়র্ড'। তার গম্ভীরমুখী স্কিপার পার অ্যালবার্টসেন বন্দর কর্তৃপক্ষকে বলে ঃ

—এটা একটা নিদারুণ ক্রশিং আমার পক্ষে। জাহাজে ২০২ জন রোগাক্রান্ত যাত্রী ছিল। তাদের ৩০ জন মারা গেলে তাদের সলিল সমাধি দেওয়া হয়। ক্রুরা করিডোর এবং সেলুনের সর্বত্র ক্রিয়োসোট এবং অ্যামোনিয়া স্প্রে-করে দেয়। তবু-ঘন্টায় ঘন্টায় নতুন সংক্রমণ হতে থাকে। যাত্রীরা নিদারুণভাবে ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়ে। একজন যাত্রী যেই দেখে যে-তার-ফ্লু হয়েছে সে তখন ক্ষেপে গিয়ে নিজের কব্জি ক্ষুর দিয়ে কেটে ফেলে। রক্তক্ষরণে সে প্রায় মরতে বসেছিল আর কি। এটা একটা বিশ্বগ্রাসী-মহামারী ভদ্রমহোদয়গণ। ব্যাপারটা এতই ভয়ংকর যে, এ-বিষয়ে কোন কথা বলতেও আর সাহস হয় না।

এর তিন দিন বাদে ইউ. এস. আর্মি জাহাজ 'ওলিম্পিক' গিয়ে নোঙর করে ইংল্যাণ্ডের সাউদাম্পটন বন্দরে জাহাজভর্তি ২৩০০ আমেরিকান গুরুতর অসুস্থ যাত্রী নিয়ে। পথে ১১৯ জন মাঝ সমুদ্রে মারা যায়। এমারজেন্সি কাঠের খাট তৈরী করতে করতে জাহাজের ছুতোরকে দিবারাত্র কাজ করে যেতে হয়। ঠাসাঠাসি ভীড়ের সামরিক যাত্রীরা ভীতি-বিহ্বলভাবে প্রত্যক্ষ করে কিভাবে সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকে সারা জাহাজে মহামারীর দাবাগ্নি দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে যায়। এর কোন শেষ ছিল না। একে রোখবার জানিত কোন উপায়ও ছিল না।

ডাঙায় সিভিল এবং মিলিটারী রিসার্চকর্মীগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করে যাচ্ছিল কিভাবে এ রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়, কিভাবে ফ্লু বীজাণুদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে সভ্যতাকে সমূহ ধ্বংস থেকে বাঁচানো যায়।

মধ্য যুগ থেকে যে মহামারী এমনভাবে আসেনি, তা কিনা বিশ্বের যাবতীয় জনপদকে গ্রাস করতে সমুদ্যত হয়েছে।

আপার পেনিনসুলার মিচিগান-এর কলোন নামক জনৈকা নার্স, দেশে থাকা একমাত্র ডাক্তারকে নিয়ে অসাধ্য সাধন কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করলো। একটি

রেলওয়ে ট্রলি নিয়ে সুদূর টিম্বার প্রদেশে ঘুরে ঘুরে রোগীসমূহের সেবা করে যেতে লাগলো। সঙ্গে নিয়ে যেত, অ্যাসপিরিন, কুইনাইন, কাশির সিরাপ, হুইস্কি, রাম, দুধ, রুটি, কম্বল এবং বিছানার চাদর। নার্স কলোন আর ডাঃ পেরি একটি ফ্ল্যাট রেলওয়ে কার ট্রলিতে জুড়ে তাতে খড় আর চাদর বিছিয়ে অ্যাম্বুলেন্স -এর মত করে গুরুতর পীড়িত রোগীদের দূর দূরান্তরের, এমন কি ৩৫ মাইল দূরের হাসপাতালে পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেছে।

কংগ্রেসের এক তৃতীয়াংশ তখন বিছানায়, তারা তড়িঘড়ি ফ্লু রোগীদের রিলিফের জন্য দশ লক্ষ ডলার মঞ্জুরে ভোট দান করলো। পুলিশের নির্দেশে স্কুল কলেজ বন্ধ-করে দেওয়া হল। কোন কোন নগরে চার্চ সার্ভিসও নিষিদ্ধ হল সভাসমিতি তো দূরের কথা।

ফিলাডেলফিয়ার এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর তাদের প্রধান তলায় একটি জরুরী ফোনের সুইচবোর্ড করে দিল। ডাক্তার, নার্স, যাজক ইত্যাদির জরুরী প্রয়োজনে তারা এখান থেকে "ফিলবার্ট ১০০" এই নম্বরে ফোন করলেই সাহায্য পাওয়া যাবে।

ফরাসীদেশের ব্রেস্ট-এ গিয়ে বিশালকায় লেভিয়েথান জাহাজ ৫৭ নং পাইওনিয়ার ইনফ্যান্ট্রির সেনাদের নামালো। তার অফিসাররা এক ভয়াবহ বিবরণ দিল :

—চতুর্দিকে ইউ-বোট (সাবমেরিন) দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় আমরা জাহাজের সব পোর্টহোল (বৃত্তাকার জানালা)-গুলো রাত্তিরে বন্ধ করে রাখতাম। নয় হাজার লোককে ইঁদুর বাস করার ও অযোগ্য উত্তপ্ত বাতাসহীন হোল্ড-এর মধ্যে দেশলাই কাঠির মত জ্যাম অবস্থায় বাস করতে হয়েছে। বলতে গেলে সমস্ত জাহাজ জুড়েই ফ্লু বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল। জনতা গরমে ধুঁকে, দম বন্ধ হয়ে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে বসে পড়েছে, ভীড়ের জন্য শোবার যায়গাও তাদের জোটেনি। ব্ল্যাক আউট অর্ডারের দরুণ ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে অজস্র লোকের গোঙানী, কাঁদুনি, আর্তনাদে জাহাজটা যেন একটা ভাসমান নরকে রূপান্তরিত হয়েছিল।

জাহাজের তিরিশ জন ডাক্তার আর ২০০ আর্মি নার্স দুর্গত রোগীদের রোগ-জ্বালা উপশমের প্রচেষ্টায় প্রতিটি মিনিট রত ছিল। ফ্রান্সে নেমে ২০০ মৃতদেহ ল্যাম্বেজেলেকের আমেরিকান কবরখানায় সমাধি দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনির মজুরেরা ফ্লু আক্রান্ত হয়ে ভূমিতলের মাইলখানেক নিচের স্যাপ্টের মধ্যেই মরতে লাগলো দলে দলে। উপজাতীয় যাদুকরেরা জুলু এবং বান্টুদের পিট-এ যেতে বারণ করে দিল। তাদের ধারণা খনিগর্ভে দানবরা বিচরণ করছে এবং মানুষদের ধরে ধরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মেরে ফেলছে।

খনি মালিকরা মরিয়া হয়ে বন্দুক ও সঙিন উঁচিয়ে তখনও ভাল থাকা শ্রমিকদের খনি অভ্যন্তরে নেমে কাজ করতে বাধ্য করালো। যদিও শতকরা ৬৪ জনই তাদের মধ্যে রোগাক্রান্ত নয়তো মৃত।

সারা বিশ্বজুড়ে ভয়-ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার হল। পেনসিলভানিয়ার জনৈক শেরিফ কার কাছ থেকে যেন শুনলো যে, একজন ভয়ানক মিত্ররূপী শত্রু ডিনামাইট ক্যাপে ফ্লু বীজাণু পুরে নিয়ে তার কাউন্টিতে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে। যদি সে-গুলো বেরিয়ে পড়ে তাহলো গোটা পেনসিলভানিয়া ঐরোগে বেঘোরে মারা পড়বে।

সেই মিত্ররূপী শত্রু বলে প্রমাণিত পোরস্কি একজন কয়লাখনির ফোরম্যান যার কাছে বৈধ কারণেই ছিল ডিনামাইট। যখন সে জেলে আটক, সে অবস্থায়ই সহসা গাভরা ঘাম এবং গোঙানীসহ সে দুরন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছ'ঘণ্টার মধ্যেই মরে গেল।

ফিলাডেলফিয়াতে রাস্তায় পেট্রলরত অবস্থায় ৫৭ জন পুলিশ এক রাত্তিরেই পীড়িত অবস্থায় ফুটপাতে শুয়ে পড়লো। অন্যান্যস্থানে পুলিশদল কমতে কমতে এক সময় আর কেউ রইল না ডিউটি করতে। এইরকম একটি নগর হল টোপেকা। পুলিশহীন হওয়ায় ৩৫ জন সাধারণ নাগরিক পুলিশ ডিউটিতে এগিয়ে এল।

এল জুলাই মাসের ৮ই। কিছু আশাবাদী মনে করলো যে মহামারীর অন্তিমকাল ঘনিয়ে প্রশমিত হতে চলেছে। কিন্তু লেবরেটারী ও রিসার্চকর্মীরা তখনও কিন্তু মহামারীর ব্যাপারে ভীতি বিহ্বল। এখন দেখা গেল ভয়াল নিউমোকক্কাই এবং স্টেপ্টোকক্কাই বীজাণুরা ফ্লু বীজাণুর সঙ্গে মিলে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইক্রস্কোপ টেস্টে এটা প্রমাণিত হল। শিকাগোর হেলথ কমিশনার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বললে, শরৎকালের জন্য প্রস্তুত হোন। ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যা যদি অর্ধেক হয়ে যায় তাহলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

ওয়াশিংটন ডি. সি-তে ২০,০০০ মানুষ এ-রোগে তখন গুরুতরভাবে অসুস্থ। দমকল বাহিনীর লোকজন এত কমে গেল যে, ফায়ার মার্শাল আশংকা করলো যে, যদি কোনরকমের কোন আগুন লাগে তো দেশের পুরো রাজধানীই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নগরীর উত্তর-পশ্চিমে একটা ছোট-খাটো আগুন লাগলো। স্থানীয় ফায়ার স্টেশন তখন ফ্লু-তে বন্ধ। দূরের স্টেশন থেকে দমকল আসবার পূর্বেই চৌদ্দটা অট্টালিকা দাউ দাউ করে জ্বলছে, ছ'জন পুড়ে মরেছে এবং ক্ষতির পরিমাণ ২০ লক্ষ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

মুনাফাবাজেরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ, কয়লা এবং কফিন আজগুবি দামে বিক্রী করে ধনী বনে গেল। কলম্বিয়া পুলিশ কফিন বাক্সের জন্য হন্যে হয়ে শেষ পর্যন্ত রিচমণ্ডগামী এক ট্রেন থামিয়ে তা থেকে ওয়াশিংটনের জন্য প্রস্তুত ২০০টি কফিন বাজেয়াপ্ত করে নেয়। সে সময় ১৫ ডলার মূল্যের কফিন ব্ল্যাকে ২০০ ডলার করে বিক্রী হচ্ছিল।

পেনসিলভানিয়ার মনে হল শেষের সেদিন সমাগত প্রায়। আড়াইলক্ষ কমনওয়েলথবাসী পীড়িত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২ হাজার মৃত। হ্যারিসবুর্গের একজন

ফিউনারেল ডিরেক্টর সৎকারের ব্যয় যেখানে সাধারণভাবে ১৪০ ডলার, সে চার্জ করেছে ১০০০ ডলার। সে যখন দুটি বেকার ছেলের মাকে সৎকারের জন্য এর ওপরেও আটগুণ অর্থ বেশি চাইল তখন শোকতপ্ত ক্রুদ্ধ ছেলে দু'জন ঐ ডিরেক্টরকে বেঁধে এমনভাবে চাবুক মেরেছিল যে, সে নেহাৎ আয়ুর জোরেই বেঁচে গিয়েছিল। পুলিশ ছেলেদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, কিচ্ছুটি বলেওনি তাদের।

শত শত মৃতদেহ ভালভাবে সৎকার করাও সম্ভব ছিল না তখন এমন অবস্থা। অক্টোবরের ৩ তারিখে ফিলাডেলফিয়াতে একদিনেই ৫২৮ জন মারা যায়। এক রাত্রে রাস্তা ঘাট, বস্তি, কুটির থেকে একশটি মৃতদেহ তুলে আনা হয়েছে। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট হোসপাইপ দিয়ে রাস্তা-ঘাট ধুয়ে দিচ্ছিল। তখন দরজা জানালা বন্ধ পরপর বাড়িগুলিতে বসে নাগরিকেরা থরহরি চিত্তে অপেক্ষা করছিল কখন মৃত্যু এসে হানা দেয় তাদের সংসারে।

মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে মানুষজনেরা অদ্ভুত অদ্ভুত আচার-আচরণ শুরু করে দিয়েছিল। বাল্টিমোরের ডাঃ হোগান গুরুতর রুগ্ন এক মহিলাকে দেখতে গিয়েছিল এক ফ্ল্যাটে। দরজার কাছে যেতেই একদল বিস্ফারিত চক্ষু আধা উন্মাদ হয়ে যাওয়া মহিলাদের দ্বারা ডাক্তার চরম লাঞ্ছিত হয়। তারা ডাক্তারের জামা-কাপড় ছিঁড়ে দেয়, অকথ্য গালি-গালাজ করে, তারপর সহসা নতজানু হয়ে মর্মান্তিকভাবে কাঁদতে থাকে।

—ডাক্তার, এরপর আমায় বাঁচান। আমি মরতে চাই না প্লিজ।

—আমায় কোন পিল বা কোন মেডিসিন দিন। যা হয় কিছুদিন যাতে বীজাণু মুক্ত থাকতে পারি।

—আমি আপনাকে খুন করে ফেলবো ডাক্তার যদি আপনি আমাদের এখান থেকে চলে যান। এখানে থাকুন এবং আমাদের রক্ষা করুন।

ভীত সন্ত্রস্ত ডাক্তার দুহাতে মেয়ের পালকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে প্রায় ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পেছন পেছন মেয়েরাও চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে দৌড়য়। ভাগ্যভাল একটি ট্যাক্সি পেয়ে ডাক্তার পালিয়ে তার প্রাণ বাঁচায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন-জেনারেল হন্যে হয়ে ডাক্তার খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। তিনি হানা দেন যত্র তত্র ঃ বৃদ্ধ লোকদের আবাসস্থল, ইনফার্মারি, পার্কের বেঞ্চি। ডাক্তার চাই। যে কোন বয়সের ডাক্তার। বয়েস তাদের ৮০ হউক বা ৯০ই হোক।

গোটা আমেরিকা অসুস্থ, ধুঁকছে। দেশের প্রায় যাবতীয় কয়লাখনি বন্ধ হয়ে গেছে লোকাভাবে। ১০।১১ ডলারের স্থানে প্রতিটন কয়লার মূল্য উঠে গেছে ৬০।৭০ ডলারে।

মৃতদেহবাহী শকটের অভাব হওয়ায় শিকাগো কর্তৃপক্ষ পাবলিক আটটি বাসকে কালো ফেস্টুন লাগিয়ে কাজে লাগালো। কংগ্রেসের নির্বাচনের বছর ছিল সেটা। কিন্তু কোন পলিটিকাল মিটিং-এর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। আপনি বাঁচলে

বাপের নাম। বক্তৃতা মাথায় উঠেছে, প্রার্থীরা সব ঘরে কিংবা অফিসে লুকিয়ে বসে আছে, পাছে জনসংযোগে করাল রোগে সংক্রামিত হয়ে যায় এই ভয়ে।

পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টে হাজার হাজার মানুষ ফোন করতে লাগলো এই ফ্লু থেকে বাঁচবার নানাবিধ কাল্পনিক ও আজগুবি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে। একজন মহিলা জানালো দৈনিক ক্লোরোফর্ম শুঁকলে এ-রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। 'নিউ ইয়র হেরাল্ডে' জনৈক ব্যক্তি পত্র লিখলো :

—প্রাণীদের অত্যধিক পোষাক পরিধানের জন্যই এই ফ্লু হচ্ছে। এখানে প্রাণী বলতে মানুষ, তাই তাদের উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে উলঙ্গ থাকা, বিবস্ত্র থাকা। আমার পরিবার এবং আমি বাড়িতে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। আমাদের একজনেরও ঐ রোগ ধরেনি। তবে বিরক্তিকর ব্যাপার হচ্ছে আমার পড়শীরা বড় বেশি উঁকিঝুঁকি মারছে আমাদের দেখবার জন্য।

একজন কাফে মালিক আবার আরেকটু এগিয়ে গেল উদ্ভাবনী শক্তিতে। সে বললে, বাতাসে ধোঁয়া দিলেই ফ্লু বীজাণুরা পালিয়ে যাবে। আমাদের উচিত দাবাগ্নি জ্বেলে আকাশকে ধোঁয়ায় ভর্তি করে দেওয়া।

রেঞ্জার তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধরে পাঠিয়ে দিল মানসিক হাসপাতালে। সুযোগ-বুঝে সে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যায় নিকটবর্তী অরণ্যে পকেট ভর্তি দেশলাই কাঠি নিয়ে। অতঃপর সে যে আগুন লাগায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পাঁচদিন ধরে সে প্রলয়াগ্নি ৪০০০ একর পাকা টিম্বার পুড়িয়ে শেষ করে দেয় এবং ছ'জন স্বেচ্ছাসেবির প্রাণহরণ করে।

সারা দুনিয়া মহামারীর কবলে। খবরে প্রকাশ জার্মানীতে রোগাক্রান্ত সেনাদের একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে কামান দাগিয়ে তা উড়িয়ে দেওয়া হয় তখনো নিরোগ মানুষ জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়।

সমগ্র ভারতবর্ষেও এই মহামারী ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে প্রচুর মানুষের জীবন হানি ঘটায়। দশ লক্ষের উপর লোকের মৃত্যু হয় এখানে।

অবশেষে অক্টোবর এল। এবং এই মাসের শেষভাগ থেকে এই মহামারী সহসা প্রশমিত হয়ে ভালর দিকে বাঁক নিল। সরকারীভাবে একথা স্বীকৃত হল। এ-শুভসংবাদ এমনই আচমকা এল যে সহসা বিশ্বাস করতে লোকের বাঁধলো। বড় বেশি রোগ শোক মৃত্যুর নরক পেরিয়ে এসেছে তারা।

১৪ই অক্টোবর একজন হেলথ ডিরেক্টর ঘোষণা করলেন, "এপিডেমিক শেষ হয়ে গেছে।"

২০শে অক্টোবর বেলা দুটোর সময় প্রথমোক্ত সানফ্রান্সিস্কোর সেই গোট আইল্যাণ্ডের লোকেরা আনন্দে জয়ধ্বনী করে উঠলো, কেননা তাদের এতদিনকার কোয়ারেন্টাইন আদেশ বাতিল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নেভি ক্যাডেট দল উপসাগর পেরিয়ে নগরে গিয়ে সুরা নারী সহযোগে স্ফূর্তি করবার জন্য ফেরি

বোট চেপে রওনা দিল। কিছু লোক গেল তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কঠোর বিধিনিষেধের অবসান হয়ে গেছে। কি আনন্দ কি আনন্দ। তাই মহামারী কালে উক্ত দ্বীপটি ছিল যেন একটি নিরাপদ মরুদ্যান বিশেষ। সাত্যিই তাই। এ-দ্বীপের ৪০০০ অধিবাসীর মধ্যে একজনও ফ্লুতে আক্রান্ত হয়নি। অথচ এ-দ্বীপটি মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র দশমিনিটের জলপথের দূরত্বে অবস্থিত। আরকিশ মূল ভূখণ্ডের নগরী সানফ্রান্সিস্কোতে ১৫ হাজার মানুষ ফ্লুতে ভুগছে যার মধ্যে মারা গেছে ৪ হাজার হতভাগ্য নরনারী।

সমগ্র দেশের ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেল মুক্তির স্বস্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রার্থনা।

যেমন রহস্যজনকভাবে এই দুর্দান্ত রোগটি সারাবিশ্বকে তছনছ করতে এসেছিল একদা আজও তেমনি রহস্যজনকভাবেই সে মিলিয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১১ই নভেম্বর।

এত শিঘ্র শান্তি ফিরে আসবার পেছনে ফ্লুর হাত কতটা ছিল সেটা ঐতিহাসিকরাই স্থির করবে। দুঃখ শোক ভোগ ক্লিষ্ট মানুষেরা নবজীবন লাভ করলো এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়!

লণ্ডনের অপরাধীকণ্ঠকিত জঘন্য অঞ্চলে সেদিন নভেম্বরের শীতার্ত রাতে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল পুলিশ অফিসার হেনরী ডাইনিং।

সহসা অফিসারের নজরে পড়ে একটি ট্যানারী অফিসের তিনতলায় ক্যাশঘরের মধ্যে পকেট টর্চের সাময়িক ঝলকানি। টেম্‌স নদীর দিক থেকে প্রচণ্ড কুয়াশা ভেসে এসে অন্ধকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ওখানে—ওখানে আলো কেন? তবে কি?

অফিসার সঙ্গীকে ডাকবার জন্যে হুইসিল বাজিয়ে ঐ চোরদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে—কে-কে ওখানে? আমি পুলিশ অফিসার বলছি, এক্ষুণি নিচে নেমে এস।

সহসা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল তিনতলায় ঘরের জানলা থেকে। আর্তনাদ করে রাস্তায় ছিটকে পড়ল অফিসারটি। তার ডান পায়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে।

মনে হয়েছিল যেটা সামান্য এক আঘাত সেটাই পাঁচ দিন বাদে পচনশীল ঘায়ে পরিণত হয়ে গেল। গ্যাংগ্রীন এসে বাসা বেঁধেছে দেহে। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে লাগলো পুলিশ অফিসারটির। যদি কোন প্রক্রিয়ায় এখনি এই সংক্রমণ রোধ করা না যায় তবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য।

নার্স এসে ডাক্তার এডয়ার্ড-এর কাছে মিনতি জানায়—ডক্টর! ঐ বেচারার জন্যে আপনারা কি কিছুই করবেন না?

ডাক্তার হতাশভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের সাধ্যের মধ্যে আর কোনো চিকিৎসা নেই।

পাঁচ দিনের মধ্যেই বলিষ্ঠ পুলিশটি কৃশকায় ক্ষীণ-জীবী হয়ে পড়েছে। জ্বরে তার গা স্পর্শ করা যায় না। এত উত্তাপের মধ্যেও সারা দেহ দিয়ে ঘামের বন্যা বয়ে চলেছে। সমস্তটা পুঁজে ভরা। তা থেকে ভয়ংকর দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঐ মারাত্মক গ্যাংগ্রীনের বীজাণু আশে পাশের সুস্থ মাংসপেশীকেঃ দ্রুতগতিতে ভক্ষণ করে চলেছে।

ডাঃ এডয়ার্ড শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলেন এক তরুণ ডাক্তার ফ্লেমিং-এর কাছে। সে দাবী করে তার রুটিজাত ছত্রাক নাকি বহু ধরনের বীজাণু নষ্ট করে রোগীকে

বাঁচাতে সক্ষম। যদিও অবিশ্বাস্য তবু—এখন আর এই পুলিশ অফিসারকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

রাত এগারটা। চেরিং ক্রশ হাসপাতালে রোগীর চারিদিকে উদগ্রীব দৃষ্টি নিয়ে পাঁচ-পাঁচজন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

তাঁদেরই একজন যাঁর কথায় স্কটল্যাণ্ডের ভাষার টান অত্যন্ত প্রকট, সহানুভূতি কণ্ঠে রোগীকে বললে,—আমার নাম ফ্লেমিং। অফিসার, আমি আপনার কষ্ট উপশম করতে এসেছি। চুপচাপ একটু কষ্ট করে শুয়ে থাকুন প্লিজ।

—ইয়েস, ডাঃ ফ্লেমিং।

—আমি আপনার পায়ের পেশীতে একটা ইনজেকসন করব।

ফ্লেমিং-এর হাতের সিরিঞ্জে হলদে রঙের কিছু পাউডার।

সহযোগী ডাক্তার ফ্রান্সওয়ার্থের হঠাৎ মনে পড়লো তাঁর জনৈক সহকর্মীর শ্লেষাত্মক মন্তব্য, ফ্লেমিংটা একটা উন্মাদ। ওর তথাকথিত আবিষ্কৃত ওষুধ ল্যাবরেটরীর অভ্যন্তরে সযত্নে নিয়ন্ত্রিত উত্তাপে হয়ত বা স্ট্যাফাইলোকক্কাসদের রুখতে সক্ষম। কিন্তু তার ঐ আজব পাউডার নিয়ে মানুষের উপর প্রয়োগ? রক্ষে করো বাবা!

ডাঃ ফ্রান্সওয়ার্থ স্ফীত পুঁজে ভরা পা-টা চেপে ধরলেন। চিন্তিতভাবে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাকালো তার সিরিঞ্জের দিকে। কাজ হবে তো এতে? তারপরই ফ্লেমিং-এর সিরিঞ্জ ঢুকে গেলো রোগীর শরীরে।

প্রথমবার ইঞ্জেকসন দিয়ে ফ্লেমিং বললেন,—আমরা ওকে তিন ঘণ্টা অন্তর ১০০ মিলিগ্রাম করে ইনজেকসন দিয়ে যাব। জেণ্টেলম্যান, আমার কাছে আটবার দেবার মত যথেষ্ট ওষুধ আছে। আমাদের শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে ফলাফলের জন্যে......।

রাত দুটো। ক্লান্ত ডাক্তার ফ্লেমিং দ্বিতীয় ইনজেকসন দিলেন পুলিশটির পচনশীল পায়ে। রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে না?

শেষ রাত ৫টা। তৃতীয় ইনজেকসন দেওয়া হল। না কোন সন্দেহ নেই। দারুণ উন্নতি দেখা গেল রোগীর। ভয়াবহ ১০৫ ডিগ্রি জ্বরোত্তাপ নেমে এল ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে।

সকাল আটটা। রোগীর ফ্যাকাশে মুখে রক্তিমাভা দেখা দিল। রোগী পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

বেলা এগারটা। ডাঃ এডয়ার্ড উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—ফ্লেমিং, এ যে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ঘটনা। ওর নাড়ীর গতি বর্তমানে স্বাভাবিক ঃ টেমপারেচারও তাই!

—এখনো কিন্তু আমরা বিপদসীমার বাইরে যাইনি—ফ্লেমিং হুঁশিয়ার করেন।

রাত দুটো ও পাঁচটার সময় ইনজেকসন দুটো দেওয়া হল।

আপাততঃ ক্ষতস্থানে পুঁজ হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার চোখের তারা আর নিথর নেই। তার দৃষ্টি সহজ হয়ে এসেছে।

উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে একসময় রোগী বলল—ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার। আমাকে কি কেউ একটা মাংসের স্টেক দেবেন?

কোমল কণ্ঠে ফ্লেমিং বলেন,— আপনাকে এখন আমরা রক্ত দেব। তারপর আপনি স্টেক খেতে পারবেন।

এদিকে পেনিসিলিন সাপ্লাই প্রায় শেষ। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন ফ্লেমিং। আরও আশঙ্কার কথা যে, সারা গ্রেট বৃটেনে আর এক কণা পেনিসিলিনও কারোর কাছে নেই!

অষ্টম ইনজেকসনটি দেওয়া হল প্রথমটির ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে। উপস্থিত ডাক্তাররা সবিস্ময়ে দেখলেন, রোগীর মুখের শান্ত অভিব্যক্তি, তার নাড়ির সঠিক গতি এবং কলাগাছের মত ফোলা পা চুপসে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অফিসার ডাইনিং এখন ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করে কথাবার্তা বলছে।

দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে কিন্তু ফ্লেমিং। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, আর এক ফোঁটা পেনিসিলিনও নেই আমার কাছে। অথচ এ পেশেন্টের আরও ইনজেকসন প্রয়োজন। ওর প্রস্রাব থেকে সামান্য কিছু উদ্ধার করে আরেকবার কোনরকমে ইনজেকসন দেওয়া যাবে। কিন্তু তারপর?……

রোগীর প্রস্রাব পরিস্রবণ করে তার থেকে পাওয়া সামান্য মূল্যবান হলুদ পাউডার দিয়ে পরবর্তী ইনজেকসনটি দেওয়া হল। মনে হল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

কিন্তু পেনিসিলিন হীন অবস্থার ১৫ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল রোগীর দেহে সেই কালান্তক হিংস্র বীজাণু স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস এসে পুনরায় বাসা বেঁধেছে। আর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করেছে শরীরে। দেখতে না দেখতে চড়চড় করে জ্বর বেড়ে গেল। পুঁজে ভরে গেল ক্ষতস্থানটা। দেখা গেল মৃত্যুর পূর্বেকার উপসর্গগুলি।

সকাল ছটা। নিঃসীম বেদনা-ভরা হতাশায় ফ্লেমিং বলে ওঠে—আমরা ওকে হারাতে চলেছি ভদ্রমহোদয়গণ।

ঠিক তাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসার ডাইনিং মৃত্যুমুখে পতিত হল। যাঁরা এপর্যন্ত প্রশংসামুখর হয়েছিলেন ওষুধটির অলৌকিক গুণ দেখে, সেই ডাক্তারেরাই এবার এর অর্থহীনতা ও অপদার্থতা সম্বন্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

তাঁদের ধারণা হল, অনেক ক্ষেত্রে রক্তদূষিত রোগীদের অবস্থা আপনা আপনিই উন্নতির পথে যায় সাময়িকভাবে। তারপরেই কোমা দেখা দেয় এবং তারা

প্রাণত্যাগ করে। হয়ত তাই-ই ঘটেছে প্লিশটির ক্ষেত্রে। ফ্লেমিং-এর হলদে পাউডারের সম্ভবত কোন কৃতিত্বই ছিল না রোগীটির অলৌকিক উন্নতির ব্যাপারে।

আপনারা বিশ্বাস করুন,—শান্তস্বরে উপস্থিত ডাক্তারদের লক্ষ্য করে বললেন ফ্লেমিং : এই ওষুধটার সত্যিই অবিশ্বাস্য ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তৈরী করা এক বিরাট সমস্যা, উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করতে পারলে এখনি আমি এই ওষুধটার ক্ষমতার কথা হাতে-নাতে প্রমাণ করে দিতাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আর ওষুধ পাওয়া গেল না।—একটু থামলেন ডাঃ ফ্লেমিং।

তারপর আবার বললেন,—এই ওষুধটার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারলে আজকে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এতগুলো আহত সৈনিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো না।

যুদ্ধের কথা মনে পড়লেই ফ্লেমিং উদাস হয়ে যান। স্মৃতির পাতা হাতড়ে মন চলে যায় প্রায় আঠাশ বছর আগের আরেকটি যুদ্ধের প্রাঙ্গণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ; ১৯১৪ সালে—

তরুণ ডাক্তার ফ্লেমিং তখন সামরিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদের সেবায় নিযুক্ত। সেই সময়েই প্রথম তাঁর চোখে পড়ে ব্যাপারটা—

ফ্লেমিং লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ কাটা-ছেঁড়ায় কার্বলিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারক্সাইড বা বোরিক অ্যাসিড ভাল কাজ করলেও, আধুনিক মারণাস্ত্র বা বিস্ফোরক থেকে যে ক্ষত তৈরী হয় তাকে সারিয়ে তোলার প্রায় কোনো ব্যবস্থাই নেই ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতায়। এই ক্ষতগুলো চট্‌পট্ বিষিয়ে ওঠে, ক্ষতস্থানে পচন ধরে জমা হয় পুঁজ, তারপর রোগীর গায়ের তাপমাত্রা হু-হু করে বেড়ে গিয়ে পৌঁছয় ১০৪ ডিগ্রী থেকে ১০৫ ডিগ্রীতে—শেষপর্যন্ত অসহনীয় কষ্টের মধ্যে প্রলাপ বকতে বকতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মানুষটি। শেষ নিঃশ্বাস তো নয়, যেন অসহ্য যন্ত্রণাময় নরক থেকে মুক্তি, মানুষগুলো যেন মরে বেঁচে যায়,—ডাক্তার হয়েও এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে ফ্লেমিংয়ের। কুড়ি বছরের তাজা একটি তরুণ সৈনিকের এই ধরনের অসহনীয় মৃত্যু দেখে শেষ পর্যন্ত আর চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি ফ্লেমিং। আর সেইদিনই মনে মনে শপথ নিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্ত আর আগুনের পটভূমি যখন পৃথিবী জুড়ে হিংসার বীজ ছড়াচ্ছে, তখন সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একটি তরুণ-মন মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার বজ্র প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় সংবদ্ধ হচ্ছে—মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেটা এক মহালগ্ন সন্দেহ নেই।

সেটা ১৯২৮। সতীর্থ সবাই ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে স্ব স্ব পেশায় ফ্লেমিংকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। কেউ কেউ আর্থিক সচ্ছল জীবন-যাপন করছে। দুরন্ত পসার থেকে কেউ কেউ সায়েন্টিফিক পেপার্স দাখিল করে সুনাম অর্জন করে উচ্চপদস্থ অধ্যাপনায় কৃতি হয়েছে।

কিন্তু ফ্লেমিং-এর পার্থিব কোন উন্নতি হয়নি।

সে তেমনি ভদ্র, শিষ্ঠ ও বিনয়ী থেকে নিজের শপথ মত কাজ করে যাচ্ছে। বিয়ে করেছে। 'লাইসোজাইম' বিষয়ে একটি গবেষণামূলক পেপার্স প্রকাশ করে দেখিয়েছে যে, এটা বিশেষ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম। নিজের ল্যাবরেটরির রিসার্চ বিজ্ঞানীজীবনকেই সে সানন্দে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু প্রতিনিয়ত ফ্লেমিং-এর স্মৃতিতে পাক খেয়ে গেছে তার সেই রণাঙ্গণের আহত নিহতরা। সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি যেন তার হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। বিনিদ্র রাতগুলিতে আজও সে যেন সেইসব সেনাদের অন্তিম আর্তনাদ শুনতে পায়। বছরের পর বছর এই শোচনীয় রোগাক্রমণ ও নিরাময় ব্যর্থতা দেখে সে যেন উন্মাদ হয়ে যাবার দাখিল হল। কিছু একটা করতেই হবে। অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু হায় আফসোস, এখনো কিছু সে করে উঠতে পারছে না।

টেড ফাউলার নামে এক ব্যক্তির পায়ে বিয়ারের ড্রাম পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু বিষাক্ত সংক্রমণ হওয়ায় তার পা কেটে ফেলতে হল। এ-সত্ত্বেও সেই নিষ্ঠুর মাইক্রোবস্ তার দেহের মধ্যে বাসা বেঁধে ফেললো লোকটা মারা গেল।

ষোড়শী অ্যানা ওয়াটার, ফ্লেমিং-এর ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে। একদিন বাসের ধাক্কা খেল। এমন কিছু মারাত্মক আঘাত নয়। বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে হাঁটুটা সামান্য কেটে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। তাতেই মেয়েটির দেহে ভয়াবহ গ্যাংগ্রীনের বীজাণু প্রবেশ করে গেল। হাঁটু ফুলে কলাগাছ। পুঁজে ভর্তি সেই ঘায়ের মধ্যে দিয়ে কিশোরীটির সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে গেল। আট দিন বাদে মেয়েটি কফিনে চেপে কবরখানার পথে রওনা দিল। ফুলে শোভিত মৃতদেহের পানে তাকিয়ে ফ্লেমিং-এর সরোষে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো ঃ আই অ্যাম এ ফুল! এ ফেলিওর, এই সংক্রমণ রোধ করতে আমি এখনো কিছুই করতে পারলাম না।

অ্যানার মৃত্যুর পর একমাস কেটে গেছে। ফ্লেমিং তখনো তার গবেষণায় মগ্ন। একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে সে তার ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করে বললে,—ওয়েল মাই লিটল কিলার্স (খুদে খুনীরা) দেখি আজ তোমাদের কেমন দেখতে হয়েছে। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি যে, ইতিমধ্যেই তোমরা অসংখ্য বংশবৃদ্ধি করে ফেলেছ!

ক্লান্ত হাসি হেসে সে এগিয়ে গেল সেলফের ওপর রাখা একটি পাত্রের দিকে। পাত্রটা একটা কাচের ছোট ডিস। তার মধ্যে রয়েছে স্টাফাইলোকক্কাস বীজাণুর কালচার। লোকেরা যেমন ফুলের চাষ করে তেমনিভাবেই ফ্লেমিং এদের চাষ করছিল। কিন্তু দেখা গেল জেলির মত কালচারটা ছত্রাকে ঢাকা পড়ে গেছে।—হোয়াট দা ডেভিল। সবিস্ময়ে সে চীৎকার করে ওঠে, ছি, ছি কালচারটা দেখছি, নষ্ট হয়ে গেল। এই ছাতাগুলো?

ক্ষুব্ধভাবে সে যখন সতর্কতার সঙ্গে অবশিষ্ট বীজাণু নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে, তখুনি তার নজরে এল এক অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ছত্রাকের চতুর্দিককার জোলর মত বস্তু থেকে স্টাফাইলোকক্কাস বীজাণুসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

এমন কি ঘটলো যে ··! তাহলে কি ঐ ছত্রাকের মধ্যেকার অজ্ঞাত কোন বস্তু ঐ খুনী বীজাণুগুলোকে মেরে ফেলেছে?

উত্তেজিত রোমাঞ্চিত হয়ে ফ্লেমিং সেই কাচের ডিসটাকে মাইক্রোস্কোপের তলায় স্থাপন করলো। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে ডাক্তার দেখলেন—সত্যি সত্যি মারাত্মক বীজাণুগুলি ছত্রাকের মধ্যে কুঁকড়ে মুচড়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই ছত্রাক বোধ করি স্পোর (spore) বাহিত হয়ে খোলা জানালা পথে রাস্তার বিপরীত দিকের মদ্যশালার বিয়ার ভ্যাট থেকে উড়ে উড়ে এসে পড়েছে। কালচারের ডিসটাতে নিশ্চয়ই ঐ ছাতাসমূহের মধ্যে এমন কোন কিছু জন্মেছে যারা প্রতিহিংসাপরায়ণের মত মারাত্মক বীজাণুগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। কিন্তু কি সেই বস্তু যার দ্বারা এদের বিনাশ সম্ভব হল?

ফ্লেমিং নানাপ্রকার ঝোল বা সুরুয়া জাতীয় তরল পদার্থে ছত্রাকের জন্ম দিতে লাগলেন। তারপর ছত্রাকগুলোকে ফিলটার করে নিয়ে সেই তরল পদার্থ করে দেখলেন যে, সাধারণ বীজাণুসমূহের ওপর এর আশ্চর্য মারণ ক্ষমতা বর্তেছে। এই তরল বস্তুটির নাম দিল সে "পেনিসিলিন" যেহেতু এটা উৎপাদিত হয়েছে এমন এক জাতের ছত্রাক থেকে যাকে বোটানীতে বলে "পেন্নিসিলিয়াম" (Pennicillium) বা "লিট্‌ল্ ব্রাশ"।

ফ্লেমিং আরও ছত্রাক তৈরী করতে লাগলেন পাঁউরুটি ফলফলাদি এবং মাংসের ঝোলের ওপর। মারাত্মক ডোজে ভয়ংকর স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস, ও নিউমোকক্কাস বীজাণুদের ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে যখন দেখেছেন তাদের দেহে জ্বর ও খিঁচুনী এসেছে তখনই ঐ ছত্রাক থেকে উদ্ভূত তরল পদার্থ ইনজেকসন করে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, ঐসব খুনে বীজাণুসমূহ অনতিবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে গেছে ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর দেহ থেকে। দুদিনের মধ্যেই তারা রোগমুক্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ফের লাফালাফি কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে।

এ-ধরনের প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাঃ ফ্লেমিং তাঁর আবিষ্কার বিষয়ে নিখুঁত একটা রচনা লিখলেন। ১৯২৯-এ সেটি প্রকাশিত হল ঃ ব্রিটিশ মার্শাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজি'র জুন সংখ্যায়।

এ রচনায় ফ্লেমিং দাবী করলেন যে, মাত্র দুই পার্সেন্ট পেনিসিলিন সলিউসন পুঁজ সৃষ্টিকারী পাইওজেনিক কক্কাস বীজাণুদের অবশ করে মেরে ফেলতে সক্ষম। আর মাত্র ১ পার্সেন্ট সলিউসন ডিপথেরিয়া ব্যাসিলাসদের খতম করে দিতে পারে।

কিন্তু এসব কথায় কেউ কানই দিল না। কোন কোন ডাক্তার বললেন, ফ্লেমিং তাদের সঙ্গে পরিহাস করছে। অপর ডাক্তাররা বললেন, এ-ধরনের আজগুবি ঔষধ জঙ্গলের উইচ ডাক্তার বা ডাকিনী ডাক্তারদের পক্ষেই উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে আফ্রিকা ও নিউগিনির অসভ্য আদিম অধিবাসীরা বিশ্বাস করে আসছে যে, ছাতাপড়া রুটির পুলটিশ দিয়ে তীর-বেঁধা ক্ষতে বেঁধে দিলে দ্রুত সে ঘা নিরাময় হয়ে যায়। ঐ সব উইচ ডাক্তারদের সঙ্গে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর কোন তফাত আছে কি?

না, আমি তা নই—ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠেন ফ্লেমিং: তবে এ-কথা মানতেই হবে ঐসব তথাকথিত অসভ্য মানুষেরা এমন কিছু সঞ্জীবনী ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যা আপনাদের মত হার্লে স্ট্রীটের বিদ্বান ডাক্তারদের কল্পনার অতীত।

এর পর দ্রুত বছরের পর বছর কেটে গেল। ফ্লেমিং-এর চুল ক্রমশঃ সাদা হয়ে এল, কিন্তু তখনও পেনিসিলিন পৃথিবীর ডাক্তারী শাস্ত্রে কোনো স্বীকৃতি পেল না।

সেই অবিশ্বাস আর বঞ্চনার মধ্যেই ফ্লেমিং মাঝে মাঝে তাঁর হলদে তরল পদার্থটি রুগ্ন মানুষজনের দেহে প্রয়োগ করতে সুযোগ পেতেন। একদিন তাঁর এক সহকর্মীর চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। অর্থাৎ সে নিউমোকক্কাস কনজাং-কটিভাটিস-এ আক্রান্ত হয়েছে।

এস আমি তোমার চিকিৎসা করি—ফ্লেমিং আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন: ভয় নেই 'পেনিসিলিন' তোমার কোন ক্ষতি করবে না, বরং উপকারই করবে।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সহকর্মীর চোখ স্বাভাবিক হয়ে গেল। কিন্তু তার ফলে ফ্লেমিং-এর উপর বিশেষ কোনো মানুষের আস্থা বাড়লো না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল না কেউ।

ফ্লেমিং-এর দুই সহকারী ডাঃ হাওয়ার্ড, ডব্লু, ফ্লেরে এবং ডাঃ আর্নেষ্ট চেইন ততদিনে বহুকষ্টে এক চায়ের চামচ পরিমাণ হলদে পাউডার তৈরী করে ফেলেছেন —পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম পেনিসিলিনের সল্ট এসেন্স। সারা ইংলণ্ড শুধু নয়, গোটা পৃথিবীতে পেনিসিলিন বলতে ঐটুকুই যা দিয়েই কিনা ফ্লেমিং চেষ্টা করেছিলেন গুলিবিদ্ধ পুলিশ অফিসারটিকে বাঁচাতে। দুর্ভাগ্য ফ্লেমিংয়ের. লোকটি মারা গেল ওষুধের অভাবে, নয়তো ঐটুকু পেনিসিলিনই তাকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা আমরা আগেই শুনেছি—

১৯৪১ সাল—তখন বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে। ঘন ঘন বেজে ওঠে সাইরেন—ইংল্যাণ্ডের আকাশ কালো করে উড়ে আসে ঈগলচিহ্নিত জার্মানীর অগণিত বোমারু বিমান। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম ছেড়ে উঠে পড়েন ফ্লেমিং। গিয়ে ঢোকেন—না, এয়ার-রেড থেকে বাঁচার জন্য কোনো শেল্টারে নয়; তাঁর ল্যাবরেটরীতে।

বোমারু বিমানের গর্জন আর বোমা-বিস্ফোরণের শব্দে যখন কেঁপে ওঠে
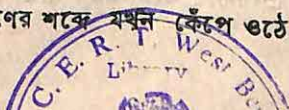
ল্যাবরেটরী, ছিটকে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাচের জার, বীজাণু কিংবা ছত্রাকের পাত্র; উল্টে যায় মাইক্রোস্কোপ, ভয়ার্ত আর্তনাদ করে খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়ায় ইঁদুর গিনিপিগ বা খরগোশগুলো, তার মধ্যে আরও অবিচলিত হয়ে ওঠেন ফ্লেমিং, হয়ে ওঠেন আরও স্থিরসংকল্পে অটুট। এ-এক আশ্চর্য লড়াই—বিশ্বজোড়া হিংসা যখন মারণাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে অকৃপণ হাতে মৃত্যু ছড়িয়ে চলেছে দুই গোলার্ধ জুড়ে, তখন তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে জীবনকে ছিনিয়ে আনতে সচেষ্ট একটিমাত্র মানুষ।

মন ঠিক করে ফেলেছেন ফ্লেমিং। না, অন্য কোনো গবেষণা নয়, শুধুমাত্র পেনিসিলিনের গবেষণাই করবেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধই তাঁকে এনে দিয়েছে সুযোগ। এই যুদ্ধের মৃত্যু-বিছানো পথেই পেনিসিলিনের জয়যাত্রা হবে শুরু—

সুযোগ এসে গেলো। ১৯৪১-এর আগস্ট মাসের রাত। বোমা আর গুলির আওয়াজের বিরাম নেই। সেণ্ট মেরী হাসপাতালের ৪ সি নম্বর ঘর। রোগীর নাম প্যাট্রিক ওসেয়া, একটি অপটিক্যাল ফার্মের ডিরেক্টর, ফ্লেমিং-এর বন্ধুও বটে। অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। রোগ-ই নির্ণয় করা যায়নি।

কি হয়েছে? উপসর্গটা কী? ডাঃ ফ্লেমিং প্রশ্ন করে স্যার জেরাল্ড কিট্রিনকে। নামকরা সার্জন এবং ফ্লেমিং-এর কলেজ সতীর্থও বটে—বললেন—মনে হয় মেনিনজাইটিস। তবে এ-ব্যাপারে আমরা খুব নিশ্চিত নই। বমি দিয়ে শুরু। প্রচণ্ড মাথাধরা, গলার পেশী আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। হাইড্রোসেফালান শুরু হয়ে গেছে, মাথায় হাত দেওয়া যাচ্ছে না, চীৎকার করে উঠছে, মনে হয় আর বেশীক্ষণ নেই।

ফ্লেমিং স্তিমিত আলোর ঘরে প্রবেশ করে মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে মাথা নিচু করে কি যেন দেখতে লাগলেন। প্রস্রাব হচ্ছে না। যখন হচ্ছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক ভাবে হচ্ছে।

ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। গলার কাছে পেশী আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য সে মাথা নাড়তে চাড়তে পাচ্ছে না আদৌ।

ফ্যাসফেসে কণ্ঠে রোগী বলে ওঠে,—কে? কে আপনি?

রোগীর চোখের তারা ফুলে গিয়ে তাকে সাময়িক অন্ধ করে ফেলেছে। হারপিস হয়েছে—কোমরের চতুর্দিকে ঘা দেখা দিয়েছে।

আমি, আমি ফ্লেমিং, প্যাট—ডাক্তার সহানুভূতির কণ্ঠে বলে ওঠেন: তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো—আমি তোমায় একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

ফ্লেমিং রোগীর দেহের জয়েণ্টগুলো দেখতে লাগলো। প্রতিটি গাঁট লাল হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড ব্যথা আর অসম্ভব ফুলে উঠেছে সেগুলো। নাড়ীর গতি খুবই দুর্বল এবং ধীর। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হাঁপাতে হচ্ছে রোগীকে। এ প্রচেষ্টায় তার নিথর মাথা কেঁপে উঠছিল।

রোগীর চোখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। ও এখন সেপ্টি সেমিক স্টেজে রয়েছে, ফ্লেমিং প্রায় নিজমনেই বিড় বিড় করে বলে উঠলো : পলিয়াথ্রাইটিস শুরু হয়ে গেছে…নিওরোলজিকাল পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আচ্ছা স্যার জেরাল্ড রোগীর সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড কি বলছে?

প্রখ্যাত সার্জন বললেন,—সেটা বড়ই অদ্ভুত। ওর মেনিনজাইটিসের সব রকম উপসর্গ রয়েছে। অথচ তুমি শুনলে অবাক হবে ফ্লেমিং যে ওর স্পাইনাল ট্যাপ করে কিন্তু কোন মাইক্রোব পাওয়া যায়নি। তোমার কি মনে হয় বলতো?

শিরদাঁড়া থেকে আরও ফ্লুইড নেওয়া হল। ফ্লেমিং সস্নেহে রোগীর তপ্ত দেহে হাত বোলায়। হাতে ও হাঁটুতে লাল লাল দাগ পড়েছে। বুকে নানাবর্ণের দাগ। ফ্লেমিং স্মরণ করতে লাগলো জীবনভর দেখা যত রক্তদূষিত রোগীদের উপসর্গের কথা।

—আমার ধ্রুব বিশ্বাস পেশেণ্ট স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে স্যার জেরাল্ড। আপনারা আমায় যদি পেনিসিলিন ব্যবহার করতে না দেন তাহলে আমার ধারণা ওর আর বাঁচবার কোন আশা নেই।

জবাব দেবার পূর্বে স্যার জেরাল্ড কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। ফ্লেমিংকে সে জানে এবং পছন্দও করে। ফ্লেমিং স্কুল কলেজে ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিল এবং রিসার্চ ওয়ার্কার হিসেবেও অতি দক্ষ। কিন্তু এই পেনিসিলিন সম্বন্ধে একরোখা ভাব…। ঐ বস্তুটি এক যুগ অর্থাৎ বারো বছর পূর্বে সে আবিষ্কার করেছে। তবে মানুষের উপর এ ঔষধের কার্যকারিতা এখনও অজ্ঞাত। এই স্কটিশ ডাক্তারের হাতে রোগীকে যদি গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে তিনি পাঁচ জনের কাছে হাস্যাস্পদ না হয়ে যান, এই তাঁর আশঙ্কা—অথচ এদিকে ওসেয়া আজ রাত্রি পর্যন্তও টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

—ঠিক আছে ফ্লেমিং লেগে যাও। তোমার পেনিসিলিন প্রয়োগ কর। উইশ ইউ গুড লাক।

—ঠিক আছে। তবে এখুনি অক্সফোর্ডে একটা টেলিফোন করতে হবে। সেখানে ডাঃ ফ্লোরের ল্যাবরেটরীতে সামান্য কিছু পেনিসিলিন রয়েছে। যা ইংলাণ্ডে আর কোথাও নেই।

ফ্লেমিং-এর প্রতি পরম আস্থাবান ডাঃ ফ্লোরে এই ছত্রাক নিয়ে আগাগোড়া এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে আসছে।

সরি স্যার অক্সফোর্ডের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েকের পূর্বে কোন কানেকসন সম্ভব হবে না—টেলিফোন অপারেটার জানালো : শত্রু বিমানের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে সমস্ত লাইনই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

অপারেটারের কথা শুনে ফ্লেমিং-এর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে? অসম্ভব। ঐ সময়ের মধ্যে অক্সফোর্ড থেকে পেনিসিলিন

অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে লণ্ডনে। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে ডাঃ ফ্লোরে অন্য কোন কাজে সেটা খরচ না করে ফেলে থাকে। অথবা যদি ইদানিং অক্সফোর্ডে যে নাৎসী বোমা পড়েছে তার আঘাতে নষ্ট হয়ে গিয়ে না থাকে।

—অপারেটার! তুমি আমাকে তোমাদের সুপার-ভাইজারকে দাও, এটা সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপার। মরণ বাঁচন সমস্যা। আমি মিলিটারী টেলিফোন লাইন ব্যবহার করতে চাই।

— আই অ্যাম সরি স্যার। সিভিলিয়ানদের ঐ লাইন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না।

অপারেটর লাইন কেটে দিল, হাতের ডেড টেলিফোন রিসিভারটার দিকে চরম হতাশাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ফ্লেমিং।

হাসপাতালের ঘড়িতে তখন রাত পৌনে দুটো। ৪ সি রুমের নার্স ছুটে এল ঘরে।

—ডক্টর, মিঃ ওসেয়ার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে আসছে। রক্ত দেবার ব্যবস্থা করব কী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করোগে। রক্ত দেবার ব্যবস্থা কর। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

পেনিসিলিন নেই। সেই অমোঘ হলদে গুঁড়ো যা এই মুহূর্তে প্রয়োগ করলে বন্ধুটির প্রাণ বাঁচানো যেত। সেই সঞ্জীবনী তার হাতের কাছে এক কণাও নেই। আফসোসের কথা—থাকলে, ডাক্তারদের বিশ্বাস হত যে, পেনিসিলিন কি অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম। আর সে ঔষধ যদি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হত তাহলে মিত্র পক্ষীয় সৈন্য, এয়ারফোর্স ও সিভিলিয়ান অজস্র মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেত, যারা আজ অকালে মৃত্যুবরণ করে চলেছে।

ওসেয়ার হিক্কা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনর্গল প্রলাপ বকছে সে। অন্তিম মুহূর্তের আর বেশি দেরী নেই। সময় দ্রুতগতিতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে ফ্লেমিং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো দুপুর একটা পনেরো মিনিট। একটা ভয়ংকর নাৎসী বোমা টেমস ডকে বিস্ফোরিত হয়ে হাসপাতাল বিল্ডিংকে কাঁপিয়ে দিল। ফ্লেমিং তখন ফোনে অক্সফোর্ডকে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বৃথা।

ফ্লেমিং-এর এবার মনে পড়লো হোম অফিসে তাঁর বন্ধু জন ব্রাডফোর্ড বোধ হয় এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন।

যদি তিনি আমায় মিলিটারী রেডিওটা একবার মাত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেন তাহলে আমি ফ্লোরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সংগ্রহের পেনিসিলিনসমূহ একজন মেসেঞ্জার মারফৎ আনিয়ে নিতে পারি অনায়াসে।—ভাবলেন ফ্লেমিং।

মেফেয়ারে ব্রাডফোর্ডের বাড়িতে ফোন বেজে যেতে লাগলো একটানা। কোন উত্তর নেই।

অপারেটার রিং বাজিয়ে যান। ফোনটা সাংঘাতিক জরুরী!—ফ্লেমিং আশঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠেন।

অবশেষে একসময়ে একটি ঘুমে জড়ানো গলার আওয়াজ শোনা গেল,—ব্যাডফোর্ড স্পিকিং…দ্রুত কণ্ঠে ফ্লেমিং প্রয়োজনের কথা বলে গেল। জন, পেনিসিলিন হাজার হাজার আহত মানুষকে বাঁচাতে পারে। তাঁর প্রমাণ দেওয়ার এটা শেষ সুযোগ। তুমি প্লিজ একবারের জন্যে সামরিক ফোনের আইনটাকে শ্লথ করে আমায় সাহায্য কর। অক্সফোর্ডে ডাঃ ফ্লোরেকে সংবাদ দিতে:একবারের জন্য সামরিক রেডিওটি ব্যবহার করার অনুমতি দাও।

হোম অফিস অফিসার, কিছুটা ইতঃস্তত করার পর ওর অনুরোধ মঞ্জুর করলো। এর দুঘণ্টা বাদে সামরিক মোটর সাইকেলে একজন বার্তাবাহক অক্সফোর্ড থেকে প্রাণদায়িনী ঔষধটিকে নিয়ে দ্রুতগতিতে বোমাবিধ্বস্ত লণ্ডনের রাস্তায় এসে পৌঁছে গেল।

প্রথমেই ১৫০০ হাজার ইউনিটের পেনিসিলিন ইনট্রামাসকুলার ইনজেকসন দিয়ে দেওয়া হল ওসেয়াকে। তখন রাত তিনটে বেজে পঁচিশ মিনিট। সোল্লাসে ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন রোগীর দেহে তৎক্ষণিক উন্নতি। বুকের হাঁফ কমে এল। হিক্কা গেল থেমে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। তিন ঘণ্টা পর পর ইনজেকসন চলতে লাগলো। কণ্ঠদেশের পেশীসমূহের আড়ষ্টতা নমনীয় হয়ে গেল। আধা-অন্ধত্ব কমে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসতে লাগলো। রোগী আলো অন্ধকারে তফাৎ বুঝতে পারছে এখন।

কিন্তু ফ্লেমিং রোগীর স্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা করে সবিস্ময়ে দেখলেন সেখানে পেনিসিলিনের কোন অস্তিত্ব নেই। সর্বনাশ! স্পাইনাল কেনেলের ভেতর দিয়ে পেনিসিলিন চলাচল না করলে, রোগী হয়ত আবার আক্রান্ত হবে। কিংবা চিরস্থায়ী পক্ষাঘাতে হয়ে যাবে পঙ্গু। অক্সফোর্ডের ফোন লাইন এখন খুলে গেছে। ফ্লেমিং ডাঃ ফ্লোরেকে ফোন করে জানালেন,—রোগীর উত্তাপ এখন ৯৭ ডিগ্রীতে নেমে গেছে…ওসেয়ার বিচারশক্তি ফিরে এসেছে…তার হিক্কা বন্ধ হয়ে গেছে…মাথার আক্ষেপও আর নেই।

—আমি ওর স্পাইনাল ঠেকাতে পেনিসিলিন প্রবেশ করাতে চাই। তোমার কি অভিমত ফ্লোরে? তোমার মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি।

তরুণ ডাক্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়,—আমি ঠিক বলতে পারছি না কিছু ডঃ ফ্লেমিং! আমি একটি বেড়ালের স্পাইনাল ঠেকাতে পেনিসিলিন ইনজেকসন করেছিলাম। বেড়ালটা তিন ঘণ্টা বাদে মরে যায়। সত্যি কথা বলতে কি মানুষের শিরদাঁড়ায় ঐ ইনজেকসন করবার কথা ভাবতেও পারি না। এটা খুবই ঝুঁকির কাজ।

টেলিফোন নামিয়ে ফ্লেমিং ভাবতে লাগলেন,—এই উভয়সংকটে তিনি কি করবেন?

শিরদাঁড়ায় পেনিসিলিন না দিলে ওসেয়ার হয়ত জীবনের মত প্যারালিসিসে ভুগবে কিংবা প্রাণে মারা যাবে। আবার যদি পেনিসিলিন মিসফায়ার করে, কিংবা অস্বাভাবিক কোন সাইড এফেক্ট দেখা দেয় তাহলে রোগী ইনজেকসান দেওয়ামাত্র প্রাণত্যাগ করবে। কঠিন সমস্যা।

অবশেষে মরিয়া হয়ে ফ্লেমিং বলে ওঠেন,—লাম্বার পাংচারের জন্যে রোগীকে রেডি করুন। আমি ওকে এক্ষুণি ৫০০০ ইউনিট পেনিসিলিন ইনজেকসন করব। ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে।

ইন্‌জেকসন দেওয়ার পর আধঘণ্টা কেটে গেল। প্যাট্রিক ওসেয়ার বিছানা ঘিরে স্তব্ধ হয়ে আছে উদ্বিগ্নচিত্ত বেশ কিছু ডাক্তার!

ফ্লেমিং-এর শান্ত গলা শোনা গেল,—স্পাইনাল ঠেকাতে ইন্‌জেকসনের পর অবস্থার এখনো কোন অবনতি হয়নি।

লক্ষ্য করুন ওর স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ ফিরে এসেছে। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। মাংসপেশীর কাঠিন্য নেই। জেন্টেলমেন, এ-পেশেণ্ট এখন আরোগ্যের পথে।

এর মাত্র দশদিন বাদে ওসেয়ার শারীরিক দিক দিয়ে কিছুটা ক্ষীণ ও দুর্বল হলেও বেশ উৎফুল্ল চিত্তে সেন্টমেরী হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। তার দেহে তখন আর কোন মেনিনজাইটিস বা স্টাফাইলোকক্কাস সংক্রমণের চিহ্ন মাত্র নেই।

লণ্ডনের ডাক্তারীমহলে গুঞ্জন উঠলো। শেষ পর্যন্ত ফ্লেমিং অসাধ্যসাধন করেছে। পেনিসিলিন নাটকীয়ভাবে রোগীকে মরণের গহ্বর থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ওয়াণ্ডারফুল!

'লণ্ডন টাইমস' বিশেষ এক প্রবন্ধের মাধ্যমে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করলো। যুদ্ধকালীন মিনিস্টার অফ সাপ্লাই স্যার অ্যানড্র ডানকান এ-ব্যাপারে খুবই ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে ইউনাইটেড কিংডমের সব চেয়ে বড় ফার্মাসিউটিকাল ফার্ম প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন তৈরী করতে লেগে গেল।

প্রতিদিন ফ্লেমিং-এর কাছে চতুর্দিক থেকে তাঁরই উদ্ভাবিত মহাসঞ্জীবনী ঔষধের অলৌকিক কার্যকারীতার সংবাদ আসতে লাগলো। হাজার হাজার আহত সৈনিক এবং বোমার আঘাতে আহত অসংখ্য সিভিলিয়ান জনতার বিষাক্ত ক্ষত এই নতুন স্বর্গীয় ঔষধ বীজাণুমুক্ত করে তাদের প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে লাগলো।

১৯৪৩-এর মে মাসে মার্কিন সামরিক বিভাগের কাছ থেকে জরুরী অর্ডার এল আজগুবি পরিমাণ, অর্থাৎ দুই কোটি ইউনিট পরিমাণ পেনিসিলিনের। লাজুক ও অবসর-মানব স্কট ডাক্তার ফ্লেমিংকে 'নাইট হুড' উপাধিতে ভূষিত করা হল। তিনি হয়ে গেলেন স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর অসাধারণ আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়লো।

মানুষের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ পেনিসিলিনের জয়যাত্রা এইভাবে শুরু হল। আজও যা অপ্রতিহত গতিতে মানব কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

১৯৫৫-তে এই মহান আবিষ্কারক ডাক্তার যখন হৃদরোগে দেহত্যাগ করলেন, তখন তার চিতাভস্ম সেন্টপলস গীর্জার নিচের ভল্টে কবরপ্রকোষ্ঠে স্থাপন করা হল। ঐতিহাসিক পুরুষ ওয়েলিংটন এবং নেলসনের সুউচ্চ সমাধি স্তম্ভের পাশেই স্যার আলেকজাণ্ডারের দেহভস্ম রক্ষিত রয়েছে।

'এ. এফ' লিখিত একটি ফ্ল্যাগস্টোন নির্দেশ করছে কোথায় তাঁর চিতাভস্ম নিহিত রয়েছে। এই শান্তশিষ্ট ভদ্র বিনয়ী প্রচারবিমুখ মানুষটির যেমন জীবিত অবস্থায় জাঁকজমক পছন্দ করতেন না, তেমনি মরণোত্তরকালেও কোনপ্রকার জাঁকজমক তাঁর পক্ষে প্রকৃতই বুঝি অপ্রীতিকর হত।

গত ১৯৮০ সালেই পূর্ণ হলো মহান এই আবিষ্কারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো সেই অবিস্মরণীয় ওষুধের।

৩

॥ একটি বীভৎস ভয়াল রোগের কাহিনী ।

বাড়ির গিন্নির ভাঙা কাপে সামান্য আঙুল কেটে গেল…একজন ভদ্রলোক চাষির পায়ে একটা পুরনো পেরেক ঢুকে গেল…একজন ভদ্রলোক দাড়ি কামাবার ক্ষুর-এ গাল কেটে ফেললেন! অকিঞ্চিৎকর আঘাত? হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কত লোক যে এই ধরনের সামান্য কাটা বা নুনছালের আঘাতে মরতে চলেছে তার খবর কজনই বা রাখে। সে কী বীভৎস যন্ত্রণা, চোয়াল আটকে গিয়ে অকল্পনীয় নারকীয় কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

রোগটি কি? তাহলে একটি কেস হিস্ট্রি দিয়েই শুরু করা যাক:

সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ হোমার মিলার গর্বভরে বলতো সারাজীবন ধরে সে কোনপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়নি। সত্যিই তাই, অটুট স্বাস্থ্যের মানুষ মিলার। সানফ্রানসিস্কোর ৫০ মাইল দূরে তার পড়শী খামার মালিকেরা বিপদে আপদে ওরই শরণ নিত। অক্লান্ত নিরোগ মিলার সকলকেই তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত!

এই মিলারই সেবার ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের এক সকালে ২০০০ বছরের লিখিত ইতিহাসের মানবশত্রু এক ভয়াল রোগের খপ্পরে পড়ে গেল।

এই শত্রু বীজাণু এতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে, এরা বাতাসে অণুপরিমাণ এক ধূলি কণার মধ্যে ভেসে বেড়াতে পারে। এবং এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অরি যে কোন দানবাকৃতি মানুষকেও দুমড়ে মুচড়ে অসহনীয় ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট করে, চোয়াল আটকিয়ে, অবশেষে ধনুকাকৃতি আক্ষেপ এবং শ্বাসকষ্ট হয়ে অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে যমালয়ে পাঠাতে সক্ষম। এই উৎকট দেহ কষ্টের পর রোগী বুঝি মৃত্যুতেই স্বস্তি পায়।

মিলার সেদিন তার পোলট্রি ফার্মে একটা কাঠের টুকরো সরাতে গিয়ে – উঃ করে ওঠে। একটা ছুঁচের আকারের কাঠের চোঁচ তার ডান হাতের তালুতে বিদ্ধ হয়। কাঠটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ক্ষত স্থানের বিন্দুসম রক্ত মুখ দিয়ে চুষে নেয়। ব্যাপারটা কিছুই না। অতি নগণ্য আঘাত। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবার পর মুহূর্তেই মিলার যথারীতি তার খামারের অন্যান্য কাজে লেগে যায়। ক্ষেতখামারে কাজ করতে গেলে এ-রকম কত হয়। কেউ তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

কিন্তু হায় এই নগণ্য আঘাতের ফলে মাত্র দু'সপ্তাহ পরে ডাক্তাররা যে তার

জীবনের আশা ছেড়ে দেবে এ-কথা বুঝি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানতো না। এই দুর্গ্রহের কথা পূর্বাহ্নে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করলেও স্রেফ দুষ্ট কল্পনা বলে মিলার সে কথা অট্টহাসি হেসে উড়িয়ে দিত সন্দেহ নেই।

এক সপ্তাহ বাদে ডিনার খাবার পর মিলার তার পত্নীকে বললে, শরীরটা ভাল লাগছে না। গলায় সর্দি জমেছে মনে হচ্ছে। গলাটা কেমন যেন স্টিফ হয়ে গেছে। ঘরে অ্যাসপিরিন আছে?

কিন্তু অষুধ খেয়েও কণ্ঠের আড়ষ্টতা এতটুকু কমলো না। বরং সকালে যেন সেটা আরও বেড়ে গেল। দাড়ি কামাবার সময় মিলারের মনে হল মুখের চামড়া যেন কি রকম শক্ত হয়ে গেছে।

মুখের গালের চামড়া কেমন যেন টানটান হয়ে আসছে। এবার চোয়াল দুটোর মাংসপেশী যেন ইস্পাত কঠোর মনে হল। দাঁত মাজতে পর্যন্ত ভালভাবে পারলো না। মুখ সামান্য মাত্র ফাঁক করতেও প্রচণ্ড লাগছে।

ব্রেকফাস্টের সময় চামচে দিয়ে খেতে গিয়ে চারদিকে খাবার ছিটকে যেতে লাগলো। হাঁ করা দুরস্থান ঠোঁট দুটো ফাঁক করতেই প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। চোয়াল দুটো যেন জমে গেছে মনে হল।

মিসেস মিলার এটা দেখে বিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠে, কি হল কি। মনে হয় তুমি যেন মাতালের মত করছ? তোমায় তো কখনো এত নার্ভাস হতে দেখিনি। এক্ষুণি ডাক্তার দেখাও।

—তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, সে কোনরকমে বলে ওঠে। কথা বলতেও পারছে না ভালভাবে, একটা প্রবল ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারামুখে, চোয়ালে, আমি ঠিক হয়ে যাব। আজ ঐ খামারের নতুন পাম্প কিনতে যেতে হবে স্যামের সঙ্গে।

মিসেস নিজের নিদারুণ উদ্বিগ্নতা চাপবার চেষ্টা করলো। স্বামীর এ-ধরনের মুখবিকৃতি আর কখনো সে প্রত্যক্ষ করেনি। ঠোঁটের দুপাশ নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, কিছু অংশ পেছন দিকে টান টান। মুখের চেহারাটা কেমন যেন সারমেয় ধরনের হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যও সর্বনাশের এই বুঝি শুরু।

এ-জঘন্য রোগটির ডাক্তারী নাম হল "রিসাস্ সারডোনিকাস্" (risus sardonicus). উৎকটভাবে মুখভাব বিকৃতির লক্ষণই হল ডাক্তার বা সার্জনদের কাছে একটি সাইন বোর্ড বিশেষ। তাঁরা বুঝতে পারেন এ-লোকটির অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে। এখন শুধু এর অনিবার্য ভয়ংকর মৃত্যুর যন্ত্রণাকে কিঞ্চিত লাঘব করা ছাড়া করবার আর কিছু নেই।

শরীরের এ-অবস্থায়ও সে নিকটবর্তী স্যান্টা রোজায় গেল। কিছু কাজ সেরে, একটা ট্যাভার্ণ-এ গিয়ে ঢুকলো বিয়ার খেতে।

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে দেখলো সে তা পারছে না। দাঁতে দাঁতে প্রায় লেগে গেছে, ফাঁক করতে গেলে ব্যথায় কম্পনে কট কট ধ্বনী হচ্ছে দাঁতে আর বিয়ার

গ্লাসে। তলপেটে নাড়িছেঁড়া ক্র্যাম্প ধরায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হল। লালচে মুখ সহসা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

উদ্বিগ্ন বার টেণ্ডার বললে, মিঃ মিলার, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সাংঘাতিক অসুস্থ। বাড়ি পৌঁছে দিতে কাউকে সঙ্গে দেব কি?

ইতিমধ্যে মিলারের দুই পা দুই হাতে অসহ্য ক্র্যাম্প শুরু হয়ে গেছে। বুকটা মনে হচ্ছে যেন দশ টন ওজনের পাথরে চাপা। মাথাটা যেন বৃহৎ সাঁড়াশি দিয়ে কে পিষে মারছে। ওর এই ভয়ংকর মুখভঙ্গি দেখে ভয় পেয়ে অন্য মদ্যপরা কাছাকাছি টেবল ছেড়ে দূরে গিয়ে বসলো।

—আ—আ—মি, ঠিক হয়ে—যা-ব, বলে মিলার সে অবস্থায় উঠে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেল। টেবিলের ওপর ফেনায়িত বিয়ারের গ্লাস তেমনি পড়ে রইল অপেয় অবস্থায়। মাথা এবং সারাদেহ বেতসপত্রের মত কাঁপতে শুরু করেছে। ওর মুখ বিকৃতি ও অস্বাভাবিক চলা দেখে দুটি যুবতী মেয়ে বেহেড মাতাল মনে করে প্রায় ছুটে দূরে সরে গেল।

খামারের পথে ছয় মাইল গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হল এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের মত।

হাত বাড়িয়ে গাড়ির গীয়ার চেঞ্জ করতে প্রাণান্তকর অবস্থা হচ্ছিল। হাতের আঙুলগুলো এমন মুষ্ঠিবদ্ধ হল যে, নখ বসে যাচ্ছে হাতের তালুতে। তার নিজের আর কোন ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ নেই যেন ওগুলোর ওপর।

পাগলের মত এঁকে বেঁকে ট্রাকটা চলতে লাগলো রাস্তা দিয়ে···একটা ডাস্ট-বিনকে সজোরে ধাক্কা দিল একবার···স্কুল বাসের জন্য অপেক্ষারত দুটি বালক অল্পের জন্য বেঁচে গেল···জনৈক পথচারী চিৎকার করে উঠলো, মাই গড, লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়ে বেহেড অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছে।

মনে হল যেন অনন্তকাল, এক সময় ট্রাকটা খামার বাড়ির গেট-এ এসে ঢুকলো। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সামনের বাম্পারটা খুলে গেল। মিলারের মুখাবয়ব তখন ভয়ংকর রকম বিকৃত হয়ে গেছে। যেন খুনীর ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে সেখানে। অকস্মাৎ হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। পিঠটা অস্বাভাবিক রকম সোজা হয়ে পেছন পানে ধনুকের মত বেঁকে যেতে চাইছে। দুজন জনমজুর ধরাধরি করে নামিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে তুললো।

সেই রাত্রেই সেই একই ট্রাকে করে মিসেস ওকে দ্রুতবেগে চালিয়ে নিয়ে চললো সানফ্রান্সিস্কোর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নিল হাসপাতাল। বেঁকে যাওয়া দেহটাকে নার্সেরা ওকে ঠাণ্ডা বেড-এ শুইয়ে দিল।

ডাক্তার সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ওর টিটেনাস হয়েছে মিসেস মিলার, যাকে বলে লক্-জ (ধনুষ্টঙ্কার), আপনার স্বামীর অবস্থা গুরুতর। আমরা যথাসাধ্য

চেষ্টা করব সন্দেহ নেই, তবে আশা কম। টিটেনাস হল চরম খুদে রোগ। আমরা চেষ্টা করে যাব, আপনি ঈশ্বরকে ডাকতে থাকুন।

টিটেনাস—সাধারণভাবে লক্-জ (ধনুষ্টঙ্কার) নামে অভিহিত। সেই সুদূর খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও যা ছিল, টিটেনাস আজও তেমনি ভয়াল ভয়ংকর রোগ হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আসছে। সেই সুদূর অতীতে হিপোক্রেটিস যথার্থই লিখেছিলেন যে, এরোগ হয়ে থাকে ব্যাসিলাস্ টিটানি (Bacillus titani)-র টকিসন দ্বারা।

হিপোক্রেটস দত্ত কেস হিস্ট্রিতে জানা যায়ঃ "বিশাল এক জাহাজের মাস্টারের নোঙরের আঘাতে ডান হাতের তর্জনীটি থেঁতলে যায়। সাতদিন বাদে তা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত রস গড়াতে শুরু করে। এরপর লোকটার জিহ্বাতে ঝামেলা দেখা দেয়। সে বলে সে নাকি ভালভাবে কথা বলতে পারছে না। তার চোয়াল আটকে যায়, দাঁতে দাঁত লেগে যায়, কণ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয়। তখন বোঝা যায় শরীরে টিটেনাস প্রবেশ করেছে।"

এর তিন দিন বাদে তার দেহে ওপিসথোটোনস (opisthotonos) দেখা দেয় এবং সর্বঅঙ্গ দিয়ে প্রবল ঘাম ঝরতে থাকে। রোগ নির্ণয়ের ছদিন বাদে মাস্টার মারা যায়। মরে সে বেঁচে যায় বলাই সঙ্গত।

ওপিসথোটোনস হল শিরদাঁড়া-ভাঙা পেশীর আক্ষেপ যা লক্-জ-এর সবিশেষ লক্ষণ। এর ফলে রোগীর মাথা পিঠের দিকে ঝুঁলে পড়ে সমস্ত দেহটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। স্ফীত হয়ে যাওয়া কণ্ঠ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হতে থাকে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আটকে গিয়ে গলা থেকে মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড়ানির মত আওয়াজ বের হয়। পেট ও বুক অসম্ভব ফুলে ওঠে, এবং সে-সব স্থান স্পর্শমাত্র প্রাণ যায় এমন বেদনা শুরু হয়। রোগী তখন ঐকান্তিকভাবে মৃতুকামনা করতে থাকে। কিন্তু তার আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা সে মুখফুটে বলতে পারে না ডাক্তার, নার্স বা আপন জনকে, কেননা তখন তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে, ফুলে ওঠা গলা থেকে কর্কশ গোঙানীর মত আওয়াজ শুধু বের হতে থাকে। এই জান্তব শব্দের সঙ্গে রোগীর কষ বেয়ে লালা নিঃসরণ হয়, অনেক ক্ষেত্রে কথা বলবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় গলা চিরে গিয়ে রক্তও বেরিয়ে আসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।…

হাড় ভাঙতে পারে…সে করুণ ভয়ংকর স্নায়বিক আক্ষেপ ও খিঁচুনি চোখে দেখা যায় না…চোখের তারা পাক খেতে থাকে, ধনুকাকৃতি শক্ত হয়ে যাওয়া সারাদেহ কুলকুল করে ঘাম এসে ভিজিয়ে ফেলে…খাদ্য বা পানীয় কোন কিছুই রোগী গ্রহণ করতে পারে না…।

হাসপাতালের ডাক্তারেরা মিলারের আক্ষেপ বিপর্যস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। আলো অন্ধকারের তফাৎ আর বুঝতে পারছে না তার দুটি

অক্ষিগোলক। সে মরতে চলেছে…তবে এ অসহনীয় অবিশ্বাস্য দেহযন্ত্রণা বেশ কয়েকদিন ধরেও চলতে পারে।

—টিটেনাস অ্যান্টিটক্সিন এখুনি শুরু করে দাও, প্রধান চিকিৎসক নির্দেশ দিল। এটাই হল সাধারণ প্রক্রিয়া, যার দ্বারা পুঁজ ভর্তি ক্ষতস্থানে বীজাণুদের নিঃসৃত বিষ ছড়ানো প্রতিরোধ করে। মাঝে মাঝে এতে কাজ হয়, তবে প্রায়শই বাড়াবাড়ি অবস্থায় এতে সুফল কিছুই হয় না।

—সঙ্গে পেনিসিলিনও দাও।

এর দ্বারা সংক্রমণের বিস্তার কমিয়ে আনবে।

রোগীর এই দুঃসহ কষ্টযন্ত্রণা সাধারণেরপক্ষে প্রত্যক্ষ করাই কঠিন, তায় আপন জন। ডাক্তারেরা মিসেস মিলারকে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

—ওর মাথাটা জোরে চেপে ধরে রাখো, নয়তো উথালপাথালিতে কণ্ঠ জখম করে ফেলবে। আমি একটা সেডাটিভ দিচ্ছি।

দীর্ঘ নিডল্টা মিলারের জলন্ত শরীরে ঢুকে ব্যথা লাঘবের ঔষধটাকে পেশীর মধ্যে ছড়িয়ে দিল। কিন্তু মিলারের কষ্ট-যন্ত্রণার এতটুকু লাঘব পারলক্ষিত হল না।

পুনরায় ডাক্তারেরা রোগীর পুঁজভর্তি ঘাটা পরিষ্কার করে দিল। একজন ফিজিওথেরাপিষ্ট এসে ওর দুমড়ানো, মোচড়ানো হাত পায়ের পেশিসমূহ শিথিল করে দেবার চেষ্টা করে গেল।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে। যে কোন সময় । এবার ওর সিমেন্ট জমা স্ল্যাভের মত শক্ত-শরীরটাকে একটা অক্সিজেন টেন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। যে নার্ভ সেন্টার শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ওপরই টিটেনাসের প্রবণতা সমধিক, ফলে যে কোন সময় রোগীকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলতে পারে। তার প্রতিকারেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হল।

বিষণ্ণ কণ্ঠে এক ডাক্তার বলে ওঠে, কোন কিছুই হেল্প করবে বলে মনে হয় না …ওর অবস্থা শোচনীয়ভাবে খারাপের দিকে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

ডাক্তাররা সর্বক্ষণ ঘিরে দাঁড়িয়ে, আক্সিজেন টেন্টকে ঘিরে। ভেতরে রয়েছে বক্র দুমড়ানো বিকট মুখভঙ্গীসহ যন্ত্রণাকাতর মিলারের দেহটা।

চরম আক্ষেপজনিত দেহটা তার ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। গলা দিয়ে বের হচ্ছে ভীতিপ্রদ জান্তব গোঙানি। মনে হয় সে যেন ভয়াল ফাঁদে পড়া এক হিংস্রপ্রাণী বিশেষ।

আরো সিডেসন…ইনজেকসন…স্ট্র্যাপ দিয়ে বন্ধন, পাছে ছিটকে মেঝেতে পড়ে যায়।

একটা সামান্যতম চোঁচের খোঁচা খাওয়া শক্ত সমর্থ পালোয়ান মানুষটা কিনা কদিনের মধ্যে বীভৎস মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে গেল। চারজন ডাক্তার অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

সহসা তাদের মধ্যেকার একজন ডাক্তার ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠে :

—আমার একটা আইডিয়ার কথা মনে পড়ছে। হয়তো সেটা কার্যকরী নাও হতে পারে, সবটাই ব্যর্থ হতে পারে—তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি…। আমি একটা প্রফেসনাল জার্নালে গ্যাস-গ্যাংগ্রিন ব্যাসিলি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কথা পড়েছিলাম একসময়। তাদের আক্সিজেন চিকিৎসার জন্য কম্প্রেসন চেম্বারে রাখা হয়েছিল এবং তাতে তারা আরোগ্য হয়ে গিয়েছিল। যদিও একথা ঠিক যে, গ্যাংগ্রিন ঠিক টিটেনাসের মত রোগ নয়। তবে উভয় ব্যাসিলিই খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োগে ব্যাসিলিসমূহকে ধ্বংস করা সম্ভব। ঐ প্রক্রিয়া টিটেনাস রোগীর ক্ষেত্রেও ফল দর্শাতে পারে।

—এ চিকিৎসা সম্বন্ধে কে লিখেছিলেন? এখুনি তাঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে চাই।

ডাক্তারটি মুখ ভ্রূকুটি করলো। লেখকের নাম কি? সে মনে করতে পারলো না…এদিকে হাসপাতালের লাইব্রেরীও রাত্রির মত বন্ধ-করে চাবি দিয়ে লাইব্রেরিয়ান বাড়ি চলে গেছে আধ ঘণ্টা আগে। মহামুস্কিল। একজন সার্জেন তখন একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সে ঘরের দরজা খুলে ফেললো। সব ডাক্তার মিলে পাগলের মত তখন যাবতীয় প্রফেসনাল জার্নাল বের করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা-খুঁজে দেখতে লাগলো সেই আর্টিকলটির সন্ধানে।

ঘড়িতে দশটা বাজলো। সময় এবং রোগীর জীবন দ্রুত বয়ে যাচ্ছে।

—এই যে পেয়েছি। এ কেস হিস্ট্রির লেখক হলেন আমস্টারডামের উইলহেলমিনা হাসপাতালের ডাঃ আই বোয়েরেমা। এখুনি ট্রাঙ্ক কল করো তাঁকে।

সানফ্রানসিস্কো থেকে সাগর পাড়ের অপারেটরকে ধরতে প্রথমটা খুবই ঝামেলা হল। লাইনে এত আওয়াজ যে ওপারের সেই সুদূর দেশ থেকে বলা কথার এক বর্ণও বোধগম্য হল না। শোনাই যাচ্ছে না।…টেলিফোন কানে ডাক্তার চিন্তিতভাবে নিজ হাতঘড়ির পানে তাকালো। সে এবার চিৎকার করে বলে উঠলো :

—হ্যালো অপারেটর? এটা একটা জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপার…আমস্টার-ডামের ডাঃ আই বোয়েরেমাকে সিগ্‌গির দিন। কি বলছেন? সার্কিটগুলো ব্যস্ত আছে? গুড গড, তরই একটা ডিসকানেক্ট করে আমায় আগে দিন। আমাদের অপেক্ষা করবার সময় নেই।

আবার ফোনের মধ্যে কটকট কটকট শব্দ…কিছু গোঁ গোঁ আওয়াজ…পাক্কা অসহনীয় পনের মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেল। এবার কথা শোনা গেল বটে তবে ওলন্দাজ অপারেটর ডাক্তারের ভাষক বুঝতে পারলো না প্রথমটা। অবশেষে প্রায় ২৮ মিনিট পার হবার পর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে একজন কথা কয়ে উঠলো :

—সরি, ডাঃ বোয়েরেমা এক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলে গেছেন। তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এমন সময় ফোনের কাছে একজন নার্স এসে বললে, আপনি

এখুনি একবার আসুন ডকটর, মিষ্টার মিলারের অবস্থা সাংঘাতিক।

একজন ডাক্তার ছুটে চলে গেল। ফোন ধরা ডাক্তার সাগরপারের লোকটাকে ডাঃ বোয়েরেমার অ্যাসিস্টেন্টের নামটা জানতে চাইল। আবার কালক্ষয়। কট কট খট খট...নিস্তব্ধ...প্রায় আট মিনিটের মত লাইন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রইল। অবশেষে ফোন পুনরায় চালু হল :

—হ্যালো! ডাঃ বোয়েরেমার সহকারী বলছি। কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বল না। সুদূর হল্যাণ্ড থেকে ভেসে এল সে কণ্ঠ।

কাছে থাকা একজন ইনটার্নি ক্লান্ত শ্রান্ত চিন্তিতও কিছুটা হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

ওলন্দাজ সেই ডাক্তার কালিফোর্নিয়ার এই সার্জনের সঙ্গে টানা পনের মিনিট ধরে কথা বলে গেল। অবশেষে আমেরিকার ডাক্তার ফোন রেখে দিয়ে বলে উঠলো, ইটস্ এ বিগ জব। আমাদের এখন একটা কম্প্রেসন চেম্বারের সন্ধান করতে হবে। যে যন্ত্রটা টানেল কর্মী বা ডুবুরিদের বক্রতা রোগ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে যন্ত্র ধীরে ধীরে তাদের ওঠবার বা নামবার মুখে ডিকম্প্রেস করে। কিন্তু এই রাত্রে সে যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবেই বা কোথায়?

সানফ্রানসিস্কোর যাবতীয় জাহাজ নির্মাণ কোম্পানী এবং কন্ট্রাকটরদের ফোন করে কোন কাজ হল না। তাদের কাছে ঐ যন্ত্র নেই।

অবশেষে ৫০ মাইল দূরের সান জোস-এর এক কন্ট্রাকসন সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ঘুমজড়িত কণ্ঠে আশ্বাসবাণী শোনাল। তার কাছে ৬×১৬ ফুটের একটি ৪ টন ওজনের সেই ইস্পাত দাসবরূপী কমপ্রেসন চেম্বার আছে। সে তা দিতে রাজি।

—প্রথমেই বলে রাখি হাইওয়ে পেট্রলরত পুলিশদের আগে ভাগেই জানিয়ে রাখুন। এ বিরাট ওজনের যন্ত্রকে দ্রুতবেগে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। যদি মাঝ পথে আমাদের রুখে দেওয়া হয় বা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ি, তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাবে ওটা পৌঁছতে।

স্টেট পুলিশকে যথারীতি অনুরোধ জানানো হল। পেট্রলকার পাইলট হিসেবে সাহায্য করে সেই ইস্পাত দানববাহী ট্রাককে ৫০ মাইল পথ তিন ঘণ্টায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করলো। রোগীর ভর্তির ১৪ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ।

রাত একটার সময় এসে পৌঁছলো সে মেসিন, হাসপাতালের একটা খোলা স্থানে সেটাকে কাঠের একটা পাটাতনে স্থাপন করা হল।

হিলারের শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটা নিয়ে গিয়ে সেই কম্প্রেসন চেম্বারে স্থাপন করা হল। ডাক্তারেরা অক্সিজেন মুখোশ পরে তার সঙ্গে ঢুকে গেল সেই চেম্বারে। গিয়ে ভেতর থেকে লোহার দরজা বন্ধ করে দিল।

জ্ঞানহীন রোগীর সঙ্গে ভেতরেই তারা রয়ে গেল। চেম্বারের অভ্যন্তরে শক্তিশালী ৫০ শতাংশ অক্সিজেনের বন্যা বইয়ে দেওয়া হল।

—আরো প্রেসার! ডাক্তারদের ইঙ্গিতে ঘরের আকারের সিলেণ্ডারের মধ্যে মিটারের কাঁটা উঠলো ৩৪ ইঞ্চি…৩৯ ইঞ্চি…৪০ ইঞ্চি…তারপর ৪৪ ইঞ্চি ··এই অবস্থায় ঘণ্টা দুই থেকে চাপ ক্রমশঃ স্বাভাবিকতায় নামিয়ে আনা হল।

রোগীর দুমড়ানো শরীরের প্রতিটি কোষ-এ অক্সিজেন ঢুকে গিয়ে টিটেনাস বীজাণুদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। কারা জিতলো তখনই তা বোঝবার উপায় ছিল না। রোগীকে সন্তর্পণে ফের হাসপাতালের বেড-এ নিয়ে শোয়ান হল। সেখানে তাকে ফের অক্সিজেন টেন্টের মধ্যেই স্থাপিত করা হল।

পুরো বারো ঘণ্টা বাদে ফের তাকে নিয়ে আসা হল কম্প্রেসার চেম্বারে। আবার অক্সিজেন প্রেসার দেওয়া হল…ইতিমধ্যে তার ফ্যাকাসে মুখে কিঞ্চিৎ রক্তিমভাব দেখা গেল…ভয়ংকর বিকৃত মুখের ব্যাস যেন কিঞ্চিৎ নরম হয়ে এল। শিঘ্রই তার নিপীড়িত পেশিসমূহের মধ্যে শিথিল ভাব ফিরে এল কিছুটা… ধনুকের মত বাঁকানো শরীর সোজা হয়ে এল। মিলারের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল। স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তিশালী অক্সিজেন তার দেহে ঢুকে টিটেনাস ব্যাসিলিদের পর্যুদস্ত করে যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে। বিরাট এক বিজয় হয়েছে তাদের

জীবিতের চেয়ে সমধিক মৃত মিলার হাসপাতালে ভর্তি হবার পাঁচ দিনের মধ্যেই অর্থাৎ কম্প্রেসন চেম্বার চিকিৎসার তিনদিন বাদে মিলার তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে প্রথম কথা বলা শুরু করলো। তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। বন্ধ চোয়াল আলগা হয়ে গিয়েছে। সে তখন অনায়াসে দুধ বা জল গলধঃকরণ করতে পারছে। ঐ ভয়ংকর টিটেনাসের ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞান সত্যি সত্যিই জয়ী হয়েছে। মানবসমাজের বহু কালের প্রাচীন ও ভয়াবহ এক শত্রুকে কব্জা করা সম্ভবপর হয়েছে……

অবশ্য কম্প্রেসন চেম্বার চিকিৎসার আরও বহুবার এক্সপেরিমেণ্ট হওয়া দরকার। তার আগেই একে অব্যর্থ চিকিৎসা বলে আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। লক্-জ থেরাপি বলে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করাও উচিত নয়। তবে মিলারের ডাক্তারদের এটা নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, কম্প্রেসন চিকিৎসা পেনিসিলিনকে ঐ বিষাক্ত টিটেনাস বীজাণু দ্রুতলয়ে ধ্বংস করতে অবশ্যই সাহায্য করে। অবশ্য টিটেনাস জীবাণুনাশে অক্সিজেনের কতটুকু ভূমিকা তা অবশ্য এ পরীক্ষা দ্বারা তেমন সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

এই ধনুষ্টংকার রোগের ব্যাপারে সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা হল যে, যদিও পরিপূর্ণ-ভাবে একে ভ্যাকসিনেসনের দ্বারা অতি সহজে পূর্বাহ্ণেই রোখা যায়, আর টিটেনাস টক্সয়েড অতি সস্তা এবং সহজলভ্য। তবুও খুব কম মানুষই এই অব্যর্থ প্রতিষেধক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে থাকে।

প্রতিটি সৈনিকের অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকসন নেওয়া আবশ্যিক। আজকাল শিশু জন্মানোর কিছু পরেই তাদের ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া হয় এবং তিনচার বছর অন্তর বুস্টার দিয়ে থাকে। তারা নিরাপদ হয়ে যায়।

এই জীবনদায়ী টক্সয়েড না দিলে কেউই ঐ মারাত্মক টিটেনাস রোগ থেকে নিরাপদ হয় না।

পিনের ডগার মত সূক্ষ্ম টিটেনাস রেনুসম বীজাণু আমাদের চারপাশেই নিয়ত অবস্থান করছে, বংশবৃদ্ধি করছে। তারা রয়েছে বাতাসে ধূলোয়, মরচের মধ্যে, সার-এ এবং বহুপ্রাণীর অন্ত্রের নাড়ীতে।

কালান্তক বীজাণুরা অপরাপর জীবাণুর মত বাতাস বা সূর্যকিরণের সংস্পর্শে এসে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু টিটেনাস বীজাণু এমনই শক্ত কঠিন কঠোর ব্যাসিলি যে অধিকাংশ অ্যান্টি-সেপটিকের কাছেই এরা অভেদ্য। অত্যধিক উষ্ণতা বা শীতলতা এদের কাবু করতে পারে না। ব্যাকটেরিওলজিস্টরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুনেদের তরিতরকারী, খড়, চুল, মাকড়সার জাল, পোষাক আষাকের মধ্যেও আবিষ্কার করেছে। এমন কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্বীজন করা হাসপাতালের অপারেশন রুমেও পেয়েছেন।

এই খুদে বীজাণুরা যে কোন ক্ষুদ্র ক্ষতের মধ্যে, যা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়, ঢুকে পড়তে খুবই ভালবাসে। যেমন ঢুকেছিল মিলারের হাতের তালুতে। ক্ষত বন্ধ হলে ওদের আরও মজা, শত্রু অক্সিজেনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মানুষের দেহের সর্বত্র অবাধে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধে পেয়ে যায়। এর অনতিকাল মধ্যেই রোগীর দেহে রোগের লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। রোগীর আর জীবনের আশা থাকে না।

লক্‌-জ বা ধনুষ্টঙ্কার ওৎ পেতে থাকে সর্বত্র। ধনীর প্রাসাদ থেকে গরীবের কুঁড়ে, কয়লাখনি থেকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বাড়ির সামনেকার ফুলের বাগান সর্বত্রই এদের অবাধ বিচরণ। শিশু, মালী, চাষি, কলকারখানার কর্মী এবং সৈনিকদেরই এ রোগাক্রমণের ভয় সবচেয়ে বেশি। কারণ এরাই মরচে পড়া বস্তুর সংস্পর্শে বেশি আসে। খেলতে বা কাজ বা লড়াই করতে গিয়ে প্রায়শই কোন না কোন স্থান কেটে ছিঁড়ে যায়, তাতে লেগে যায় ঐ বীজাণু থাকা ধুলো বা সার প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় মৃত্যুসম রোগটি।

যদিও টিটেনাস রোগটি ছোঁয়াচে নয়, তবু সেবার ১৯৪২-এ নিউইয়র্ক নগরীর মেডিকাল কর্তৃপক্ষ একটা ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে গেল। টিটেনাস যে ছোঁয়াচে নয় এ বিশ্বাসটা নষ্ট হবার উপক্রম হল পরপর কয়েকটি রোগীকে দেখে।

জানুয়ারী মাসের এক সকালে মহামারী বিশেষজ্ঞ ডাঃ মরিস গ্রীনবার্গ একটি রিপোর্ট পড়ে হতবাক হয়ে গেল। রিপোর্টে রয়েছে চারজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষের প্রায় একই সঙ্গে ভয়াল টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর বিশদ বিবরণ। সবগুলো কেসই এসেছিল রুজভেল্ট হাসপাতালে।

ডাঃ গ্রীনবার্গ ডিপার্টমেন্ট অফ হেল্‌থের প্রধানকে ফোন করে বললেন, এতো বড় অদ্ভুত ঘটনা। পাঁচ পাঁচজন লোক টিটেনাসে একই হাসপাতালে মারা গেল। প্রত্যেকেই অবিবাহিত, সান জুয়ান হিল এলাকায় প্রত্যেকের বাড়ি। যতদূর জানি কেউ কারুর পরিচিত নয়। বয়স ২৫ থেকে ৬১। একটা জিনিসে পাঁচজনের মিল দেখা যায় যে প্রত্যেকেই হেরইন-আসক্ত।

কিন্তু এরা লক্‌-জতে মারা পড়লো কেন? এরা কি নেশার ব্যাপারে একই ইনজেকসন নিড্‌ল্ ব্যবহার করেছিল? কিম্বা এদের নেশাদ্রব্য কি পূর্বাহ্নেই ভেজাল অর্থাৎ উক্ত রোগজীবানু আকীর্ণ ছিল? যদি ঐ ছুঁচ বা ঐ হেরইন এখনো অপরাপর অ্যাডিক্টরা ব্যবহার করে চলে তো অবিলম্বেই আরও কিছু টিটেনাসাক্রান্ত রোগীর সৃষ্টি হতে চলেছে এই নগরীতে। কিন্তু এই লোকগুলোর কিভাবে এবং কেন এ-রোগ ধরলো?

ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের ডাঃ সিঙ্গারের কাছেও এ রিপোর্টের কপি ছিল। সে ভালভাবে খতিয়ে দেখতে লাগলো রোগীদের কেস হিস্ট্রিসমূহ।

ব্যাব মিলার মারা যায় ২৯শে ডিসেম্বর, জ্যানিটা জ্যাকসন-এর দুদিন বাদে। জোসেফাইন মরে নিউইয়ার্স ডেতে। ইডা মেটকাফের জীবনান্ত হয় ৩রা জানুয়ারী। চার্লস উইলিয়ামের বর্তুলাকার ভয়াবহ দেহাবসান হয় ৮ই।

ওদের পাঁচজনেরই দেহে হেরোইন ঢোকানোর ইনজেক্‌সনের ফুটো ছাড়া আর কোনপ্রকার আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি। একজন ডাক্তার সখেদে বলে ওঠে, নির্বোধ বেচারারা। ড্রাগ অ্যাডিকসন খুবই খারাপ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তাবলে এই ভাবে মৃত্যু ··? ম্যানহাট্টানে অজস্র বদমাইস নেশা আসক্ত রয়েছে, আমি স্বপ্নেও তাদের এভাবে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারি না। তবে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এই বেচারারা কি ভাবে এবং কখন বা কোথায় এ-রোগে সংক্রামিত হল। অপরাপর মানুষদের বাঁচাবার তাগিদেই এই মৃত পাঁচজনের বিষয় আমাদের ভালভাবে খবরাখবর নিতে হবে।

পাবলিক হেল্‌থের সকলেই জানেন যে, টিটেনাস হল ষ্ট্রিকনাইনের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশি মারাত্মক। অবশ্য মানবদেহে দুটির কার্যকরীতা উপসর্গ এবং ফলের মধ্যে খুবই মিল দেখা যায়।

৬১ বছরের উইলিয়াম ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা ও চোয়ালবন্ধ অবস্থায় এসে ভর্তি হয় হাসপাতালে। পরীক্ষা করে ডাক্তাররা দেখে লোকটা তিন বছরের ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক লক্ষ ইউনিট টিটেনাস অ্যান্টি টক্সিন দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল দর্শায় না। চব্বিশঘন্টা পর প্রবল আক্ষেপ দেখা দেয় সারা দেহে, বেডের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখতে হয়। অসহায়ভাবে ডাক্তাররা প্রত্যক্ষ করে লোকটার ভয়ংকর মৃত্যু।

দ্রুত মিটিংএ বসে যায় ডাক্তারেরা। এ নগরীর কোথাও একটা উৎস রয়েছে

ঐ ভয়াল রোগ বীজাণুর, যা বিশেষ করে ড্রাগ অ্যাডিক্টদেরই ধরছে।

—আর দেরী করা উচিত নয়, তাহলেই সর্বনাশ। কত নেশাখোর এ-রোগে মারা পড়বে তার ইয়ত্তা নাই। ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে সে উৎস।

ডাঃ জোনাস নামের ৩০ বছর বয়স্ক একজন চিকিৎসক ছিল টিটেনাস বিশেষজ্ঞ। সেও এ-ঘটনা শুনে বিহলপ্রায় হয়ে গেল। তার কাছে জরুরী নির্দেশ গেল।

“অন্য সব কাজ ছেড়ে এই রেগের অজ্ঞাত সেই উৎসটির সন্ধানে এখুনি লেগে যাও। এ-লোকগুলো যে হেরোইন ব্যবহার করতো তা খুঁজে বার করো, যে ইনজেকসনে তা দেওয়া হয়েছে সেটার সন্ধানও চাই। আর ঐ নেশাদ্রব্যের বিক্রেতা বা ইনজেক্সনকারীকেও আমাদের চাই। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। আমাদের বার করতেই হবে কি ভাবে মৃত ঐ পাঁচজনের দেহে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করেছিল।”

ডাঃ জোনাস কাজে লেগে গেল তৎক্ষণাৎই। তার কাছে বা সামনে এ-ব্যাপারে ক্লু বা সাহায্যকারী কেউই ছিল না। ড্রাগ অ্যাডিক্টরা বড় সাংঘাতিক মানুষ। তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাদের কাছ থেকে কথা বের করা এক অসম্ভব ব্যাপার। ঐ কুখ্যাত সান জুয়ান হিল অঞ্চল থেকে কোনপ্রকার সাহায্যের আশা করাই বৃথা। অথচ চেষ্টা তো করে যেতেই হবে। অ্যাডিক্ট—পুশার—বার মালিক বা গণিকাদের কাছে গিয়ে চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

—আপনি বলছেন আপনি একজন ডাক্তার, ঐ অঞ্চলের একজন জুতোপালিশ-ওয়ালা ছোকরা মুখ বিকৃতি করে ওঠে, আমায় আর হাসাবেন না মিস্টার। আপনি একজন পুলিশ। ডাক্তার বলে নিজেকে চালাচ্ছেন। না না, যাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছেন তাদের কাউকে আমি জানি না চিনি না জেনে রাখুন।

ঐ নোংরা অঞ্চলের ততোধিক নোংরা রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে লাগলো ডাঃ জোনাস। বারটেণ্ডার, ভবঘুরে, রেসের দালাল, দোকানদার প্রভৃতি প্রত্যেককে ধরে ধরে জিগ্যেস করতে লাগলো ঃ

—আপনি কি ব্যাব মিলার সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

—না।

—কিংবা জ্যানিটা জাকসন, অথবা জোসেফাইন ? অথবা ৬০ বছরের ড্রাগ অ্যাডিক্ট চার্লস উইলিয়ামস ?

—বলছি না, জানি না। কেটে পড়ুন মিস্টার, বিরক্ত করবেন না। পুলিশকে আমরা কিছু বলি না।

—ড্যাম ইট ম্যান। আমি আদৌ পুলিশ নয়। আমি একজন ডাক্তার। এই দেখুন কার্ড-এতে লেখা আছে-আমি পাবলিক হেল্থের একজন চিকিৎসক। শুনুন ভাই, ব্যাপারটা খুবই জরুরী। বহুলোকের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। আমার

এমন কাউকে পেতেই হবে যে, ঐ পাঁচজন মৃত ব্যক্তিকে চেনে, যাতে আর পাঁচজন না বেঘোরে মারা পড়ে।

প্রচণ্ড মুখ ভ্রূকুটি। অকারণে থুথু ছেটান রাস্তায়। থুথু ছেটান ডাঃ জোনাসের জুতোয়…

—চালাকি ছাড়ো বিগ বয়। তুমি একজন পুলিশ টিকটিকি—কিছু জানি না আমি। হাওয়া কাটো টিকটিকি মিস্টার।

চার ঘন্টা অন্তর এথেলেট চেহারার চশমা পরা এই ডাক্তার রাস্তা থেকে তার অফিসে ফোন করতে লাগলো। আর কোন নতুন টিটেনাস রোগীর সংবাদ পাওয়া গেছে কি ? না ? থ্যাঙ্ক গড। সে প্রতিদিন প্রত্যেকটি হাসপাতালে একই প্রশ্ন করে চলেছে। যদি কোন নতুন লক্-জ রোগী আসে নজর রাখুন, বিশেষ করে সে রোগী যদি হয় ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তাহলে এমুহূর্তে ডিপার্টমেন্ট অফ হেল্থকে জানিয়ে দেবেন।

ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোস্কা, শরীরে ক্লান্তি। ডাঃ জোনাস এক সময় একটি রেষ্টুরেন্টে ঢুকে কিছু খাদ্য ও গরম চকোলেট খেতে ও পান করতে লাগলো। বাইরে ভীষণভাবে তুষারপাত হচ্ছে। শরীর ঠাণ্ডায় জমে যাবার দাখিল। কি শয়তান লোকগুলো। কিছুতেই মুখ খুলছে না। এই গোটা অঞ্চলের কেউ না কেউ অবশ্যই খবর রাখে ঐ মৃত পাঁচজনের। ঠিক এই মুহূর্তে কোন না কোন নেশাখোর না জেনে সেই বীজাণুদুষ্ট হেরোইন তাদের রক্তস্রোতের মধ্যে চালান করে দিচ্ছে। অজ্ঞাতে সেই কালান্তক ক্লোস্ট্রিডিয়াম টেটানি (Clostridium Tetani) বীজাণুকে স্বদেহে প্রবেশ করিয়ে নিজের মৃত্যুর সার্টিফিকেটে নিজেই স্বাক্ষরদান করে চলেছে।

চরম ক্লান্ত ডাঃ জোনাস একটা ট্যাক্সি নিয়ে বরফাচ্ছাদিত রাস্তা ধরে চলে গেল রুজভেল্ট হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে মেডিকাল রেকর্ড রুমে ঢুকে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। মৃত পাঁচজনের কেস হিস্ট্রিগুলোর প্রতি আবার চোখ বোলাতে লাগলো যদি কোন নতুন ক্লু কিছু নজরে আসে।

পঞ্চাশ বছর বয়স্কা মহিলা লাইব্রেরিয়ান শ্রান্ত ক্লান্ত ডাক্তারকে এক সময় বলে ওঠে, কোন কিছু বিশেষ কাগজ পত্র যদি চান তো আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি ডক্টর।

—না, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি আরেকটি টিটেনাস রোগীর সন্ধান করছি। বরং বলা যায় প্রতীক্ষা করছি নতুন এক লক্-জ রোগীর জন্য।

কথা শুনে বিস্মিত হল মহিলা। পরিহাস করছে নাকি ডাক্তার ? পরক্ষণে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ওয়েট এ মিনিট ডকটর! আপনাকে একটি নতুন কেস-এর সংবাদ দিচ্ছি।

বলে লাইব্রেরিয়ান মহিলা কতগুলো কাগজ ঘেঁটে একটা কাগজ নিয়ে এল।

ডাঃ জোনাস তাতে চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলো। আশার আলো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো তার চোখে মুখে।

নতুন এক টিটেনাস রোগী ভর্তি হয়েছে ৫ তারিখে, নাম তার মেরিয়া গোমেজ, বয়েস ৪২, সাংঘাতিক মাথাধরা ও বমিভাব, শক্ত-ঘাড় এবং বন্ধচোয়াল নিয়ে এই হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছে। আর এ-রোগীটিও একজন ড্রাগ অ্যাডিক্ট। একটি মাত্র অ্যান্টিটক্সিন ইনজেকসন নিয়ে ভাল হয়ে গিয়ে ১৪ তারিখে হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছে।

চমৎকার খবর। হেরোইন নেশারু টিটেনাস রোগী নিরাময় হয়ে ফিরে গেছে প্রাণ নিয়ে। ভেরি গুড! এবারে তাহলে এই মহিলার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব সংবাদই পাওয়া যাবে। সরবরাহকারী বা পুশার-এর কাছে এ-রোগী নিশ্চয়ই নিয়ে যেত পারবে। এবার তাহলে বহু লোককে বাঁচানো সম্ভব হবে।

মেরিয়ার বাড়িওয়ালা যেন তেড়ে এল ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। বেরিয়ে যাও, গেট আউট। মেরিয়া গোমেজ আর এখানে থাকে না। তিন হপ্তার ভাড়া মেরে পালিয়েছে শয়তানিটা। তার বর্তমান ঠিকানাটা? ন্যাকা! কি করে জানব আমি? তাহলে তো আমিই গিয়ে ঘাড়ে ধরে ভাড়াটা আদায় করে নিতে পারতাম। যতোসব···।

বলে সেই উগ্রচণ্ডী বাড়িওয়ালাটি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

—কি স্যাড বলুন, ডাঃ জোনাস ডাঃ গ্রীনবার্গকে বললে, হাতে পেয়েও পাখি উড়ে গেল। এখন আমাদের অবস্থা যেখানে শুরু করেছিলাম ঠিক সেখানেই পেছিয়ে গেল। তবে এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে সিগ্‌গিরই আরেকটি টিটেনাস কেস আমাদের হাতে আসবে। মেরিয়া গোমেজএর সংক্রমণই তা বলে দিচ্ছে।

আবার সেই নোংরা স্লাম এলাকায় ভ্রমণ, আবার তেমনি নেশারু-শ্রেণীদের কাছ থেকে যাচ্ছেতাই ব্যবহার শুরু হয়ে গেল ডাঃ জোনাস-এর। গালা-গাল, থুথু ছেটানো, অপমান এবং ভয়াবহ শাসানির বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। পাঁচজন ধনুষ্টংকারে মৃতের কোন অতীত কাহিনী পাওয়াই গেল না।

এক রাত্রে বিফল সব ইন্টারভিউ করে যখন ডাঃ জোনাস বাড়ি ফেরবার উপক্রম করছে, এক অন্ধকার গলির মধ্যে পেছন থেকে এগিয়ে এল কজন যুবক। ঘাড়ে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে তাদের একজন কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করে উঠলো :

—সঙ্গে যা কিছু পয়সাকড়ি আছে দিয়ে দাও মিস্টার, নয়তো প্রাণ যাবে তোমার। ডাঃ কোন প্রতিরোধ করলো না। ছিনতাইকারী যুবকদ্বয় তার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে নিল। আজই সে তার পে-চেক ক্যাশ করে হাতে পেয়েছিল ২৪৩ ডলার। সব গেল। যাবার সময় পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে গেল দুবৃত্তরা। রক্তাক্ত মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেল ডাক্তার।

মাথায় মুখে এগারটা স্টিচ করা অবস্থায় এর ঠিক দুদিন বাদেই ফের ডাক্তার ফিরে এল সেই কুখ্যাত অঞ্চলে। মুখে সেই একই প্রশ্ন :

—একটু ভেবে দেখুন বন্ধুগণ চার্লি উইলিয়ামস্‌কে চেনেন কি? জোসে

ফাইনকে ? ব্যাব মিলার ? না ? তবে মেরিয়া গোমেজকে। কিছুদিন আগেও সে এই অঞ্চলেই বসবাস করতো। টিটেনাস আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। এ-রোগ প্রকৃতই খুনে, আমরা অন্যান্যদের বাঁচাতে চাই।

—চুলোয় যাও তুমি…।

—কে তুমি বটেহে ? ফেডারেল ডিটেকটিভ ?

—কিচ্ছু জানি না আমরা…কেটেপড় দিকিনি…আমরা ব্যস্ত আছি…।

সেটা ছিল ৭ই ফেব্রুয়ারী। ডাঃ জোনাস একইভাবে দিনে পনের ঘণ্টা ধরে এই ভাবে অঞ্চলটা চষে ফেলছিল। এভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল নিষ্ফলা। তাকে চিনে গেছে সবাই। তার পক্ষে যাবতীয় দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মুখে সবার কুলুপ আঁটা। হায়রে, এর ফলে আরও কত মানুষ যে টিটেনাস-এর খপ্পরে পড়ে মারা যাবে তা কি এই নির্বোধ ছোটলোকগুলো বুঝবে ?

তার ব্যাচেলার অ্যাপ্টমেন্টে একদা রাত ১৮-৫ তে টেলিফোন বেজে উঠলো। নগরীর হারলেম হাসপাতালের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ফোন করছে ঃ

—হ্যালো ডাঃ জোনাস, আপনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। আজ বিকেলে এখানে একজন নতুন টিটেনাস রোগী ভর্তি হয়েছে। এই যুবতী পেশেণ্টটিও হেরোইন আসক্তা, বয়েস ২৬ বছর, অবিবাহিতা। বাস করত পশ্চিম ১৪০ স্ট্রীটে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সে তার নিজ ঘরে পড়েছিল পুরো তিন দিন। পরে পড়শীরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠায়। অবস্থা খারাপ, তবু যদি দ্রুত আসতে পারেন তো ওর কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেতেও পারেন।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, কোটটা পরতে পরতে দু-তিন সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঃ জোনাস নেমে এল রাস্তায়। গাড়ির অভাবে বেশ খানিকটা পথ প্রায় দৌড়ে আসতে হল। অবশেষে একটা ট্যাক্সি পেয়ে চলে এল হারলেম হাসপাতালে। যুবতীটি কি কথা বলতে পারবে ? না পারলেও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাতে কিছু লিখে জানাতেও পারবে।

লিফ্‌টে উঠে করিডোর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল রোগীর ঘরের দিকে। পথেই একজন নার্সের সঙ্গে দেখা, সে সখেদে বলে ওঠে, আই অ্যাম সরি ডাঃ জোনাস… মিলড্রেড স্টুয়ার্ট, আই মিন পেশেণ্টটি ১৫ মিনিট আগে মারা গেছে।

আবার সেই অন্ধ-গলিপথ। আশার ঝলকানি রহস্যের উন্মোচনের আভাস… ফের যে তিমিরে সেই তিমিরে। নিয়তির প্রচণ্ড আঘাতে ফের হতাশাসায়রে ডুবে যেতে হল। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর পবিত্র বাসনায়ও কত না বাধা, কত না বিপত্তি।

মিলড্রেডের বাড়িউলী অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃতার ঘর দেখবার অনুমতি দিল। সপ্তাহে ৭ ডলার ভাড়ার ঘরে একটা জুতোর মধ্যে পাওয়া গেল মাত্র ৩ ডলার। চারটি আধ ময়লা ড্রেস। আধ ছেড়া একটা স্কার্ফ। আর পত্রিকা থেকে কাটা "কি

ভাবে, ড্রাগ অ্যাডিক্ট থেকে নিরাময় হওয়া যায়”—লেখা এক বিজ্ঞাপন। ঘরে কোন সিরিঞ্জ ছিল না বা এক ফোঁটা হেরোইনও পাওয়া গেল না ঘরে।

সেদিন রাত দশটায় ডাঃ জোনাস একটা বাস থেকে নামলো গিয়ে ঐ অঞ্চলের স্লাম অধ্যুষিত এক এলাকায়, যেখানে অল্প কিছুদিনের জন্যে মেরিয়া গোমেজ বসবাস করেছিল।

গত সপ্তাহে প্রশ্ন করার সময় ওপর তলার জানালা দিয়ে একজন স্ত্রীলোক তার মাথায় এক বালতি সাবান জল ফেলে দিয়েছিল। পাশের বাড়ির একজন খোঁড়া লোক তাকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কুকুরটা ভীষণ বেগে এসে কামড়ে তার প্যান্টের অগ্রভাগ ছিঁড়ে দিয়ে তবে ছেড়েছে।

তবু সে আজ আবার এসেছে সে অঞ্চলে।

—হে বাড্, তুমিই সেই ডাক্তার যে এখানে নিত্য নাক গলিয়ে বেড়াচ্ছ, তাই না?

ডাঃ জোনাস চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো একটা জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে বছর পঁচিশেকের এক ছোকরা কথা বলছে।

—হ্যাঁ, আমিই ডিপার্টমেণ্ট অফ হেল্‌থের ডাঃ জোনাস। আমি খোঁজ করছিলাম ··

—আমি জানি মিষ্টার, ছোকরাটি বলে ওঠে, মেরিয়া গোমেজতো? ও কে, ডক্ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি পুলিশ নও বা ইনকামট্যাক্সেরও লোক নও। সোজা চলে যাও—ওয়েষ্ট ৫২ স্ট্রীটে। সেখানে গিয়ে মিসেস জনসন-এর খোঁজ কর, সেই হল মেরিয়ার একজন বান্ধবী। সে হয়ত বলে দিতে পারবে মেরিয়ার বর্তমান আস্তানা।

ছোকরাকে ধন্যবাদ জানাবার আগেই ঝপাং করে বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা। ডাক্তারের মনে ফের আশার আলো জ্বলে উঠলো। হয়তো এটা একটা ভাঁওতাও হতে পারে, তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

উপরোক্ত ঠিকানার বাড়িটি অতীব পুরনো এবং জীর্ণ। বাড়ির মধ্যে পচা মাছ ভাজার গন্ধ, কাঠের পাটাতন ও সিঁড়ি নড়বড়ে। পাঁচতলায় উঠে গিয়ে ‘জনসন’ নাম লেখা ঘরের দরজায় ডাঃ জোনাস নক্ করলো।

কোন জবাব এল না ভেতর থেকে। আবার করলো···ফের নক্···ভেতরে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ভেতরে কেউ রয়েছে অথচ সে হয়তো বের হয়ে আসতে অনিচ্ছুক।

—দরজা খুলুন। এটা একটা জীবন মৃত্যুর ব্যাপার।

ধীরে ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা এক হাত ফাঁক হল। মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোকের মুখ দেখা দিল। বিরক্তি ও রাগে তার চোখ কোঁচকানো।

—কি চান আপনি?

—আমি মিসেস জনসনকে খুঁজছি। ভীষণ জরুরী প্রয়োজন, বিশ্বাস করুন।

—সে এখানে নেই মিস্টার। কি জন্যে তার সঙ্গে দেখা করতে চান?

ডাঃ জোনাসের মুখে হাসি দেখা দিল, এই খেঁকুড়ে স্ত্রীলোকটির গলার স্বর যেন কিছুটা নরম মনে হচ্ছে।

—মেরিয়া গোমেজ নাম্নী একজন মহিলার খোঁজ চাই। শুনেছি তিনি নাকি মিসেস জনসনের বান্ধবী। আমায় বিশ্বাস করুন লেডি, বহু জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমি একজন ডাক্তার। আমি মিস গোমেজকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই।

স্ত্রীলোকটির মুখে সহসা বিস্ময় ও ভীত ভাব দেখা দিল। অনেকক্ষণ ইতস্তত ভাবে চুপ করে থেকে সে দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো:

—ভেতরে আসুন ডক্টর। আমি কথা বলব আপনার সঙ্গে। আমিই মেরিয়া গোমেজ।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেই নোংরা মলিন দরিদ্র ঘরে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের এবং পুলিশের লোকজনে ভর্তি হয়ে গেল। ডাঃ জোনাস প্রশ্ন করে যেতে লাগলো। আপনি ব্যাব মিলারকে জানেন? মিলার? জোসেফাইন ডোজিয়ার? ইডা মেটকাফ? চার্লি উইলিয়ামস্?

প্রথমটা অস্বীকার। সে যে নিজেও একজন অ্যাডিক্ট তাও অস্বীকার করলো। একজন পুলিশ এসে ওর জামার হাতা তুলে ধরতে সেখানে ছুঁচ ফোটানোর বহু দাগ লক্ষিত হল।

তারপরই মেরিয়া বাধ্য হল কথা বলতে।

—ও, কে, আমি যা জানি তা বলছি। না, ঐসব লোকেদের আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না। তবে জুয়ানিটা জ্যাকসন-এর কাছে ওদের ব্যাপার শুনেছি। এই জুয়ানিটাই আমাদের কাছে হেরোইন বিক্রী করে থাকে। ও ভয়ানক গলাকাটা ব্যবসায়ী। জুয়ানিটা সব নেশাখোরদের কাছেই খুব ভাল। ও নিজেও একজন নেশা আসক্তা। ও সস্তায় বিক্রী করবার জন্যে মালটা কেটে কিছু কম দেয়। উপায় কি, একেবারে নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল।

কিন্তু জুয়ানিটা মরে গেছে, সামনে ঝুঁকে ডাঃ জোনাস ব্যাগ্রভাবে প্রশ্ন করে, ভালভাবে ভেবে মনে করবার চেষ্টা করুন তো, এটা কিন্তু সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, জুয়ানিটা তার হেরোইনের সঙ্গে কিসের ভেজাল দিত? আপনি জানেন কি তা?

মেরিয়া গোমেজ একটা সিগারেট ধরিয়ে গলগলে ধোঁয়া ছেড়ে, ভ্রূ কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করলো, সহসা বুঝি তার মনে পড়ে গেল:

—ও হ্যাঁ, আমি দেখেছি কি ভাবে সে আসল মাল কমাতো ভেজাল মিশিয়ে। তা হল স্রেফ ধুলো। সে হলঘরে গিয়ে কার্পেটের তলা থেকে এক চিমটে ধুলো

নিয়ে মালটার সঙ্গে মিশিয়ে দিত। ধুলোর তো দাম নেই, সস্তা। এই ভেজাল দিয়েই সে আমাদের মাল সরবরাহ করতো।

ধাঁধার টুকরোগুলো এবারে পুরোপুরি জোড়া লেগে গেল। রহস্য আলগা হয়ে এল। নিজের অজ্ঞাতসারে জুয়ানিটা জ্যাকসন হয়ে উঠেছিল একজন খুনী। সে ঐ ধুলোর সঙ্গে তুলে নিত ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানীর সূক্ষ্ম বীজাণুসমূহ এবং খদ্দের-দের সস্তায় নেশা বিক্রীর বাসনায় হেরোইনের সঙ্গে তা মিশিয়ে দিয়েছে। আর ভয়ংকর পরিণাম না জেনে নিজেও ঐ কালান্তক বিষ নিজদেহে প্রবেশ করিয়ে নিজের জীবন দিয়ে ঋণ শোধ করে গেছে।

কিন্তু মেরিয়া গোমেজ প্রাণে বেঁচে গেল কি ভাবে? এটা কি কোন মিরাকল, নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল যাতে করে টিটেনাসে আক্রান্ত হয়েও সে বেঁচে গেল?

—তোমার শেষ হেরোইন ডোজের জন্য কত দাম দিয়েছিলে, মানে জুয়ানিটা তোমার কাছে কত চার্জ করেছিল?

যেন লজ্জিত হল মেরিয়া গোমেজ, অবশেষে বললে, আমি, মানে, সে সপ্তাহে আমার কাছে একটা সেণ্টও ছিল না ডক্টর। অথচ নেশা না নিলেই নয়। জুয়ানিটা আমার বান্ধবী ছিল। সে আমাকে ধারে দিয়েছিল ভেজালহীন আসল মাল। তবে মালটা খুব অল্প পরিমাণ দিয়েছিল…মানে কোনরকমে নেশাটা জিইয়ে রাখবার মতো…একেবারে শুকনো থাকার চেয়ে তা অনেকাংশে ভালো।

গরীব বান্ধবীকে সামান্য একটু বিশুদ্ধ মাল ধার দেওয়ার ফলেই মেরিয়ার জীবন বেঁচে গেছে। ওর শরীরে বিষ অতি অল্পই প্রবেশ করেছিল। যারা পয়সা দিয়ে পুরো পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করেছে, তারাই প্রাণে মারা গেছে।

ডাঃ জোনাস সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল, কি ব্যাপার! এক চিমটি ধুলো হয়ে উঠেছিল বুলেটের মত ভয়াল যখন তা রক্ত স্রোতে গিয়ে মিশেছে। ভাবলে ভয় পেতে হয় যে, এক কাপ ধুলো, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের একমুঠি ময়লার মধ্যে এত বহুল পরিমাণ টিটেনাস বীজাণু থাকে যে গোটা নিউইয়র্কের যাবতীয় নাগরিকদেরই তা মেরে ফেলতে সক্ষম। তবে সুখের কথা এ ভয়ংকর রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। মানুষ যদি অ্যাণ্টিটিটেনাস ইনজেকসন নেয়, এবং পাঁচ বছর পর পর বুস্টার শট্ নেয়, তো এই কালান্তক রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে, কোন ভয়ই থাকে না। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে ভয় না পেলে বা অনেক ক্ষেত্রে রোগে না পড়লে কেউ প্রতিষেধক ইনজেকসনের কথা ভাবেই না।

'নতুন বিশ্ব' জয় করে এলেন কলম্বাস, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেহভরা 'নতুন' এক রোগ। কথিত আছে, তাঁকে চরম অসুস্থ অবস্থায় জাহাজ থেকে পাঁজাকোলা করে নামানো হয় তীরভূমিতে এবং কিছুকাল মধ্যে সেই কালান্তক রোগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

শেষের সেখানেই শুরু। সেই ভয়ংকর ব্যাধি, যাকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল 'জার্মান-পক্স' রূপে, সারা ইয়োরোপকে তছনছ করে, দেড় কোটি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণহরণ করেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে।

সেই ব্যাধি, সেই যৌন-ব্যাধি, আজ বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে পড়ে তার প্রাপ্য ফসল সমানে তুলে নিয়ে চলেছে সর্বাধুনিক এক নামে। দেবভূম ভারতবর্ষে সে ব্যাধির প্রথম পদার্পণ হয় প্রখ্যাত নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁর সহচরদের সৌজন্যে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এ-রোগের যে অকল্পনীয়, বীভৎস ও ভয়ংকর মহামারী ইয়োরোপকে প্রায় শেষ করে এনেছিল, সেখান থেকেই কাহিনী শুরু করা যাক ঃ

চমৎকার বসন্তকাল। যে বসন্তের জন্যে প্যারিস সে-ঋতুতে হয়ে ওঠে স্বর্গসম. মনোরম আবহাওয়ায় দেখা গেল অদ্ভুত বীভৎস একদল মানুষের মিছিল চলেছে রাস্তা ধরে, পথচারীরা ভয়ে আতঙ্কে সে দৃশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ কেউ ওদের দেখে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে, কেউ কেউ অসহনীয় সে দৃশ্য দেখার চেয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

মিছিলকে সংযত রাখতে রাখতে চলেছে বর্শা ও তরবারিধারী অশ্বারোহী বেলিফ ক'জন। মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ বা পালানোর চেষ্টা করা কিছু নরনারীকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে রক্তাক্ত দেহে ফিরিয়ে আনছে তারা মাঝে মাঝেই।

এ-মিছিলে চলছিল প্রায় চার হাজারজন পুরুষ, নারী, এমন কি কিছু শিশুও। এরা প্রত্যেকেই যৌন-রোগাক্রান্ত। বছরটা হল ভয়াবহ সেই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, যে বছরে ভয়ংকর সিফিলিস মহামারী কামানের গোলার মত বিস্ফোরিত হয়ে সারা ইয়োরোপ মহাদেশকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তুলেছিল।

এই অশুভ বর্ষের পূর্ব পর্যন্ত এ-রোগ ছিল সম্পূর্ণ অজানা ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে। মাঝে মধ্যে কিংবদন্তীর মত এ-রোগের কথা শোনা যেত দূর-দূরান্ত দেশ থেকে ঘুরে

আসা নাবিক পর্যটকদের মুখে। কিন্তু সে বছর এল শিয়রে শমন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নর-নারী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগলো এই নতুন-আসা কালব্যাধিতে।

অকস্মাৎ আক্রান্ত প্যারিস, মরণশয্যায় ধুঁকতে লাগলো এই আচমকা আঘাতে। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট জারমেইন জেলাকে এই রোগাক্রান্ত মানুষদের নির্বাসনস্থান স্থির করে ফেললো। কোয়েরান্টাইন এলাকা। আদেশজারী হল, এই রোগী ও রোগীনির অবিলম্বে ঐ জেলায় গিয়ে বন্দী জীবন-যাপন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড।

চার হাজার লোকের এইটি হল সর্বাধুনিক মিছিল, যাদের ধরে পাকড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেণ্ট জারমেইনের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যেখানে গিয়ে তারা অনাহারে অনিদ্রায় পচে গলে মৃত্যুবরণ করবে। নাৎসী বন্দী শিবিরের মত ওখানে জীবিত ও মৃত মানুষদের একযোগে গাদিয়ে রাখা হতে লাগলো।

বড়জোর হাজার দুই লোক বাস করতে পারে কোন মতে এমন একস্থানে বিশ-হাজার নর-নারীকে বন্দী করে রাখা হল। মাঝে মাঝে একটা ওয়াগনে করে কতকগুলো পোকাকাটা সব্জী দেয়ালের বাইরে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত ভেতরে। তিন-চার দিন অন্তর এই জঘন্য ও নগণ্য খাদ্য ছুঁড়ে দেওয়া হত পশুর অধম হতভাগ্য সেই নর-নারীদের। রোগের জ্বালায় আর অনাহারে অচিরেই খতম হতে থাকলো একের পর এক।

মিছিলটা যখন সিন নদীর একটা ব্রিজের কাছে এসে পোঁচেছে, জনৈক কৃষক যুবক, যার সর্বমুখে সিফিলিসের দগদগে ঘা, অকস্মাৎ লাইন থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে গেল ব্রীজের রেলিং-এর উপর। তারপর আর্তনাদের মত সচিৎকারে সে বলে গেল, সেণ্ট জারমেইনে গিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে এখানেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আমি ঢের ভাল মনে করি। এই যে 'জার্মান-পক্স'-এ আক্রান্ত হয়েছি, এটা আমার দোষে নয়। এটা দিয়েছে আমায় ঐ ব্লু বোর ট্যাভার্ন মদ্যশালার বেশ্যাটা। হায়, আর আমি আমার বউ ছেলেমেয়েদের দেখতে পাবো না এ-জীবনে।

রেলিং-এর ওপর সে ইতস্ততঃ করছিল ঝাঁপ দেবে বলে কিন্তু ইতিপূর্বেই একজন সৈনিকের তীক্ষ্ণ বর্শা তার বুক ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ নদীর জলে ঝপাং শব্দে পড়ে মিলিয়ে গেল। মিছিল চলতে লাগলো।

প্যারিসের অন্যত্র তখন গীর্জাগুলি থেকে মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ ঘন্টাধ্বনি বেজে চলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু মানুষ রাস্তায় রাস্তায় বাছুরের রক্ত ছেটাচ্ছে, অনেকেই ধূপধুনা জ্বেলে বায়ু শুদ্ধ করছে, কেউ কেউ শয়তানের পূজা করে চলেছে, যাতে করে মানবজাতির এ-চরম সর্বনাশ রুদ্ধ হয়, অপসারিত হয়। এই নিদারুণ রোগ মোটা-মুটি ধাতস্ত ও প্রশমিত হওয়ার পূর্বে পরবর্তী পাক্কা তিরিশ বছরে আড়াই কোটি লোকের প্রাণ নিয়ে নিল, সমসংখ্যক বা তারও বেশী মানুষকে চরম বিকলাঙ্গ করে ছাড়লো। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়াব্যাপী মানবজাতির মধ্যে

কায়েমিরূপে আসন গ্রহণ করে অদ্যাপি তার মারাত্মক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বিউবনিক প্লেগ-এর মত এ যৌনরোগের সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর সে করাল রূপ আর নেই, এখন অনেক অনেক ঝিমিয়ে স্তিমিতরূপে ধিকি-ধিকি প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে মাত্র।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইয়োরোপে এ-রোগ ছিল অজ্ঞাত। শোনা যেত মধ্যপ্রাচ্যে আছে, পরে প্রমাণিত হল 'নতুন বিশ্ব' বা আমেরিকায় এ-রোগ ভালোভাবেই ছিল। কিন্তু সে বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এই বিচিত্র ও ভয়ংকর রোগের প্রকোপ দেখা দিল ইয়োরোপে। অজস্র নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো আচমকা। রোগটা এতই নতুন যে, তখন পর্যন্ত এর কোন নামকরণ করাই সম্ভব হল না।

রয়েল স্প্যানিস কোর্ট-এর রাই দ্য আইসলা নামক জনৈক রাজ-বৈদ্য ক্রিস্টফার কলম্বাস ও তার নাবিকদের চিকিৎসা করেন। তাঁরা তাঁদের চাঞ্চল্যকর আমেরিকা আবিষ্কার করে স্পেনে ফিরে এসেছেন এবং সঙ্গে করে এনেছেন দেহভরে অদ্ভুত এক রোগ, যার বহিরাকৃতি যেমন বীভৎস, দ্রুত ক্ষয়রোগ হিসেবেও সেটা সমধিক কুখ্যাত। পরে জানা গেল যে, কলম্বাস ও তার সহচরেরা রেড ইণ্ডিয়ান নারী সংসর্গে এই কুৎসিত যৌন রোগটি সংগ্রহ করে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সার্জেন জেনারেল ডাঃ থমাস পারান-এর মতে এই মহান আবিষ্কারককে জাহাজ থেকে বহন করে নামানো হয়েছিল স্পেনের মাটিতে গুরুতর এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়।

ডাঃ পারান তাঁর ভি. ডি সম্পর্কিত পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন: কলম্বাসের বুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত শোথ ও উদরীর মত হয়ে গিয়েছিল, যেমন হয়ে থাকে হার্টের ভ্যালভ জখম হলে, হাত-পা প্যারালিসিসগ্রস্ত, এমন কি মস্তিষ্কও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল—এ-সবই কালান্তক সিফিলিস রোগের শেষ উপসর্গ। ফলে এই মহৎ আবিষ্কারক ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে দেহত্যাগ করেন।

কলম্বাসের মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁদের আনা এই বিচিত্র রোগটি ঝটিকা-গতিতে ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দু'বছর দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের ওপর জ্বলন্ত ত্রাস-এর কাজ করে, পরে ঢুকলো গিয়ে ইতালীতে। ফরাসী সম্রাট অষ্টম চার্লস নেপল্‌স্-এর সিংহাসন দাবি করে ইতালীয় উপদ্বীপে সসৈন্যে আক্রমণ চালান। তাঁর সেই পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য এ-রোগটি ছড়িয়ে দেয় ঐ দেশে।

তদানীন্তন ইতালী ছিল বহু পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। প্রতিরোধকারী স্পেনীয় ও নেপল্‌স্ সৈন্যরা পালিয়ে যাবার পর সেইসব রাষ্ট্রে এই বিজিত সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাদর স্বাগত জানালো চরম চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল জার্মান, সুইস, অষ্ট্রিয়ান, ইংরেজ এবং ওলন্দাজ সেনা, তারা চরম লুব্ধভাবে মুফৎ মদ ও সুন্দরী যুবতী নারী গোগ্রাসে গিলতে লাগলো

এবং সেই নরনারীদের অধিকাংশই ছিল কলম্বাসের লোকেদের দ্বারা রোগসংক্রামিত, ফলে বিপুল সৈন্যবাহিনী রোগ কবলিত হয়ে পড়লো অচিরাৎ।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা চার্লস-এর সেনাদল এই অজ্ঞাত অদ্ভুত রোগে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন একে বিবিধ নামে অভিহিত করা হত, যেমন, টার্কিশ পক্স, ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান মিজল্স্, জার্মান পক্স, ফ্রেঞ্চ কার্স। প্রতিটি দেশ একে অপরকে এ-রোগের অভিশাপের জন্য দায়ী করতে লাগলো, দোষারোপ করতে থাকলো।

এই রোগের মহামারীতে যখন তার সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত এবং আধা মৃত তখন ভীত চার্লস্ সংবাদ পেলেন তাঁকে নাকি হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি পালী থেকে সৈন্যাপসারণের ঝটিতি আদেশ দিলেন। এবং সেইসব বারো জাতির দ্বারা গঠিত সৈন্যদল স্ব স্ব দেশে ছড়াতে লাগলো এই কদর্য রোগ। কোন দেশ অব্যাহতি পেল না। বিশালকায় রাশিয়া থেকে ক্ষুদ্রাদপি সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত যাবতীয় দেশ এ-রোগের কামড়ে জর্জরিত হল।

প্রবলভাবে ভি. ডি. ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিটি নগরীতে হ্যামলেট-এ যে আতঙ্কের তুলনা রইল না। গীর্জার উপাসনা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অনিশ্চিতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীত জেনারেলরা সম্পূর্ণ সেনাদলকে ভেঙ্গে দিল। ডাক্তারেরা, সে প্রকৃত বা হাতুড়ে যেই হোক না কেন উল্টোপাল্টা মলম ও বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করে (যেগুলো এই রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময়ে কোন কাজেই লাগতো না) রাতারাতি প্রচুর পয়সা উপার্জন করে বড়লোক হয়ে গেল।

ভি. ডি. যখন দেশকে দুরমুজ করে ফেলছে, সে সময় হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা দোকান-পসরা বন্ধ করে দিল। দেশের রেভেনিউ কমে যাওয়ায় নেদারল্যাণ্ড রাজ এক 'পক্স-ট্যাক্স' বসিয়ে দিল। হতভাগ্য যে নর-নারী বা যুবকগণ এ-রোগে আক্রান্ত হবে তাকেই মাথাপিছু সরকারকে ৫০ গিলডার করে কর দিতে হবে, অন্যথায় কারাদণ্ড তথা মৃত্যুদণ্ড। একটিমাত্র সপ্তাহে আমস্টারডামে ৪৫০ জন হল্যাণ্ডবাসী কর না দিতে সক্ষম হওয়ায় ফাঁসীমঞ্চে প্রাণ দিল।

সেই অবিশ্বাস্য বছরের যতদিন যেতে লাগলো, ইয়োরোপে সাধারণ সমাবেশ বন্ধ হয়ে গেল, সৈনিকরা লড়াই করতে অস্বীকার করলো, গণিকালয় বন্ধ করে পুড়িয়ে দেওয়া হল, থিয়েটার লোকশূন্য হওয়ায় দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

লিয়র প্রখ্যাত মেলার উদ্যোক্তারা ভি. ডি'র ভয় সত্ত্বেও লাভজনক মেলা বন্ধ করতে অস্বীকার করে সশস্ত্র প্রহরী রাখলো যাতে মেলাপ্রাঙ্গণ নষ্ট চরিত্রের কোন নারী বা গণিকারা প্রবেশ না করতে পারে। গণিকারা প্রমাদ গনলো। বছরের এই তিনমাসে তাদের মোটা রোজগার হয়, তা দিয়ে চলে বাকী নয় মাস। ক্ষেপে গিয়ে তারা দলবদ্ধ আক্রমণে পনের জন প্রহরীকে পর্যুদস্ত করে মেলায় ঢুকে গেল।

সেনাদল ডাকা হল। পরস্পর লড়াইয়ে রোগে ইতিমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত জনা

ত্রিশেক গণিকা নিহত হয়ে গেল সেখানে। এই ঘটনার ফলে ফরাসী দেশে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল জনসমাবেশ, থিয়েটারসমূহ, যাবতীয় গীর্জা, আদালত ও মুরগীর লড়াই। ১৪৪ ধারার মত অনধিক চার ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ হল। স্কুলে কোন ছাত্র রইল না, রইল না জেলের মধ্যে কোন বন্দী।

অথচ কেউ কোন কারণ খুঁজে পেল না এই প্রবল বন্যার মত ঐ বিদঘুটে রোগের প্লাবন কেন এসে সব দেশকে ক্রমান্বয়ে শেষ করে ফেলছে।

ডাঃ পারান বলেন, প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই হোক বা সেই যুগের সর্বপ্রথম আক্রমণের প্রবলতার জন্যেই হোক, এই রোগটি সাংঘাতিক মারকরূপে দেখা দিয়েছিল তখন। আজ কিন্তু এ-রোগের সেই ধরনের হিংস্রভাব আর নেই, বহুলাংশে নিস্তেজ হয়ে গেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উন্নতিতে সর্বাধুনিক ঔষধের জাদুগুণে এর মারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সে যুগে এ-রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রবল জ্বর হত, দারুণ প্রলাপ, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং প্রতিটি হাড়ে বেদনা ও ঘা, ভয়াবহ চামড়া-ক্ষত দেখা দিত। চতুর্দিকে মৃত্যুর হাহাকার, এবং সাধারণ সর্দির চেয়েও বেশী সংক্রামক ছিল এই যৌন-রোগটি। যৌন-সংযোগ ছাড়াও, যা আজকের যুগে অভাবনীয়, সে যুগের সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ জীবনধারাতেও রোগ সংক্রামিত হত।

এ-রোগ প্রাদুর্ভাবের কয়েক মাসের মধ্যে আরব বণিকরা আক্রান্ত দেশসমূহে পারদঘটিত মলম পাঠাতে লাগলো। এ-রোগের ঘা ইত্যাদি নিরাময়ে আরব চিকিৎসকগণ নাকি মার্কারি চিকিৎসায় ফল পেয়েছিল। কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি রোগ সারাবার কু-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপের হাতুড়ে ডাক্তাররা রোগীদের এত বেশী পরিমাণে সে ঔষধ দিতে লাগলো যে, ওভার ডোজেরফলে হাজারে হাজারে রোগীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলো।

যদিও সে যুগের ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের এ-রোগের কারণ সম্পর্কে ঝাপসা ধারণা ছিল, তবে এটা যে যৌনসংযোগের ফলে সংক্রামিত হয় এ-সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলো।

জেনা নগরের এলবার্ট ভন টুইয়েস নামক একজন চক্ষুচিকিৎসক ঘোষণা করলেন যে, মাইক্রোস্কোপে সিফিলিসাক্রান্তর রক্ত রেখে তিনি "লিটল মনস্টার" কিছু লক্ষ্য করেছেন।

তিনি বললেন, এইসব অতি ক্ষুদ্র কীট বা বীজাণুগুলিই ঐ অভিশপ্ত ফরাসী পক্স রোগের হয়ত কারণ।

ভন টুইয়েস একজন কালদর্শী বিজ্ঞানী ছিলেন। যা হয়ে থাকে, তাকেও স্থানীয় নাগরিকরা জাদুকর বা ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান রূপে অভিহিত করত।

একদিন জেনার নাগরিক কমিটির একদল মানুষ, যারা এই বিজ্ঞানীদর্শিত কর্ক

স্ক্রু আকৃতির "মনৃস্টার"কে নানাভাবে বিদ্রূপ করে এসেছে, তারাই সদলে হামলা করে এক রাত্রে শুধু ভন টুইয়েস-এর লেবরেটরী, সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেই নিবৃত্ত হল না, স্বয়ং বিজ্ঞানীকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেললো।

হাতুড়েদেরও যেমন পোয়াবারো তেমনি তখনকার কজন জ্যোতিষীরাও ঘোষণা করলে, সিফিলিস-মহামারীর জন্য কয়েকটি 'স্টার'ই দায়ী।

হেনরিখ উলবার নামক জনৈক প্রভাবশালী নক্ষত্র-বিজ্ঞানী রায় দিলেন, যাজকবৃন্দ এ-রোগে আক্রান্ত হয় বৃশ্চিক বা অপর কোন অশুভ লগ্নের নক্ষত্রালোকে অনাবৃত অবস্থায় থেকে। আর আমাদের মধ্যেকার সাধারণ পাপাত্মা ডেভিলরা পক্স রোগে পড়ে নারীসংসর্গ মারফৎ।

উলবার নিজে এই রোগের প্রতিষেধকরূপী দুটি বিচিত্র বস্তু বিক্রি করে প্রভূত বিত্তশালী হয়ে উঠে এবং রাইন নদীর তীরে বিরাট এক এস্টেট ও একটি ক্যাসল ক্রয় করে। বস্তু দুটি হল ঃ একটি মলম ও একটি সিল্কের মুখোস। এই দুটি বস্তু যদি কোন নিদ্রিত নর-নারীর মুখে লেপন ও ঢাকা দেওয়া যায় তবে নাকি উক্ত ভি. ডি. জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মজা এই, এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক শয়তান লম্পট নিজেই কাম-লালসায় নিমজ্জিত হয়ে ফরাসী এক গণিকাকে নিয়ে ভেনিসে গিয়ে স্ফূর্তিতে মত্ত রইল। যখন সে দেশে ফিরলো তখন সিফিলিসের ঘায়ে তার মুখের অর্ধেকটা বিকৃত হয়ে গেছে। ভয়াবহ সে দৃশ্য। এককালের সম্মানীয় ব্যক্তি অতীব ঘৃণিত মানুষে পর্যবসিত হল।

অচিরেই জ্যোতিষি সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের শহরতলীর বন্দী-নিবাসে আটক থেকে পাঁচ সপ্তাহ বাদে অনাহারে সেখানে মারা গেল।

দ্রুত সঞ্চরণশীল এই রোগ নানা ধরনের পথে সংক্রামিত হতে লাগলো নির্দোষ মানুষজনের মধ্যে। ধাত্রী মারফৎ আক্রান্ত হল গর্ভবতী মেয়েরা, নাপিতরা তাদের বিষাক্ত ক্ষুরমারফৎ এ-রোগ চালান করলে অগণিত নিরীহ মানুষদের মধ্যে। বহু নগরে বন্দরে ব্যক্তিরা রোগাক্রান্ত হয়ে বিকৃত হবার বা মরবার পূর্বে শেষ স্ফূর্তি করবার মানসে গণিকালয়ে ঘুরে ঘুরে দিবারাত্র নিজের শেষ সুখ ও অপরের অশেষ অসুখ ফিরি করে যেতে লাগলো। নিজেরা তাদের কাছ থেকে অসুখ বাধিয়ে স্ব-স্ব গৃহে স্ত্রীদের মধ্যে রোগ বিস্তার করে দিল। এইভাবে মহামারী ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে উপনীত হল।

এই অজ্ঞাত রোগের নামকরণ করেন জিরালামো ফ্রাঙ্কাস্টোরো নামক জনৈক ইতালীয় ডাক্তার। তিনি নিওবের দ্বিতীয় পুত্র রোগাক্রান্ত সিফাইলাসের নামানুসারে এই নিদারুণ রোগটির নাম দেন ঃ সিফিলিস। অদ্যাপি এই নামই বলবৎ রয়েছে।

সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে এই রোগের আতঙ্ক নিঃসীম পর্যায়ে উঠলো। কি ধনী কি দরিদ্র, কি সৈনিক কি করনিক, কি অভিজাত কি ছোট দোকানী, কি

বেশ্যা কি বা অভিজাত বংশীয়া, প্রত্যেকেই থরথর করে কাঁপতে লাগলো রোগাক্রমণ ভীতিতে। ব্যাভেরিয়ান সম্রাট ম্যাক্সিমিলান স্বয়ং পর্যন্ত এমন আতঙ্কিত হয়ে গেলেন যে, ১৪৯৫-এর ৭ই আগস্ট এক আদেশজারী করে ঘোষণা করলেন যে, "পক্স রোগাক্রান্ত প্রতিটি মানুষকে কুষ্ঠরোগীদের মত ব্যবহার করে, তাদের অবস্থানুসারে এক হয় ফাঁসী দেওয়া হবে, নয়ত পুড়িয়ে মারা হবে কিংবা নির্যাতন করা হবে ! তবে পবিত্র স্যাবাথ (রবিবার) দিনটাকে বাদ দিয়েই এসব করা হবে।"

দক্ষিণ জার্মানীর অল্প ক্ষমতাশালী কিছু প্রিন্স এমন আদেশও দিলেন যে, প্রত্যেক রোগীকে রক্তবর্ণ পোষাক ও হাতে একটি শ্বেতপতাকা বহন করে পথে বেরুতে হবে যাতে করে সুস্থ মানুষেরা তাদের সিফিলিটিক বলে চিনতে পেরে সভয়ে দূরে যেতে সক্ষম হয়।

সে যুগের দৃশ্যাদি এমনই হৃদয়বিদারক ছিল যে, মহান আর্টিস্ট আলব্রেখ্‌ট ডুরার এক উডকাট-এ সে দৃশ্য ধরে রাখেন, আজও সে কাঠ খোদাই শিল্পকর্মটি "দি ফার্স্ট সিফিলিটিক" নামে প্রখ্যাত হয়ে আছে। বার্লিনের ক্রায়েডরিখ উইলহেলম মিউজিয়ামের দেয়ালে এটিকে দেখে আজও দর্শকবৃন্দ ভয়ে আতঙ্কে অবশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ আজ এ-রোগ জাদু ঔষধ পেনিসিলিনের কল্যাণে কত না অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে।

বর্দো থেকে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের ব্রিস্টল বন্দরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুভ বৎসরে ইংলণ্ডে এই বিভীষিকা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। দেড় মাসের মধ্যে চার হাজার নাবিক ও শহরের জনসাধারণ এ-রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ৪৭টি গণিকালয় সম্পন্ন নারকীয় বন্দর রূপে খ্যাত ব্রিস্টল নগরী এ-ব্যাপারে স্বদেশকে খুব ভালভাবেই সাহায্য করলো ভি. ডি. সম্প্রসারণে।

রোগটি লাফিয়ে লাফিয়ে ছেয়ে ফেললো দেশ। একলাফে গেল স্কটল্যাণ্ডে। সেখানকার রাজা চতুর্থ জেমস্ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের হাতুড়ে ডাক্তার বনে গেলেন। সিফিলিস রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। এমন কি অনিচ্ছুক রোগীদের নিজ চিকিৎসাধীনে আনবার জন্য উল্টে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানও করতে থাকলেন। তার হাতুড়ে আজব চিকিৎসার একটি প্রিয় প্রক্রিয়া ছিল কালো ভেড়ার ফুটন্ত চর্বি ভি. ডি. রোগীর অঙ্গে লেপন করে দেওয়া।

সেই ভয়ংকর বছরের ৬ই নভেম্বরে রাজা জেমস্ এই আদেশ জারী করলেন যে, তাঁর যেসব প্রজা 'গ্র্যান্টগোর' রোগে (সিফিলিসের উক্ত নাম দিয়েছিলেন তিনি) আক্রান্ত হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে তাদের স্ব-স্ব শহর বন্দর পরিত্যাগ করে চলে যায়। অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড।

এইসব অসহায় মানুষগুলিকে (যার মধ্যে দশ বছরের শিশুও ছিল) স্কটিশ

শহর লীথ-এর বিপরীত এক দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে শুরু হল সপারিষদ হাতুড়ে সমেত স্বয়ং রাজা জেমস্-এর আজব চিকিৎসা। এরপর যখন পূর্বোক্ত 'ভেড়া চর্বি লেপন' চিকিৎসা পদ্ধতি রোগ নিরাময়ে কোন কাজে এল না তখন মেগ হ্যারিকাট নামক এক দুর্বৃত্ত শয়তানের পরামর্শে রাজা ডজনখানেক নর ও নারী রোগীর জিভ কেটে ফেলে দিলেন

এই নিষ্ঠুর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্য অচিরেই পরিত্যক্ত হল। এবার স্কটিশ রাজা আরেক নতুন আদেশ জারী করলেন। যাবতীয় ভি. ডি. রোগীদের দু'গালে চিহ্নিত করা হবে, সাধারণ্যে চাবুক মারা হবে, পরে তাদের শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় পাঠানো হবে 'আইল অব সোর'-এ (বন্দীনিবাস দ্বীপকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন তিনি)।

তদানিন্তন যুগের নামকরা কবি উইলিয়ম ডানবার, রাজা জেমস্-এর এই আজগুবী ও নিষ্ফল চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসা করে এক কবিতা লিখে ফেলেন। ফলে রাজার কাছ থেকে পারিতোষিক হিসেবে এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা লাভ করলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস স্বয়ং কবি-প্রবর প্রতিবেশীর এক সুন্দর পত্নীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে রোগ বাঁধিয়ে বসলেন। রাজা জেমস্ বিষম রোগে নিজ হাতে লোহা গরম করে সভাকবির দুই গণ্ডে ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিয়ে সরাসরি ডানবারকে উক্ত দ্বীপে নির্বাসিত করলেন, সেখানে মাস পাঁচেক বাদে তিনি দেহরক্ষা করলেন।

হেনরিখস্ নামীয় জনৈক মধ্যযুগীয় প্যারিসের লেখনীতে পাই এই ভেনারেল পক্স-এর ভয়াবহ বর্ণনা: "এই পক্স বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান হবার পরই সেটা মস্তিষ্ক অধিকার করে সেখানে তার কায়েমীবাসা বাঁধতো। এটা মাথা ভেদ করতে পারত, ব্লাড ভেসল্-এর ভেতর দিয়ে কানে প্রবেশ করে রোগীকে কালা করে ছাড়তো, কানে পোকার জন্ম দিত, নাকটাকে দিত ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে। গড়ে তুলতো নেত্রনালীর ঘা।

এটা দাঁতের দফা রফা করে মুখগহ্বরকে করে তুলতো পূতিগন্ধময় নরক। আলজিভ খসে যাওয়ায় কণ্ঠস্বর নষ্ট বা পক্ষাঘাত আক্রান্ত হত। কোমর এবং হাঁটু অসার হয়ে পদদ্বয় এমনভাবে বক্র হয়ে যেত যে, রোগীর চলন ক্ষমতা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেত।

আজকের গবেষকগণও স্বীকার করেন এ বর্ণনার যথার্থতা। সেই ভয়ংকর বছরের অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র এই যৌন রোগের উপসর্গের উক্ত লেখক কর্তৃক বর্ণনা নিখুঁত ক্লিনিকাল প্রতিচ্ছবি। এই ভয়ংকর হিংস্র রূপই সেই ১৪৯৫ এবং পরবর্তী তিন দশক ধরে সারা ইয়োরোপকে মুমূর্ষু করে ছেড়েছিল।

তদানিন্তন ডাক্তারদের চিকিৎসাপদ্ধতিও ছিল অভাবনীয় নিষ্ঠুর। তারা রোগীর চোখের পাতা বিদ্ধ করতো, কপালের দু'পাশ পুড়িয়ে দিত, কামানো

তালু কেটে ব্লাড ভেসল্ উন্মোচিত করত, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কাঠ পুড়িয়ে জলন্ত ছেঁকা দিত। রোগের চেয়ে চিকিৎসা ছিল আরও ভয়ংকর, তারপর দু'হাতের শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ করাতো, পুরুষাঙ্গে জোঁক বসাতো। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই রোগীরা রক্ত শূন্য হয়ে মারা যেত।

স্পেনদেশেও ঐ ১৪৯৫-এর আগে সিফিলিস ছিল পুরোপুরি অজ্ঞাত। কিন্তু সে বছর ১৮ই জুন তারিখে পাডুয়া ইউনিভার্সিটির মেডিসিনের প্রফেসার নিকোলো সিলাসিও বার্সিলোনায় গিয়ে এই ফ্রেঞ্চ কার্সের (এনামই তিনি দিয়েছিলেন) ৩০০০ রোগী দেখতে পেলেন।

এই প্রফেসার উক্ত রোগ নিরাময়ের এক অভিনব এবং চরম বেদনাদায়ক পদ্ধতি প্রেসক্রাইব করলেন। তিনি রোগীর তালুতে গর্ত করে তাতে ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন ফুঁ দিয়ে। তাঁর মতে এই ধোঁয়া ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে যে অশুভ শ্লেষ্মার দ্বারা এ-রোগ জন্মায়, তাকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে আসবে এবং অচিরেই রোগী রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হল তখন প্রফেসর এক বত্রিশভাজা মলম তৈরী করলেন, তার মধ্যে তিনি সেরুজ, লরেল বেরি, গঁদ, সঙ্গে দিলেন পোড়া সীসে, লোহর মরচে, তার্পিন তেল, ঝাউ তেল, চর্বি এবং ষাঁড়ের খুরের মেদ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত মলম নিয়ে তিনি ও তাঁর সহকারী রোগীর হাত, পা, কোমর প্রভৃতি স্থানে সমানে মালিশ করতে থাকলেন এবং নাভি-অঞ্চলেও আরেকটি কি বস্তুর প্রলেপ লাগাতে লাগলেন! তার কিছু কিছু পেশেন্ট সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় এই মলমের প্রলেপ সহ উত্তপ্ত চুল্লী সন্নিধানে পাকা তিরিশ দিন পর্যন্ত কাল কাটাতে বাধ্য হল। তারা যদি এই প্রবল উত্তাপ চিকিৎসান্তেও জীবিত থাকত তো তাদের রোগ নিরাময় হয়ে গেছে বলে ঘোষিত হত। অপরাপর কিছু রোগীকে ঘরে উনুন জেলে একটি বিছানায় শুইয়ে তাদের গায়ে গোটা কয়েক কম্বল চাপা দিয়ে বিছানার তলায় খাটের স্প্রীং-এর নীচে জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে রেখে দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হত। সহজেই অনুমেয় এমত অবস্থায় বহু রোগী চিকিৎসার চেয়ে রোগে মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচনা করত, কেননা এ অসহনীয় বেদনাময় পদ্ধতি, যার দ্বারা কোন ফলই হত না, তাকে সভয়ে পরিহার করে চলত।

এরপর বেপরোয়া কিছু চিকিৎসক ঘোষণা করলেন সিফিলিস সারাবার একমাত্র ঔষধ হল তথাকথিত 'পবিত্রকাষ্ঠ' (লিগনাম স্যাংটাম)। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমস্টারডামের ডাক্তার উলরিচ ভ্যান হাটেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ভি. ডি. রোগীকে যদি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পাকা চল্লিশ দিন একমাত্র লিগনাম স্যাংটাম চোকলা ছাড়া কিছু খেতে না দিয়ে বন্দী করে রাখা যায় তবেই রোগী উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

ভ্যান হাটেন স্বয়ং এ-রোগ বাধিয়ে বসলো ভেরোনা শহরের রাস্তায় ঘোরা এক গণিকা সম্ভোগে। তিনি নিজে উক্ত পবিত্র কাষ্ঠ চোকলা ভক্ষণ পদ্ধতিতে 'সেল'-এ চল্লিশ দিন থেকে উপবাসে জীর্ণ শীর্ণ চরম দুর্বল হয়েও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, আমি সেরে গেছি। এই পবিত্র কাষ্ঠের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। এ পবিত্র কাষ্ঠ প্রকৃতই ম্যাজিক কাষ্ঠ।

ডাক্তারের এ উচ্ছ্বাস যে কত মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল দুই সপ্তাহ পরে। অনাহারজনিত জীবনী-শক্তি হ্রাস ও সিফিলিসের প্রচণ্ডতায় তার মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই 'লিগনাম স্যাংটাম' চিকিৎসা পদ্ধতি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

সারা ইয়োরোপীয় রাজ্যের পৌর প্রতিনিধিরাই ঐ রোগীদের কোয়েরেন্টাইন পদ্ধতিতে বন্দী রেখে রোগ বিস্তার রোধে বিফল হল। বিদেশী আগন্তুকদের শহর বন্দর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তাদের ক্ষেত্র বিশেষে পাথর মেরে বা প্রহারে জর্জরিত করে মেরে ফেলা হল। রুগ্ন পর্যটকদের নদীতে বা কুঁয়োতে ফেলে বধ করা হল। স্বদেশী নাগরিকরাও রোগাক্রান্ত হলে এর চেয়ে কিছু কম নিগৃহীত হল না।

পোল্যাণ্ডের ক্রাকাউ শহরের ক্রুদ্ধ গৃহিণীরা দল বেধে আক্রমণ করলো সেখানকার কুখ্যাত এক গণিকালয় (অন্তত এক বছর বন্ধ থাকবে মিউনিসিপ্যালিটির এই নির্দেশ উক্ত গণিকালয় অমান্য করেছিল), তারপর রান্নার তেল ঢেলে সে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। সে আগুনে পুড়ে মরলো ছ জন গণিকা ও পাঁচজন খদ্দের পুরুষ।

ইয়োরোপের মধ্যে ভেনিস নগরীই সর্বাধিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এই জঘন্য ব্যাধিতে। ১৪৯৫-তে ওখানকার ৩ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১১,৬৭৫ জন ছিল গণিকা। নানাপ্রকার যৌন বিকৃতির খেলা চলতো 'সেইসব বেশ্যালয়ে, ফলে এ-রোগও হু হু করে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়লো সারা ভেনিস-এ।

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এ প্যালাজজো দা মস্টোতে ভেনিসিয়ান প্রিন্সদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হল ডিসেম্বর মাসে, কেন না সে সময়েই উক্ত জল নগরীতে সর্বাধিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সিফিলিসে মরা আট হাজার ভেনিসিয়ান নর-নারীকে খালের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে মৃতদেহের দ্বারা আবহাওয়া দূষিত না হয়।

অভিজাত সম্প্রদায় ভুল করে ভাবলো যে সাধারণ নাগরিকদের শত হস্তেন দূরে রাখলেই এ-রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, তাই তারা তাদের প্যালেস এবং দুর্গসমূহ সদা সতর্ক প্রহরী দ্বারা ঘিরে রাখলো। তাদের দুর্গের খুব নিকটে আসা নৌকারোহীদের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিসহ তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলো।

কিন্তু এই অভিজাত সম্প্রদায় ভেবে দেখলো না যে, এই জার্মান পক্স রোগ

তাদের স্বজাত অভিজাত রক্তের দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। প্রাসাদের মধ্যে ভিড় করা বেশ কিছু প্রিন্স এই জঘন্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। কিভাবে তাহলে এল এই রোগ? এলো একটি পরিচারিকা মারফৎ। 'প্যালাজজোতে উক্ত যুবতীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল নিঃসঙ্গ প্রাসাদ বন্দী কিছু প্রিন্সদের মনোরঞ্জনার্থে, ফলে এই যুবতীই তার রাজকীয় প্রণয়ীদের এই রোগটি উপহার দেয়।

এক মাস বাদে দেখা গেল প্রাসাদের শরণার্থী ৩৫ জন প্রিন্সের মধ্যে মাত্র তিনজন রোগ এড়িয়ে তখনও জীবিত আছে।

বছরের শেষে ভেনিস নগরীর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো। ১৭ হাজার লোক মৃত এবং ৪০ হাজার লোক রোগাক্রান্ত।

রোম নগরীর কুখ্যাত বরজিয়া বংশের গৃহচিকিৎসক ডাঃ ক্যাসপেয়ার টরেল্লা, সখেদে তাঁর ডাইরীর এক স্থানে লিখেছেন যে, একমাত্র ঐ কুখ্যাত পরিবারেই তিনি সতের জন নরনারীকে ভি. ডি. রোগে ভুগতে দেখেন। সেই সতের জনের মধ্যে অচিরেই বারোজন মারা যায়।

রাশিয়াতে, আইভ্যান দি টেরিবল এই রোগের পাল্লায় পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ভি. ডি.-র ফলেই আইভান দুরন্ত রাগী ও হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং সংখ্যাতীত নিরপরাধ নরনারীকে অবাধে নিধন করেন।

ইয়োরোপীয় বণিকগণ সাউথ সী অঞ্চলে এ-রোগ নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক সঙ্গ করে নেটিভ রমণীগণ আক্রান্ত হয়, কিছুকাল মধ্যেই দ্বীপের পর দ্বীপের পনেরো আনা জনসংখ্যা মৃত্যুকবলিত হয়ে যায়।

প্রখ্যাত অভিযাত্রী ভাস্কো-ডা-গামার নাবিকবৃন্দ, যারা পূর্বেই ইয়োরোপ থেকে রোগ বাধিয়ে ফেলে, তারা এই কালান্তক 'পক্স' বহন করে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে। বিদেশী ও নতুন রোগ দুইয়েরই পদসঞ্চার হল ভাস্কো-ডা-গামার সৌজন্যে। ফরাসীদেশ ও জার্মানী থেকে বিতাড়িত জিপসীরা এই রোগের বিভীষিকা কালক্রমে ছড়ালো অন্তত বারো চৌদ্দটি দেশের অজ পাড়াগাঁয়েও।

তবে পরবর্তী বছরের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এ ভয়ংকর রোগের প্রকোপ বহুলাংশে তেজ হারিয়ে যেন স্তিমিত হয়ে পড়লো। মহামারী আর রইল না। অবশ্য পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে এ-রোগ নিরবধি ধারায় সংক্রামিত হতে থাকলো ঠিকই, তবে ১৪৯৫-এর অকল্পনীয় ভয়াভয় আর রইল না। তবে এক বছরেই কয়েকশ, বছরের ট্যাক্স নিয়ে গেল। শুধু সেই কুখ্যাত বছরটিতেই ইয়োরোপ থেকে ঐ একটিমাত্র যৌনরোগ দেড়কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে পরপারে চালান করে ছাড়লো।

তবে এ-রোগ বুঝি অমর, তাই আজও এই 'পক্স' সারা বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করে চলেছে অবাধ গতিতে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালের মাঝামাঝি এক হিমশীতল তুষারঝরা দিনের বিকেল চারটে।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিউইয়র্কের পার্ল রিভার লেডারলি ল্যাবরেটারির ভাইরাস রিসার্চ বিভাগের ডাইরেক্টর ডাঃ হেরাল্ড আর কক্স। ডেস্কের ওপর অস্তগামী সূর্যের কিরণে চিক্‌চিক্ করছিল তরল এক পদার্থভরা বীকার। উক্ত তরল মিকচারটি পলিওমাইলাইটিস্ রোগের নবাবিষ্কৃত একটি নতুন ভ্যাকসিন। এটির আবিষ্কারক যুগ্মভাবে ডাঃ কক্স এবং ডাঃ হিলারি কপরোওস্কি। এই ঔষধটি ইতিপূর্বে কোন মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়নি পরীক্ষা করা হয়নি। ডাঃ কক্স এবং তাঁর দু'জন সহকারী স্থির করে ফেলেছেন যে, তাঁরা নিজেরাই হবেন নিজেদের গিণিপিগ।

বিস্তর ল্যাবরেটরি টেস্টের পরও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়ে গেছে মানুষের উপর প্রয়োগের ব্যাপারে। এ ভ্যাক্‌সিনটি তৈরী করা হয়েছে জীবন্ত এক পোলিও ভাইরাস থেকে। ফলে অপপ্রয়োগে এ ভাইরাস যে কোন মানুষকে পঙ্গু করে দিতে বা মেরে ফেলতেও পারে। এই ডাক্তারেরা এমন এক অনিশ্চিত অবস্থায় নিজেদের উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার পরিণতি সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে সঠিক করে কোন কিছু বলবার উপায় নেই।

ডাঃ কক্স একচুমুক খেলেন মিকচারটি। সহকারী দু'জনও একে একে গলধঃকরণ করলেন তা। আগামী দু' সপ্তাহের পূর্বে জানা যাবে না এই ভ্যাকসিন পানের কি হবে প্রতিক্রিয়া। দিন যেতে থাকল। এঁরা প্রতিদিন লক্ষ্য করতে লাগলেন ঘাড়ে গলায় কোন স্টিফনেস অনুভব করেন কি না, মাথা ধরা শুরু হয় কি না, কিংবা শ্বাসনালীতে কোনপ্রকার সংক্রমণ দেখা দেয় কি না। রক্ত পরীক্ষাও করা হতে লাগলো।

ছয় দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, তাদের দেহে 'নিরীহ' ধরনের এক পোলিও রোগ-এর আবির্ভাব হয়েছে। এঁরা এটাই আশা করেছিলেন। তবু একটা বড় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, এটা কি এই প্রকার 'নিরীহ'ই থেকে যাবে? নাকি জীবন্ত ভাইরাস তাদের কেন্দ্রীয় নারভাস সিস্টেমকে আক্রমণ করবে?

চৌদ্দ দিনের দিন পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করা হল। বিস্ময়কর এক সংবাদ

বয়ে আনলো সেই টেস্ট। ভ্যাকসিনটি সত্যিসত্যিই পোলিও রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। না, পক্ষাঘাত-এর কোন লক্ষণ সে তৈরী করেনি।

তাহলে এই ডাক্তার বৈজ্ঞানিকেরা এতটা অপরিণত পর্যায়ে উক্ত ভ্যাকসিনকে নিজেদের দেহে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করতে উদ্যোগী বা সাহসী হলেন কি করে? তাঁরা জানতেন এটার কার্যকরীতা অনিবার্য, ফলে মানুষের হাতে এসে যাবে ভয়ংকর ঐ পোলিও রোগাক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচবার এক অমোঘ অস্ত্র। যে ভয়াল ভাইরাস মানুষকে বিশেষ করে অল্প বয়স্কদের প্যারালিটিক পলিওমাইলাইটিস রোগে আক্রান্ত করে বিকলাঙ্গ অবস্থায় প্রাণনাশ করে, তার বিরুদ্ধে হবে এক বিশল্যকরণী।

আজ এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওঁদের জীবন নিয়ে সেদিনকার দুঃসাহসিক জুয়াখেলা বা প্রচণ্ড ঝুঁকি নেওয়া সার্থক এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিকরা এবং সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অ্যালবার্ট সেবিন কালক্রমে এমন একটি লাইভ-ভাইরাস ভ্যাকসিন সৃষ্টি করে ফেললেন যা অচিরে সারা বিশ্ব থেকে পোলিও রোগকে নিশ্চিহ্ন করবার এক মিরাকল ড্রাগ রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল।

এই জীবন্ত ভাইরাস ভ্যাকসিন বিশ্বের ১৮টি দেশের প্রায় ৩ কোটি মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ঔষধটির কার্যকারীতা প্রমাণিত হয়েছে।

দেখা গেছে লাইভ-ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রয়োগে সবারই ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বর্ধিত হয়ে গেছে।

এ ঔষধ প্রয়োগে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। এটি সর্বাংশে নিরাপদ প্রতিষেধক।

মহামারী নিরোধে সল্ক-মৃত-ভাইরাস ভ্যাকসিনের চেয়ে অনেকাংশে কার্যকরী এবং সক্রিয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে তদানিন্তনকালীন সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মহামারী নিরোধে।

এটা প্রয়োগে কোন ঝামেলা নেই। মিষ্টি সিরাপের আকারে খাওয়ান হয়। দামে সস্তা। দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশসমূহে এটা খুবই সুবিধেজনক। সল্ক-ভ্যাকসিন-এর তুলনায় প্রায় দশ থেকে একশগুণ দাম বেশি। সেটা আবার ইনজেকসন করে প্রয়োগ করা হত। ইনজেকসনে ভীত মানুষদের এটা অনায়াসে মিষ্টি সিরাপরূপে পান করানো যারপরনাই সুবিধেজনক।

কাউকে একবার যদি জীবন্ত ভাইরাস প্রয়োগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায় তো তাহলে তার আর এই ভয়ংকর রোগের আক্রমণের আশংকা ইহ জীবনে থাকেই না। অপর দিকে সল্ক-ভ্যাকসিনে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে

তোলবার পরেও দেখা গেছে এ রোগাক্রান্ত হতে এবং অপরদের সংক্রামিত করতে।

এ ভ্যাকসিনের যাবতীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম হল এই যে, এই জীবন্ত ভ্যাকসিন যখন কোন মানব দেহে "নিরীহ" ধরনের পোলিও সৃষ্টি করে তখন এটা যে লোক ভ্যাকসিন নেয়নি এমন লোকের দেহে প্রবেশলাভ করে। এইভাবে তারা অনুপ্রবেশকারী দেহেও রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। এটা একটা অদ্ভুত সুবিধে সন্দেহ কি!

পিতামাতারা অবশ্যই জানতে চাইবে কিভাবে এবং কেন এই ওয়াণ্ডার ভ্যাকসিন কাজ করে। এটা জানতে হলে প্রথমেই তাদের জানতে হবে, প্যারালেটিক পোলিও ভাইরাস এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি সম্বন্ধে কিছু কথা।

ভাইরাসসমূহ হল জীবন্ত এত ক্ষুদ্র বস্তু যে তাদের দেখা যায় না। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক আলট্রা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমেই তাদের ফটোগ্রাফ নেওয়া সম্ভব। মানুষের অন্ত্রের অভ্যন্তরভাগ হল প্রায় পঞ্চাশ ধরনের ভাইরাসের বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত। সেই এণ্টারোভাইরাস-সমূহের অন্যতম হল পোলিও ভাইরাস।

তিন ধরনের পোলিওভাইরাস আছে যা পক্ষাঘাতরোগ সৃষ্টি করে। এই ভয়ংকর ভাইরাস যখন দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে, তখনই বোঝা যায় যে, তারা মানবদেহের কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেমকে আক্রমণ করে বসে আছে।

অথচ যখন পোলিও ভাইরাসসমূহ অন্ত্রের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে চলে তখন কিন্তু কোন গুরুতর রোগ দেখা দেয় না। কেননা এদের উক্ত কার্যের ফলে দেহের মধ্যে আপনা হতেই কিছু পোলিও বিরোধী কিছু অ্যাণ্টিবডিরও সৃষ্টি করে।

যখন কোন মানুষের দেহে প্যারালিটিক পোলিওভাইরাস প্রবেশ করে, তখন কিন্তু রক্তের মধ্যে অ্যাণ্টিবডিসমূহ রোগ সেরে যাবার পরেও থেকে যায় এবং সাধারণত উক্ত ভাইরাসসমূহকে বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। বংশবৃদ্ধি হলেও তা সীমিত সংখ্যায় হয়। বৈজ্ঞানিকরা তাকেই বলেন পোলিও রোগের "ন্যাচারাল ইমিউনিটি" অর্থাৎ স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এ ক্ষমতা সম্ভবত জীবনভর থেকে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরেই এমন একটি ভ্যাকসিন-এর স্বপ্ন দেখে আসছিলেন যা মানুষের দেহে গড়ে তুলবে এক 'নির্দোষ' টাইপের প্যারালিটিক পোলিও যার সত্যি সত্যি পক্ষাঘাত করে তোলবার শক্তি থাকবে না। ঐ স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয় তাহলে রক্তস্রোতে গড়ে উঠবে অ্যাণ্টিবডি এবং রোগাক্রমণ হলেও তা আদৌ মারাত্মক হবে না।

১৯৩৬-এ ডাঃ স্যাবিন প্রমাণ করলেন যে, মানবদেহের বাইরে টেস্ট টিউবের মধ্যে মানব নার্ভাস টিস্যুর ভেতরে পোলিও ভাইরাস সৃষ্টি করে তার বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব। ১৯৪৮-এ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডাঃ জন এণ্ডার্স বাঁদরের দেহের বাইরে

আনা তার নন্‌-নার্ভাস টিস্যুর মধ্যে প্যারালিটিক পোলিও ভাইরাসসমূহের উৎপাদনের এক টেকনিক আবিষ্কার করলেন। ১৯৫১-র মধ্যে একদল গবেষক প্রমাণ করলেন যে, পক্ষাঘাতকারী পোলিও ভাইরাস আছে-মাত্র তিন ধরনের।

এ-সব আবিষ্কারের ফলে কি হল ?

ডাঃ কক্স-এর ভাষায় বলা যায়, যখনই আপনি স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে ভাইরাসকে এনে ভাইরাস উৎপাদনে সমক্ষ হবেন, তখনই উক্ত ভাইরাসদের দ্বারা আপনি প্রকৃতপক্ষে যে কোন কাজই করাতে পারবেন।

এরপর ডাঃ কক্স, ডাঃ স্যাবিন, ডাঃ কপ্রোওস্কি মানুষের অন্ত্রের মধ্যে ভাইরাসের প্রবেশ ও বংশবৃদ্ধি করিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করতে ব্রতী হলেন, যে ভাইরাস লোকটির কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম আক্রমণ করবে না।

জীবন্ত-ভাইরাস ভ্যাকসিন এবং ডাঃ সল্ক-এর ভ্যাকসিনের মধ্যে পার্থক্য কি ? পার্থক্য হল সল্ক-ভাকসিন তৈরী হয় বিষাক্ত ও তীব্র ধরনের পোলিও ভাইরাসদের কেমিক্যাল পদ্ধতিতে 'হত্যা' করে। 'নিহত' ভাইরাস মানব দেহে ইনজেকসন করে প্রবেশ করালে, সে ভাইরাস পোলিও রোগ সৃষ্টি না করে বরং আসল রোগের মতই শরীরে অ্যাণ্টিবডির সৃষ্টি করে থাকে।

অপর দিকে জীবন্ত-ভাইরাস ভ্যাকসিনের মধ্যে ভাইরাসদের পূর্বাহ্লেই প্যারা-লিসিস করবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়। ভাইরাসের এই 'দুর্বল'কৃত অবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অ্যাটেনুয়েটেড' (attenuated). পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো বাঁদর ও শিম্পাঞ্জীদের ওপর। অতঃপর অল্পাকারে মানুষের ওপর পরীক্ষা করা হল। যখন সেটা সাফল্যমণ্ডিত হল, তখন বিশ্বের বহুদেশ তাদের স্ব-স্ব নাগরিকদের প্রতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে আবেদন করলো।

সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশী টেস্ট করা হল রাশিয়ায়। এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষকে এ স্যাবিন ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া হল। একমাস অন্তর তিনবার খাইয়ে দেওয়া হল এ ভ্যাকসিন। ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ সাফল্য দেখা গেল এ ভ্যাকসিন প্রয়োগের ফলে।

ডাঃ কপ্রোওস্কির অপর একটি ভ্যাকসিন পোল্যাণ্ডের নব্বুই লক্ষ শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা হল। এদের মধ্যে কারুরই পোলিও রোগ হয়নি অদ্যাপি।

অনেক বৈজ্ঞানিকেরই ভয় ছিল যে, ঐ attenuated ভাইরাস দেহ থেকে দেহান্তরে গিয়ে এক সময় তাদের "নির্দোষিতা বা নিরীহভাব" হারিয়ে ফের ভয়ংকর হয়ে যেতে পারে।

অবশ্য সে আশংকাও দূরীভূত হল। কেননা লক্ষ লক্ষ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, একটিমাত্র কেস্‌-এও সেরকম কোন কিছু লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়নি। রাশিয়ার অন্যতম প্রখ্যাত পোলিও বিজ্ঞানী ডাঃ এম. পি. চুমাকভ বলেছেন যে, ও ধরনের কোন কিছু আশংকাজনক ব্যাপার হয়নি এবং হবেও না। যে সাত কোটি, সত্তর

লক্ষ মানুষকে প্রতিষেধক এই টিকা দেওয়া হয়েছে সে বছর, তাদের একজনের মধ্যেও কোনপ্রকার বিপরীত ক্রিয়া কিছু লক্ষ্য করা যায়নি।

তারপর কালক্রমে এ ঔষধের অমোঘতা প্রমাণ হওয়ায় দুনিয়ার প্রখ্যাত সব ওষুধ কোম্পানী বিপুল সংখ্যায় ভ্যাকসিন তৈরী করে চলেছে। বিশ্বের যাবতীয় দেশ প্রতিনিয়ত শিশুদের এ টিকা দিয়ে ভয়ংকর ভয়াল পোলিও রোগাক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে চলেছে।

অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে-দিন দেখা যাবে পৃথিবী থেকে এই মানুষ মেরে ফেলা কিংবা চিরতরে বিকলাঙ্গ করে তোলা জঘন্য রোগটি সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পরমাশ্চর্য সব নতুন নতুন চমকের যুগ গেছে বিংশ শতাব্দীর সেই দ্বিতীয় দশকের অবিস্মরণীয় বছরগুলিতে।

সেই উনিশ শ' কুড়ি খ্রীষ্টাব্দের পর পর বছরগুলিতে আমরা পাই জিগুবার্গ, বাথটাব জিন, মডেল টি ফোর্ড গাড়ি, দিক্‌বিদিক মাতিয়ে তোলা ফিল্ম-স্টার রুডলফ ভ্যালেন্টিনো এবং মাংকি গ্ল্যাণ্ডস্ বা বাঁদরের গ্রন্থি।

লোকের মুখে মুখে তখন ঐ এক কথা, মাংকি গ্ল্যাণ্ড আর মাংকি গ্ল্যাণ্ড। জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো, একেই বলে 'ফাউন্টেন অব ইয়ুথ' বা যৌবন ঝর্ণা।

ধরুন, আপনি যদি সে যুগের লোক হতেন এবং ব্যর্ধক্য এসে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করত আপনাকে, আর তখন আপনি পূর্বেকার মত উৎসাহ উদ্দীপনা বা এনার্জি পাচ্ছেন না কোন কিছুতেই। যদিও হয়ত বা তখনও আপনি মনে মনে কিঞ্চিৎ যুবভাবাপন্ন ছিলেন এবং সত্যি কথা বলতে কি, সুন্দরী যুবতী দর্শনে অদৃশ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে মনে মনে আপনার নানাবিধ আকুলি-বিকুলি ভাব জাগরিত হয় অর্থাৎ তখন আপনার সেই অবস্থা যাকে বলে সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। এবংবিধ কালে যদি আপনার যথাযথ আর্থিক সঙ্গতি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি হাতের কাছে ট্রেন, জাহাজ ধরে নিয়ে উপস্থিত হতেন 'দি মাংকি গ্ল্যাণ্ডম্যান' নামে পরিচিত ডাক্তার সার্জ ভরোনফের প্যারিসস্থ ক্লিনিকে চিকিৎসিত হতে।

আর যথাকালে তাঁর হাতে অপারেশন করিয়ে পূর্ণ যৌবন লাভ করে সোল্লাসে ফিরে আসতেন স্বগৃহে।

অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই শল্য চিকিৎসক মানুষের বয়সের ঘড়ির কাঁটাকে পেছনমুখো চালিয়ে হাজার হাজার অসমর্থ, অক্ষম, বয়স্ক এবং ধনাঢ্য মানুষকে পুনরায় তাদের অভাবিত রোমান্সের তথা প্রেম, প্রণয় ও কামলীলার জীবনে প্রত্যাবর্তন করিয়ে ছেড়েছিলেন।

ডাঃ ভরোনফ্-এর চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল চমকপ্রদ ধরনের নতুন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, তিনি একটি শিম্পাঞ্জীকে 'খাসি' করে তার গ্ল্যাণ্ডকে তুলে এনে আপনার জরাজর্জরিত অক্ষম দেহে পুনঃসংস্থাপিত করে দিতেন, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীর থেকে জরাজীর্ণ বহু বছর বয়সের অসহনীয় গুরুভার নিমেষে গলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

প্রকৃতপক্ষে শত শত বয়োবৃদ্ধ পয়সাওয়ালা সম্ভ্রান্ত মানুষের সে-যুগে প্যারিস নগরীতে গেছে এই ডাঃ ভরোনফ্-এর কাছে তার জাদু চিকিৎসা করাতে। আর চিকিৎসান্তে তারা ফিরে এসেছে উজ্জ্বল দৃষ্টি ও উৎসাহ উদ্দীপনা বলবীর্যে ঝলমল হয়ে। আর ক্ষেত্রবিশেষে নিজের বয়স অপেক্ষা তিরিশ বছরের ছোট কোন রূপসী তরুণী ফরাসী কন্যাকে বিবাহ করে নিয়ে স্বদেশাভিমুখে রওনা হয়ে গেছে নতুন করে সংসার পাতবার মানসে।

ডাঃ ভরোনফ্-এর এই চিকিৎসাপদ্ধতি শুধুমাত্র পুরুষ পেসেন্টেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছু বেশী অর্থ নিয়ে তিনি কোন মাদী বাঁদরের যৌন-অঙ্গ তুলে এনে যে কোন আগ্রহী বয়স্কা মহিলার দেহে সংস্থাপিত করে দিতেন।

যেমন, একদা ব্রেজিলের ৪৮ বৎসর বয়স্কা জনৈকা মহিলা সমুদ্র পেরিয়ে এসে উপস্থিত হল প্যারিসের ভরোনফ্-এর ক্লিনিকে।

মহিলা সখেদে ডাক্তারকে বললেন, ডাক্তার, আমার স্বামী আমাকে বুড়ী গণ্য করে আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমি সর্বপ্রথম জাহাজটি ধরে আপনার কাছে চলে এসেছি গ্র্যাফ্‌টিং করে পুনর্যৌবন লাভ করতে। আমায় বাঁচান।

ভরোনফ্ মহিলাটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে তিনি তাঁর কেস-বইয়ে লিখলেন : আমি মনে করি, এই কেস-এ গ্র্যাফ্‌টিং করাটা হবে নীতিগতভাবে খুবই পবিত্র কর্ম। কেন না, এর দ্বারা সামাজিক দিক থেকে এবং একটা ফ্যামিলির শিথিল হয়ে যাওয়া বন্ধনকে পুনরায় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করা হবে। মহিলাটি তাঁর নিষ্ঠুর স্বামীকে নতুন করে প্রাপ্ত সৌন্দর্য নিয়ে পুনরায় জয় করতে সমর্থ হবেন।

চিকিৎসান্তে ভদ্রমহিলা ব্রেজিলে ফিরে যান। এর পর কিছুকাল আর ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। অতঃপর একদিন মহিলাটি ফের এসে উপস্থিত হলেন প্যারিসে। এবার সঙ্গে এনেছেন তাঁর দুই দাদাকে, একজনের বয়স ৬১, অপরজনের ৫৭। তাঁরাও এসেছেন বোনের মত ডাঃ ভরোনফের কাছে অপারেশন করাতে।

ডাক্তার কিন্তু তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন তাঁর ভূতপূর্ব পেশেণ্ট এই ভদ্রমহিলার পানে। সাবাস ! কে বলবে এ মহিলা পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন ? কারুর সাধ্য নেই এঁকে পঁয়ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে ভাবে।

মহিলা কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবেই ডাক্তারের কাছে স্বীকার করলেন যে, সম্প্রতি তিনি তাঁর চেয়ে ছোট তরুণ বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মেলামেশা বেশী করছেন।

ডাক্তার যখন জানতে চাইলেন মহিলাটি বর্তমানে তাঁর স্বামীকে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাচ্ছেন কিনা ? তদুত্তরে মুখ বিকৃত করে তাচ্ছিল্যের স্বরে মহিলাটি বলে উঠলেন, আরে ছোঃ ! ফের ঐ বাস্টার্ডটার কাছে ফিরে যাওয়া, বলেন কী ? বিশেষ করে আমার বর্তমানের দেহ ভরা যৌবনের পসরা নিয়ে যাব ঐ বুড়ো স্বামীর কাছে ! নট্ অন্ ইওর লাইফ ? ঐ বুড়ো আমার এ দেহের উপযুক্তও নয় ডাক্তার।

ভরোনফ্-এর নাম যে কেসটির দ্বারা বিশ্ব-চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাতারাতি তিনি অতি প্রখ্যাত হয়ে যান, সেটি হল জনৈক ৭৪ বৎসর বয়স্ক প্রখ্যাত একজন ব্রিটিশ স্টেটস্‌ম্যানকে সফল চিকিৎসা করে। এই বৃদ্ধ রাজনীতিক কোন উপায়ান্তর না দেখে শেষ আশ্রয় হিসেবে এসেছিলেন ডাঃ ভরোনফ্-এর কাছে চিকিৎসাপ্রার্থী হয়ে।

ভদ্রলোক ছেলে বয়সেই ভয়াবহ যৌনরোগ গণোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় পড়েন, ইয়োরোপে হল স্মল পক্স। অপারেশনের দু'বছর আগে অর্থাৎ ৭২ বৎসর বয়সের সময় তাঁর ছিল পেরিটনাইটিস্ এবং ছিলেন ক্রনিক মাতাল। যদিও তিনি ব্রিটিশ স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন অতি সম্মানীয়পদে আসীন ছিলেন, তবু তাঁর জীবনযাপন ছিল অতীব নোংরা এবং উচ্ছৃংখলতায় ভরা।

তিনি যখন প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উপস্থিত হলেন ভরোনফের ক্লিনিকে, তখন তাঁর দেহ বেঁকে গেছে, হাতে লাঠি ছাড়া চলতে একেবারেই অক্ষম। স্মরণশক্তি খুবই ক্ষীণ, মন ও চিন্তাধারা ঝাপসা ও বোঁদা হয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই তিনি প্রায় এক যুগ ধরে পরিপূর্ণভাবে পুরুষত্বহীনতায় ভুগছিলেন।

ডাঃ ভরোনফ্ একটি তরতাজা শিম্পাজীর অণ্ডকোষ-দ্বয়কে অপারেশন করে পুনঃসংস্থাপিত করলেন এই প্রখ্যাত এবং কনডেমড্ বৃদ্ধের অঙ্গে। দু' সপ্তাহ বাদে বৃদ্ধ ডাক্তারের হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন স্বদেশে।

এর প্রায় আট মাস বাদে ডাক্তারের সঙ্গে এই যুবশক্তি ফিরে পাওয়া বয়োবৃদ্ধ স্টেটস্‌ম্যান-এর পুনরায় সাক্ষাৎকার হল।

নিজের কৃতিত্বে নিজেই চমকিত হলেন ডাক্তার। ৭৪ বৎসর বয়স্ক দেহমনে কনডেমড্ হয়ে যাওয়া প্রখ্যাত ইংরেজ রাজপুরুষকে আর চেনা যায় না। দেহ থেকে বাড়তি চর্বি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বৃদ্ধ এখন যুবকের মত ঋজু হয়ে হাঁটেন চলেন দাঁড়ান। চলাফেরা এত দ্রুত ও স্মার্ট যে, মনে হয় তিনি যেন এক অনুশীলিত যুবক অ্যাথলেট। চোখ ও দৃষ্টি তারুণ্যে উজ্জ্বল, মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে। শরীর থেকে টুপ করে পাকা ২৪টি বছর যেন খসে পড়ে গেছে। পঞ্চাশের ওপর কিছুতেই মনে হয় না ভদ্রলোককে।

রাজনীতিবিদের মুখেই সব শোনা গেল। অপারেশনের পর থেকেই ভদ্রলোক সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে পর্বতারোহণ এবং স্কীইং করে যাচ্ছেন প্রায়শঃই। আবার পূর্বেকার অভ্যেস ফিরে এসেছে। নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করলেন তিনি, যে বর্তমানে সারা ইয়োরোপ চুঁড়ে তিনি বিভিন্ন মেয়েদের পেছনে ঘুরছেন এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করে চলেছেন। এও জানালেন যে, তাঁর পুরুষত্ব স্বাভাবিক ভাবে যৌবন যেমন ছিল তার চেয়েও আরও ভালভাবে নাকি ফিরে এসেছে। সপ্তাহে তিন চারবার তাঁর নারীসঙ্গলাভে আদৌ ক্লান্তি আসে না। তিনি নিয়মিত যুবতী মিলনরূপ অভ্যেসটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

শুনে তো স্বয়ং ডাক্তারই 'থ' হয়ে গেলেন। বলে কি! পরম-লোভাতুর অবৈধ কামলালসাক্রান্ত এই তিন কাল যাওয়া-মানুষটির এত বাড়াবাড়ি তো ভাল নয় বুড়ো হাড়ে।

ডাঃ ভরোনফ্ সাবধান করে দিলেন তাঁর এই প্রখ্যাত ইংরেজ পেশেণ্টকে ; না, অতোটা ঐ লাইনে যাবেন না এত অল্প সময়ে, এত বেশী বার। প্রকৃতির নিয়মেরও একটা সীমা আছে, তাকে সাময়িক দম্ভ ও দর্পভরে লঙ্ঘন করা কিন্তু বিপজ্জনক। জীবনকে অন্যভাবে উপভোগ করুন। সুরা নারী ছাড়া কি আর কোন আনন্দঘন দিক নেই ?

কিন্তু ধর্মকাহিনী শোনবার বান্দা ছিলেন না ইংরেজ মহোদয়। তিনি ডাক্তারের হুঁশিয়ারীতে থোড়াই কর্ণপাত করলেন। চলতে লাগলো তাঁর ইচ্ছাপূরণের লালসাঘন দ্রুতলয়ের জীবন। দুর্মদ দুর্দান্ত গতিতে তিনি পেছনে গর্ভবতী নারীর দল ও সুরা নিঃশেষিত খালি বোতলের মিছিল ফেলে রাখতে রাখতে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু হায়! তাঁর গন্তব্যস্থল যে ছিল মৃত্যুগহ্বর, সে কথা তিনি বুঝেও বোঝেননি।

তিনি অচিরেই অর্থাৎ দু' বছর সাত মাস বাদে অ্যালকোহলিক বিষক্রিয়া এবং 'অপর আরেকটি গুহ্য কারণে' প্রাণত্যাগ করেন। হায় রে! কি বিচিত্র উদ্ভট কারণেই না তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হল। দেহের সুখের জন্য দেহত্যাগ।

এই কাহিনী অর্থাৎ প্রখ্যাত ইংরেজ বৃদ্ধের পুনর্যৌবনপ্রাপ্তির কাহিনী ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ দুনিয়ার দিক্‌বিদিক থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন ও বহু রসিক অথচ অক্ষম বুড়োরা পড়ি-মরি করে চিকিৎসিত হবার জন্য ছুটে আসতে লাগলো ভরোনফ্-এর প্যারিসস্থ ক্লিনিকে। সে এক নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধ অক্ষম অসমর্থ এবং যৌনলালসাপাগল মানুষের মিছিল শুরু হয়ে গেল কম্পাসের কাঁটার মত একই দিকে। প্রায় সকলেই যৌবন এবং যৌবনের মজা ফিরে পাবার অভিলাষী।

অপরাপর কিছু ডাক্তারগণও গ্ল্যাণ্ড-গ্রাফ্‌টিং এক্সপেরিমেন্ট শুরু করে দিলেন। এই ধরনের একটি ক্ষেত্রে প্রখ্যাত কারাগার স্যান কোয়েন্টিনের কিছু কয়েদী নিজেদের বাঁদরগ্রন্থি সংস্থাপনের অপারেশনে স্বেচ্ছায় যোগদান করে। অতঃপর এই অভিনব পরীক্ষাস্বরূপ অপারেশন দ্বারা গৃহীত শরীরের বাঁদরের রক্ত সঞ্চালনের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্যই বুঝি এক রাতে কারাগারের দেয়াল টপকে তারা হাওয়া হয়ে যায়।

সেই বিংশ দশকের একজন প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়সেই অনুভব করলেন যে, তিনি কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছেন। দেহে-মনে জরা এসে জীর্ণ করে ফেলবার উপক্রম করছে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জীবনী-শক্তিকে! তিনি শুনেছিলেন ভরোনফ-এর জাদু-শল্যচিকিৎসার কথা। নিজে একবার ঐ অপারেশন ট্রাই করে দেখবেন মনস্থ করলেন।

এই বিস্ময়কর চিকিৎসান্তে তিনি ফিরে গেলেন যেন তাঁর প্রথম ডগমগে যৌবনের সেই বিশ বছর বয়সের দিনগুলিতে। তাঁর প্রেম-প্রণয়, যৌন জীবন, তাঁর লেখিকারূপে সৃষ্টিশীলতা সবকিছু যেন নিমেষে ফের তুঙ্গে উঠে গেল। তিনি এর পর পুনর্যৌবন লাভরূপ এই যৌন অপারেশনকে কেন্দ্র করে একটি অতি মনোরম উপন্যাস রচনা করেন এবং অচিরেই সেটি বেস্ট সেলার গ্রন্থ হয়ে যায়। এই উপন্যাসের সৌজন্যে জনসাধারণের এই চিকিৎসার ব্যাপারে কৌতূহল সাংঘাতিক-ভাবে জাগরিত হয় বা বেড়ে যায়।

অবশ্য এই চিকিৎসার স্বপক্ষে যেমন মানুষ ছিল, তেমনি বিপক্ষেও ছিল প্রচুর লোক। এইসব সন্ধিগ্ধমনা অবিশ্বাসী মানুষেরা এ চিকিৎসাকে উপহাস করে বহু কাহিনী বহু মজার মজার জোক্স্ তৈরি করে প্রচার করে। এই মাংকি গ্ল্যাণ্ড বা বাঁদরের গ্রন্থি অপারেশন নিয়ে হাস্যকৌতুক কাহিনীরও অন্ত ছিল না।

এইসব চালু গল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠটি হল নিম্নরূপ :

একজন আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ, যিনি নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে খুবই চালু ছিলেন বরাবর, সহসা একদিন বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে উপলব্ধি করলেন তাঁর আগের মত বলবীর্য শক্তিসামর্থ্য আর আদৌ নেই। এ অবস্থাদৃষ্টে বড়ই হতাশাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে যারপরনাই ম্রিয়মাণ হয়ে গেলেন।

অবশেষে তিনি অগতির গতি ডাঃ ভরোনফের প্যারিসের ক্লিনিকে গিয়ে এক সেট বাঁদরের গ্রন্থি নিজ দেহে সংস্থাপিত করিয়ে নিলেন।

তারপর দেশে ফিরে এসে নতুন একজন স্ত্রীর সন্ধানে ব্যাপৃত রইলেন। এক সময় জুটেও গেল। কুড়ি বছর বয়স্কা ব্যায়ামবীর ধরনের দু'কূল প্লাবিনী যৌবন-সম্পন্না এক পাত্রী সংগ্রহ করে বিবাহান্তে অশীতিপর এই যুবক (?) সংসার পাতলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবপরিণীতা পত্নী সন্তানসম্ভবা হয়ে গেল। প্রত্যেকেই পরবর্তী আট মাসকাল অতি আগ্রহে এই কথা ভাবতে ভাবতে কাটিয়ে দিল যে, দেখা যাক বুড়ো বয়সের সন্তান কেমন হয়। হবু বৃদ্ধ পিতাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কম হলেন না। কে জানে, ঐ মাংকি গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবে শিশুটির আকৃতি-প্রকৃতি চরিত্র কি ধরনের হয়।

আট মাসকাল অতিবাহিত হবার পর একদা এক বিংশতিবর্ষীয়া গর্ভিণীকে হুইল চেয়ারে ঠেলে ডাক্তাররা নিয়ে গেল লেবার রুমে, ডেলিভারি প্রকোষ্ঠে। আর বাইরে করিডোরে বসে তখন বৃদ্ধ হবু পিতা একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চেইন স্মোকিং-এর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, চিন্তায় দুর্ভাবনার উদ্বেগের ঠ্যালায় মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাতে লাগলেন।

যেন মনে হল অনন্তকাল পরে ডাক্তার এক সময় মাস্ক ও হাতের গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বাইরে বেরিয়ে এল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বৃদ্ধ পিতা ছুটে গেলেন

ডাক্তারের কাছে, অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, ছেলে না মেয়ে বেবি, ডাক্তার ?

ডাক্তার দু'কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রাগ্ করলো এবং বললো, আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। ছেলে বা মেয়ে যাইহোক সে এখন ওপরের বাতিদানে লেজ পাকিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দোলা খাচ্ছে।

সমসাময়িক ডাক্তার সহকর্মিগণ কিন্তু ভরোনফের প্রতি তামাশা বিদ্রূপ ও বিরক্তিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। তাদের আপত্তি ছিল এই বলে যে, এই অপারেশন পুরোপুরি বা আদৌ কার্যকারী ছিল না। অথচ ভরোনফ্ কিনা দুনিয়াময় এই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন যে এটার তুল্য ফলদায়ক চিকিৎসা আর এ জগতে কুত্রাপী হয় না বা হয় নি।

এতদসত্ত্বেও বিদ্রূপ বিরোধীতাকে অট্টহাস্য হেনে ভরোনফ্-এর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আজগুবী রকমের স্ফীত হতে লাগলো দিনের পর দিন।

লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি রোজগার করেছেন। তাঁর কাজের জন্য ফরাসী গভর্নমেন্ট তাঁকে যথোচিত সম্মানে ভূষিত করেছে। হু-ইজ-হু-তে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তিনি ঈর্ষাজর্জরিত সহকর্মী ডাক্তারদের বিরোধীতায় পরোয়া করবেনই বা কেন ?

ডাঃ ভরোনফ্ ছিলেন দীর্ঘকায়, রোগাটে এবং ছোট্ট একটি গুম্ফ সম্বলিত মানুষ। তাঁর জন্ম হয় রাশিয়াতে, কিন্তু যৌবনেই ফরাসী দেশে চলে আসেন দেশ ছেড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে ভরোনফ্ মিশরেয় খেডিভ-এর রয়াল ফিজিসিয়ান নিযুক্ত হন। এ কার্যে বহুদিন তাঁকে কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে বসবাস করতে হয়। ঐ দেশেই তিনি সর্বপ্রথম গ্ল্যাণ্ড গ্র্যাফটিং-এর ব্যাপারে উৎসাহিত হন।

সে সময়েও মিশরের নানা স্থানে কিছু খোজা মানুষ জীবিত ছিল। যাদের শৈশবকালে খোজা করে দেওয়া হয়েছিল এ কারণে যে, ভবিষ্যতে তারা রাজকীয় হারেমে প্রহরীরূপে কাজ করবে। রাজারাজড়াও নিশ্চিন্ত থাকবেন তাদের রানীদের সতীত্ব বিষয়ে। কেননা, খোজা প্রহরীদের বদ অভিপ্রায় থাকলেও তাদের নারীসঙ্গমযোগ্য কোন শারীরিক ক্ষমতা ছিল না।

ভরোনফ্ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, কোন খোজাই ৪৫ বছর বয়সের বেশী বাঁচে নি এবং ঐ বয়সের মধ্যেই তাদের দেহে চরম বার্ধক্যের যাবতীয় উপসর্গ দেখা দিত ...এবং বার্ধক্যের যাবতীয় যন্ত্রণায় জর্জরিত হত।

ডাক্তার তখন ছাগল ভেড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। বিশেষ করে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন দণ্ডায়মান হতে পর্যন্ত অপারগ পুরুষ ভেড়া নিয়েই সবিশেষ এক্সপেরিমেন্ট চালালেন। এই অকর্মণ্য ভেড়াদের দেহে তিনি যুবক পুং ভেড়ার যৌনাঙ্গ সংস্থাপন করে যৎপরোনাস্তি সাফল্যলাভ করলেন।

অধিকাংশ এ জাতীয় প্রাণীরা ১২ বছর বয়সেই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে, কিন্তু ভরোনফ্-এর অপারেশন চিকিৎসার ফলে তারা এমন কি ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে সমর্থ হল। বহুলাংশে তাদের আয়ুষ্কাল এইভাবে বেড়ে গেল। উপরন্তু এই প্রাণীরা আরও বেশী বয়েস পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠলো। তারা ও তাদের সৃষ্ট বাচ্চারা স্বাস্থ্যে সামর্থ্যে শক্তিতে প্রাণপ্রাচুর্যে আরও বেশী ঝলমল হয়ে উঠলো।

জর্জেস নাওভিয়ন নামক অ্যালজেরিয়ান এগ্রিকালচারাল কোম্পানির ডিরেক্টর শুনেছিলেন ভরোনফ্-এর ঐ ধরনের এক্সপেরিমেন্টের কথা। ফরাসী উপনিবেশ-সমূহে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা মূল ফরাসী দেশ থেকে ভাল জাতের ষাঁড় আফ্রিকায় এনে স্থানীয় নেটিভ গরুদের সঙ্গে মিলন করিয়ে উচ্চজাতের গোজাতি সৃষ্টিতে ব্যাপৃত থাকত।

এই অ্যালজেরিয়ান কোম্পানির 'জ্যাকি' নামক একটি বিশালাকায় বৃদ্ধ ষাঁড় ছিল। এই ষাঁড়টি ছিল তাদের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ প্রজনন ষণ্ড। সারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিভিন্ন কৃষকরা তাদের গরুসমূহকে নিয়ে আসত এই 'জ্যাকির' দ্বারা পাল খাইয়ে বাছুর উৎপাদন করতে। এ-জন্য তাদের আজগুবি অঙ্কের অর্থও প্রদান করতে হত কোম্পানিকে।

কিন্তু বর্তমানে ১৭ বৎসর বয়স্ক এই 'জ্যাকি' আজ বছর দুই ধরে গরুদের প্রতি তাকিয়েও দেখে না, কোনরকম শক্তি বা উৎসাহ নেই, সবই নষ্ট হয়ে গেছে বয়সের ভারে। ভরোনফ্ অ্যালজেরিয়াতে গিয়ে পশুটিকে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখে শুনে মনে হয়, 'জ্যাকি' যেন কষাইখানা থেকে পলাতক এক জরাজীর্ণ জীব।

'জ্যাকির' লোম ঝরে পড়ছিল, তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে, সে প্রস্রাব করে ফেলে যখন তখন। গোয়ালের কোন গাভীর প্রতিই তার আকর্ষণ নেই। আর ইদানীং নতুন জোয়ান ষাঁড় দেখলে বড়ই ভীত হয়ে পড়ে।

ডাঃ ভরোনফ্ দু'বছর বয়সের একটি ষণ্ডের অণ্ডকোষ নিয়ে সে দু'টিকে 'জ্যাকির' অঙ্গে অপারেশন করে স্থাপন করে দিলেন। ভরোনফ্ তার কেস-বইতে লিখলেন, আসলে একটি ষাঁড়ের উপর অস্ত্রোপচার করা, তা সে জোয়ানই হোক বা বুড়োই হোক, খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় এবং নিরাপদও নয়। কাজটি খুবই বিপদসংকুল। ওকে যদিও লোকাল এনেসৃথেসিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং উপরন্তু দশ-বারো জন ইয়া জোয়ান আরব যুবক চেপে ধরে রেখেছিল, তবু শল্যচিকিৎসক দলকে বহুবারই 'জ্যাকি' গুঁতিয়ে বা ঝট্‌কা মেরে চিৎপটাং করে ছেড়েছে নিমেষে।

অবশ্য এই কষ্টান্তে কেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল অর্থাৎ এই এক্সপেরিমেন্ট, পরিণতিতে খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

এই অপারেশনের অব্যবহিত পরেই ভরোনফ্ প্যারিস চলে যান। মাস দুই

বাদে তিনি জর্জেস নাওভিয়ানের কাছ থেকে একটি পত্র পান। তাতে লেখা : যে ষণ্ডকে আপনি অপারেশন করেছিলেন সে অতি চমৎকার কাজ দিচ্ছে। ওর লোম পুনরায় ভেলভেট কোমল হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি চমৎকার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে-পুনরায় 'জ্যাকি' বলবীর্যবান হয়ে উঠেছে। কয়দিন পূর্বে 'জ্যাকি' দুপুরের পূর্বেই একটি গাভীতে চার চার বার উপগত হয়েছে, যেটা খুবই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। এই ষণ্ড এখন নিয়মিত তার যথাকর্তব্য কাজ করে চলেছে। আমি পরে আপনাকে জানাব যে, ঐ সব গাভীগুলি বৎসসম্ভবা হল কিনা।

এর কয়মাস বাদে নাওভিয়ান পুনরায় এক চিঠি লিখে ভরোনফ্‌কে জানিয়েছে যে, 'জ্যাকির' দ্বারা উপগত হওয়া তিনটে গরুই বাচ্চা দিয়েছে। তিনটি বাছুরই স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং দেখতে 'জ্যাকির' মতই হয়েছে। ইতিমধ্যে আরও ছয়-সাতটি গাভীতে এক একদিনে একাধিকবার উপগত হয়েছে এই 'জ্যাকি'। আরেকটি মজার ব্যাপার হয়েছে। আমাদের ফার্মে অপর একটি আট বছর বয়সের বলিষ্ঠ ষাঁড় আছে যার নাম 'সালেম'। 'জ্যাকি' যখন অক্ষম ও অসমর্থ, সে-সময় সালেমই কাজ চালিয়ে গেছে এবং তখন 'জ্যাকি' ছিল মনমরা এবং ভীতু। সালেমকে সভয়ে সে এড়িয়ে চলতো। এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে আবার। বর্তমানে 'জ্যাকিই' পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ফার্মের গোয়ালের লর্ডস্বরূপ বনে গেছে। সালেম এখন ওকে মেনে চলে, সমীহ করে চলে। ফার্মের সবাই এই ধরনের পরিবর্তনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

'জ্যাকি' প্রায় তিরিশ বছর বয়েস অবধি বেঁচেছিল (অবশ্য ওকে পাঁচ বছর পরে আরেকবার অস্ত্রোপচার করে অণ্ডকোষ পুনঃসংস্থাপন করতে হয়েছিল)। সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রজনন কর্ম চালিয়ে গেছে। 'জ্যাকির' অপারেশন সাফল্যমণ্ডিত হবার পর ভরোনফ্‌ স্থির করেন যে, তিনি এবার এই ধরনের চিকিৎসা মানুষের উপর প্রয়োগ করবেন।

কিন্তু কার্যকালে মুশকিল দেখা দিল। ডাক্তার এমন কোন মানুষ পেলেন না যে, স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজ অণ্ডকোষ প্রদান করতে প্রস্তুত। তখন তিনি একটি শিম্পাঞ্জীর সেক্সগ্ল্যাণ্ড নিয়ে তা পুনঃসংস্থাপিত করে দিলেন জনৈক বয়স্ক মানুষের অঙ্গে। অত্যল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল, সেই মধ্যবয়স্ক মানুষটি আঠারো বছরের ছোকরার মত নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে ফরাসী মেডিকাল প্রফেসন ভরোনফ্‌-এর কার্যাবলী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে খুব বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেনি। ভরোনফ্‌ যেভাবে বিজ্ঞাপন করতো যে একমাত্র মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ব্যতীত সে আর সবকিছুই করতে সক্ষম, এতে অপরাপর ডাক্তাররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

শত শত মানুষ এসে ভরোনফের দ্বারা অপারেশন করাতে লাগলো। হু-হু করে

অর্থ আসতে লাগলো। ডাক্তার এবং তার ভাই এই লাভের টাকায় রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি তৈরি করলো ও বিরাট জমিদারী এস্টেট কিনে ফেললো। শোনা যায়, ডাক্তারের বাৎসরিক আয় ছিল কয়েক লক্ষ টাকা।

প্রখ্যাত এবং অখ্যাত সমস্ত ধরনের মানুষই আসতে লাগলো চিকিৎসার জন্য এই মাংকি গ্ল্যাণ্ডম্যানের কাছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের অন্যতম হলেন জার্মানীর প্রাক্তন কাইজার উইল হেল্ম-এর ভগ্নী। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এই মহিলা প্রেমে পড়লেন জাউবকভ নামক ফরাসী রেস্তোর াঁর ওয়েটার এক নব্য যুবকের সঙ্গে। কাইজার ভগ্নীটি এই অসম রোমান্সকে যাতে চুটিয়ে উপভোগ করতে পারেন তাই শরণাপন্ন হলেন ভরোনফ্-এর কাছে অপারেশনের জন্য।

ন্যান্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বৃদ্ধ প্রফেসার রিটায়ার-এর পরেও যাতে কর্মক্ষম থেকে অধ্যাপনা করে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ভারোনফের কাছে এসে অপারেশন করিয়ে যান।

কিছুকালের মধ্যেই একথা প্রকট হয়ে উঠলো যে, ভরোনফের চিকিৎসায় সত্যি সত্যিই ফল দেয়। একথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। অবশ্য একথাও ঠিক, এই আরোপিত ক্ষমতা বা যৌবনলাভ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এক দেড় বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকে। তবে অপারেশনটি খুবই সহজ সরল, অনেকটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচারের মতই। এই অপারেশন প্রয়োজনানুসারে যতবার খুশী করিয়ে নেওয়া চলে।

দি ফ্রেঞ্চ মেডিকাল সোসাইটি অবশেষে ভরোনফ্-এর কার্যাবলীকে স্বীকার করে নিয়ে দেশের সরকারী সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে।

ইতিমধ্যে এই রুশ ডাক্তার অপরাপর ক্ষেত্রেও গ্র্যাফটিং নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যান। তিনি হলেন অন্যতম প্রথম চিকিৎসক যিনি করনিয়াল ট্রান্সপ্ল্যান্ট-কার্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেন। আর অন্ধ মানুষের চোখে নতুন টিসু পুনঃসংস্থাপিত করে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি সাফল্যের সঙ্গে নতুন স্টমাক লাইনিংও গ্র্যাফ্ট করেছেন। নতুন কিডনী বসানো এবং হরমোনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলন করে গেছেন।

ডাঃ ভরোনফ্ জীবনযাপনও করে গেছেন প্রকৃত ধনাঢ্য, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মানুষের মতন। চড়তেন রোলস গাড়ি, কোথাও ভ্রমণের সময় হোটেলের যে কোন তলার যাবতীয় ঘর ভাড়া করে নিতেন, মহামূল্য ও প্রখ্যাত দরজী নির্মিত পোষাক থাকত তাঁর অঙ্গে। তিনি তাঁর নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের সিগারেট শুধুমাত্র তাঁর নিজের জন্য তৈরি করিয়ে আনতেন কোম্পানি থেকে।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ডাঃ ভরোনফ্-এর বয়সে ৬৮ বছর সহসা তিনি বিশ বছর বয়স্কা সুন্দরী স্বর্ণকেশী ফ্রলিনকে (জার্মান মেয়ে) বিয়ে করে ফেললেন।

স্বাভাবিকভাবেই রিপোর্টাররা ধাওয়া করে ধরে ফেললো হনিমুন করতে যাওয়া দম্পতিকে। ভরোনফ্‌কে প্রশ্ন করলো এই বলে যে, তিনি নিজের উপর চিকিৎসা প্রয়োগ করেছেন কিনা, অর্থাৎ অপারেশন করে মাংকি গ্ল্যাণ্ড বসিয়ে পূর্ণযৌবন লাভ করেছেন কিনা, নয়ত সহসা কেন এই বয়সে...।

জবাবে তিনি সহাস্যে বললেন, আমার তো মাত্র ৬৮ বৎসর বয়েস, এখনও আমি ম্যাংকি গ্ল্যাণ্ড ছাড়াই সংসারধর্ম পালন করে যেতে সক্ষম। অবশ্য আমি মনে করি আমার এই নবপরিণীতা পত্নীর সঙ্গে সমানতালে সহবাস করতে হলে সম্ভবতঃ আমার শরীরে যথাসময়ে গ্ল্যাণ্ড গ্র্যাফটিং করিয়ে নিতে হবে। তবে বছর দশেক বাদে আমার সেই অপারেশনের প্রয়োজন হবে, তার আগে নয়!

ক্লায়েন্ট বা পেশেন্টদের চাপের জন্য ভরোনফ্‌ নিজেই একটি বানর প্রজননের ফার্ম খুলেছিলেন ফরাসী-ইতালীয় সীমান্তে অবস্থিত গ্রিমল্ডি নামক স্থানে। এটাকে তিনি বলতেন 'স্টক অফ স্পেয়ার পার্টস'।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাৎসীরা এক সময় রে রে করে ফরাসী দেশে ঢুকে পড়লো।

স্বয়ং হিটলার এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ প্রস্তাব দিলেন এইভাবে, ভরোনফ্‌ নতুন ধরনের এমন কোন গ্ল্যাণ্ড গ্র্যাফটিং প্রথা উদ্ভাবন করুক যাতে জার্মান সৈন্যরা এক একটি সুপারম্যান হয়ে উঠতে পারে।

ভরোনফ ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন, ফলে তাঁকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ স্বদেশপ্রেমিক গুপ্ত ফরাসী বাহিনীর সহায়তায় ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রী জারট্রুডকে স্মাগল করে ফরাসী দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়।

যুদ্ধকালীন সময়টা তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা হয়েছিল। ফরাসীদের মত উদারনৈতিক মনোভাব ছিল না আমেরিকানদের। তাই মার্কিন দেশে বসবাসকালে তাঁকে কোন মাংকি গ্ল্যাণ্ড অপারেশন কার্য করতে সম্মতি দেওয়া হয়নি।

যাইহোক, ভরোনফ্‌ চুপচাপ বসেছিলেন না তা বলে। সমানে নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্রেটিন্‌স্‌ বা কনজেনিটাল ইডিয়টদের (সহজাত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অথর্ব বা নির্বোধ) দেহে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড গ্রাফ্‌টিংএর ব্যাপারে প্রচুর রিসার্চ চালিয়ে গিয়েছেন। আর আজকে ঐ ধরনের চিকিৎসা যে উদ্ভাবিত হয়েছে তার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তিনিই।

যুদ্ধের পর তিনি ফের ফিরে যান তাঁর মাংকি ফার্ম চ্যাটো গ্রিমল্ডিতে এবং তাঁর ক্লিনিককে নতুন করে খোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের লাউসান নামক স্থানে হৃদ্‌রোগের

ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮৫ বৎসর কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হত ৫০ মাত্র।

তিনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন, জীবনযাপন করেছেন প্রকৃত একজন রাজার মতন এবং পেছনে রেখে গেছেন তুলনাবিহীন এক কিংবদন্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি গ্ল্যাণ্ড যদি পুনঃসংস্থাপিত করা সম্ভব হয়, তাহলে অপরাপর গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপারেও তা সম্ভব। তিনি এই আস্থা নিয়েই মারা গেছেন যে, ভবিষ্যৎ যুগে বাহু, পা, হার্ট এমন কি ব্রেন পর্যন্ত ট্রান্সপ্ল্যাণ্ট করা সম্ভবপর হবে। জীবিত থাকাকালীন তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, অচিরেই এমন একটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের "স্পেয়ার পার্টস ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত হবে যার সাহায্যে মানুষ নতুন জীবন পাবে, তাদের আয়ু বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১৫০ বৎসরে এবং সে বয়েস অবধি তারা স্বাস্থ্য সামর্থ্য বলবীর্য ও যৌবন নিয়েই জীবনযাপন করে যেতে পারবে।

একটু একটু করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে আজ। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে আজ আমরা ব্লাড ব্যাঙ্ক পেয়েছি এবং ভল্ট গড়েছি যেখানে চোখ এবং পাকস্থলী বরফে সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব। প্রয়োজনানুসারে সেগুলি যাতে আহত মানুষের দেহে পুনঃসংস্থাপিত করা যায়।

ডাক্তার ভরোনফ্ কখনো স্বীকার করে যান নি যে, তাঁর দেহে কোন গ্র্যাফটিং হয়েছে কিন্তু তিনি আসল বয়সের চেয়ে অনেক অনেক কম বয়সের আকৃতি নিয়ে মারা গেছেন। বয়সের তুলনায় কি দেহে কি মনে অনেক বেশী যুবক ছিলেন তিনি।

ঘুরিয়ে বলা যায়, সার্জ ভরোনফের জীবনে বাঁদরামি (মাংকি বিজনেস) সাংঘাতিক অর্থপ্রসূ হয়েছিল।

ডাঃ মার্কো যা সন্দেহ করেছিলেন তা যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে, দুনিয়ার বুকে নেমে আসবে এক বিরল রোগের বিভীষিকা। সে মহামারীতে বহু লোকের প্রাণ যাবে।

রেজিনা ফক্স তার ঘরে বিছানায় পড়েছিল কেমন আচ্ছন্নের মত, চোখ দুটো ঘোলাটে, গায়ের রঙ রক্তিমাভ। মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছিল কিন্তু পরমুহূর্তে তা স্তিমিত হয়ে গিয়ে নিরব হয়ে যাচ্ছিল। প্রতি ২।৩ মিনিট অন্তর প্রবলভাবে কাশতে কাশতে সে কম্পিত আঙ্গুলে বিছানার চাদর খিমচে ধরছিল। তারপরেই প্রবল শীত। সারাদেহ-তার হু-হু করে কাঁপতে শুরু করছিল।

পাশে দাঁড়ানো যুবকের নাম ডোনাল্ড মোজার। সে এই মেয়েটির সঙ্গে নিউইয়র্ক স্টোরে কাজ করে। সে উদ্বিগ্ন নয়নে দেখছিল রেজিনা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কেমন হাঁসফাঁস করে চলেছে। ক্রমশই যেন ওর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে···। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে মেয়েটির।

—রেজিনা শুধু তুমি একাই অসুস্থ হয়ে পড়োনি। নাইট ওয়াচম্যান ম্যাক টালিও একই উপসর্গে বিছানা নিয়েছে। ওর লাংসও নাকি আক্রান্ত হয়েছে। স্টোর ম্যানেজার মিঃ স্টুয়ার্টও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ডাক্তাররা বুঝতে পারছেন না ওর কি হয়েছে। স্টোর কাফেটোরিয়ার ডিস ধোয় যে সেই হেনরি ভারসিল্লিও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। লোকেরা চলে যাচ্ছে। তারা ওখানে কাজ করতে ভয় পাচ্ছে এ ধরনের রহস্যময় অসুস্থতা দেখে।

অসুস্থ মেয়েটি মুখে রুমাল দিয়ে প্রবলভাবে কেশে যাচ্ছে।

—শহরে আর কেউ অসুস্থ হয়েছে কি? নাকি যারা এই স্টোরে কাজ করছে তারাই হচ্ছে?

মোজার যাবার জন্য উদ্যত হল। সে চায় না বক বক করে মেয়েটিকে বিরক্ত ও ক্লান্ত করতে, বললে, না শহরে আর কেউ অসুস্থ হয়নি এভাবে। আমার ভয় হচ্ছে খুব রেজিনা। বহু লোক মনে করছে স্টোরটাকে সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে গেল পিকস্কিল অঞ্চলে। দেশব্যাপী এই চেন-স্টোরের অন্যতম এটিতে কেনাকাটা করতে ঢোকা বিপজ্জনক একথা ছড়িয়ে গেল স্থানীয় খদ্দেরদের মধ্যে। বিক্রিবাটা ভয়ংকরভাবে কমে গেল। আরও কথা উঠলো যে

এই নিমোনিয়া ধরনের বিচিত্র রোগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত বিল্ডিং বন্ধ করে দেওয়া হোক।

স্টোরের তেরজন রোগীর উদ্বিগ্ন আত্মীয়রা স্থানীয় হেলথ অফিসারদের শরণাপন্ন হল। তারা এসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত স্টোর দেখে শুনে এ-রোগের উৎস বা উৎপত্তির খোঁজ হদিশ করতে পারলো না।

স্টোরটি খুবই নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। ক্যাফেটোরিয়ায় রয়েছে সর্বাধুনিক ডিসওয়াশিং এবং স্টেরিলাইজিং মেশিনপত্র।

গাস পিগট নামে স্টোরের এক ড্রাইভার এরপর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো। এক সময় মনে হল সে বুঝি বাঁচবেই না আর। তিরিশ বছরের পুরনো কর্মী ৫০ বছর বয়স্ক এই ড্রাইভারকে তার মধুর স্বভাবের জন্য সবাই ভালবাসতো।

গাস-এর জ্বর উঠলো ভয়াবহ ১০৫ ডিগ্রীতে। সঙ্গে হাড় কাঁপানো শীতভাব। দাঁতে দাঁত লেগে খটাখট শব্দ হতে লাগলো। তার পারিবারিক চিকিৎসক নিমোনিয়া ভেবে অরিওমাইসিন এবং অপরাপর অ্যান্টিবায়োটিকস ঔষধ দিল এবং রোগীর পাশে চিন্তিতভাবে বসে রইল। গাস তখন সমানে প্রলাপ বকে যাচ্ছে তার অফিসের নানা কাজ কর্ম বিষয়ে।

...এরকম রোগে আর আমি আগে কখনো পড়িনি...স্টোরে এমন কিছু একটা অশুভ ব্যাপার নিশ্চয়ই হয়েছে... ফ্লোরেন্স গ্রিম আমার আগেই অসুখে পড়েছে... আর ঐ পাখি বেচারারা তারা পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে...মরে যাচ্ছে ওরা...পাগুলো কাঠ হয়ে ওপর দিকে তোলা অবস্থায় মরে পড়ে থাকছে।

—পাখি! পাশে বসা চিকিৎসক নিজ মনেই বলে ওঠে, কোন্ পাখি?

প্রলাপরত রোগী রক্তবর্ণ চোখে চেয়ে জবাব দেয়, আমাদের স্টোরের পেট-ডিপার্টমেন্টের পাখি...এত সুন্দর টিয়া আর চন্দনা আপনি দেখেননি কখনো... আফশোস, তারাও পটাপট মরে যাচ্ছে।

১৯৫২-র মে মাসের সেই উত্তপ্ত দিনে অসুস্থ পিগটের পাশে বসা ডাক্তারের মনে একটা প্রবল সন্দেহ জেগে উঠলো। পাখি আর এই ধরনের নিমোনিয়ার মত রোগ-এ দুয়ের মধ্যে কি কোনপ্রকার সম্পর্ক রয়েছে? কোন যোগাযোগ?

এই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের এ-ব্যাপারে মনে এল বছর কুড়ি বাইশ পূর্বের প্রায় বিস্মৃত এক বিশ্ব-জোড়া মহামারীর কথা। সেটা ছিল ১৯২৯-৩০ সাল। সেটাও কিন্তু ঘটেছিল পাখিদের দ্বারা। সেবার ১৭টি দেশে ১৫০০ লোক আক্রান্ত হয়ে প্রায় আধাআধি লোক প্রাণ হারায়।

উল্কাবেগে দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়া সেই আধা মহামারী দেখে লোকে প্রথমটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। বহুদেশের চিকিৎসকগণ তাকে ভুল করে ভেবেছিল এক হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া বা অন্যকোন শ্বাসকষ্ট রোগ বলে। দলে দলে যখন লোক মরতে লাগলো তখন পোষ্টমর্টেম পরীক্ষায় কিন্তু উপরোক্ত কোন

রোগের সন্ধান পাওয়া গেল না।

মেডিকাল ওয়ার্ল্ড এ রহস্যে স্বভাবতই শংকিত হয়ে পড়লো। তারপর বজ্রাঘাতের মত এর মূল কারণ উদঘাটন হল সুদূর আর্জেন্টিনাতে। সেখানে টিয়া চন্দনা জাতীয় পাখিরা দলে দলে অসুস্থ হয়ে মরে যেতে থাকলো। ঠিক মানুষের মত উপসর্গে ভুগে তারা খতম হতে আরম্ভ করলো। পরে জানা গেল ঐ মহামারীর মূল কারণ হল সেই পক্ষীকুল যারা বাহক হয়ে মানুষের মধ্যে এরোগ ছড়িয়ে মহামারীর সৃষ্টি করেছে।

এবারও পিকস্কিল অঞ্চলের চিকিৎসকেরা ভাবতে বসলো, তাহলে কি সেই মারক রোগ আবার নিউ ইয়র্কে ফিরে এল ১৯৫২-তে, সুদীর্ঘ ২২ বছর বাদে।

সেই ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টকে তাঁর সন্দেহের কথা জানিয়ে দিল।

বারোঘণ্টা বাদে, তিনজন চিন্তিত বিজ্ঞানী সেই প্রায় ফাঁকা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এসে উপস্থিত হল। সরাসরি চলে গেল পোষা প্রাণীর বিভাগ পেট-শপ-এ। গিয়ে দাঁড়ালো একটি পাখির খাঁচার সামনে, টিয়া চন্দনা ভর্তি ছিল তাতে।

ছটি পাখী মরে পড়ে আছে, পালকগুলো ইতস্তত আগোছাল, পা দুটো কাঠ হয়ে উপর দিকে তোলা। তিরিশটি টিয়া চন্দনার মধ্যে এগারটি পাখি কোনক্রমে আধমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে টলতে টলতে। এত দুর্বল যে খাবারের প্রতিও তাদের আকর্ষণ নেই, কোন জলও স্পর্শ করছে না।

জন ভাইনার নামের জনৈক মহামারী বিশেষজ্ঞ খাঁচার দরজা খুলে মৃত একটি পাখিকে বার করে এনে ক্রেসল মাখা একটি কম্বলের টুকরো জড়িয়ে বরফের বাক্সে পুরে দিল।

—যদি এটা সিটাকোসিস (Psittacosis প্যারট ফিভার) হয়ে থাকে, যা আমরা শিগ্রই জানতে পারব, সেই বিশেষজ্ঞ গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, তাহলে এই সমস্ত পাখিগুলোকে মেরে ফেলতে হবে।

বলে সে মনে ভাবলো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এটা ১৯২৯ নয় এটা ১৯৫২ আজ আমাদের হাতে অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে, ফলে অধিকাংশ রোগী প্রাণে বেঁচে যাবে। সে যুগে যা ছিল অসম্ভব কল্পনা। তবু এ-রোগটা খুবই মারাত্মক সন্দেহ নেই। …কিন্তু আমি ভাবছি এই শয়তান রোগাক্রান্ত পাখিগুলো কিভাবে এবং কোথা থেকে এই স্টোরে আমদানি হল ?

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই স্থানীয় একজন পশু চিকিৎসকের অভিমত পাওয়া গেল। এ-রোগটা অবশ্যই 'সিটাকোসিস' (টিয়া-জ্বর) যেমন সন্দেহ করা গিয়েছিল। এখন স্টোর কর্মীদের মধ্যেই অসুখটা সীমাবদ্ধ থাকায় একে সহজেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে। আর উৎস সন্ধানেরও সুবিধে হবে।

অসুস্থ এবং মুমূর্ষু পাখিগুলোকে বের করে এনে ধ্বংস করে ফেলা হল সঙ্গে সঙ্গে।

বাদবাকিগুলোকে মাসখানেক ধরে পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে কোরেন্টাইন করে আলাদাভাবে রাখা হল। সৌভাগ্যক্রমে এই অসুস্থ পাখিগুলোর সঙ্গে নিয়ত সংস্পর্শে আসা লোকজনেরাই মাত্র অসুস্থ হয়েছিল। এ-রোগ অবশ্য মানুষ থেকে মানুষে সংক্রামিত হওয়া খুবই বিরল ঘটনা, শুধু স্টোরের লোকজনের মধ্যেই রোগটি সীমাবদ্ধ থাকায় বাঁচোয়া। নয়ত নিয়ম অনুসারে এ-রোগের ভয়াল বীজাণু সাধারণত বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বহু লোকের দেহে স্বাভাবিকভাবে এ-রোগ বা অন্য ফুস-ফুসের রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। স্টোরের মহিলা ম্যানেজার কিন্তু এ-রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লো না। ব্লাড টেস্টে দেখা গেল যে তার দেহে গড়ে ওঠা অ্যান্টিবডিরা এই রোগ বীজাণুকে প্রতিহত করে দিয়েছে।

বিশদ ডিটেকটিভ কার্যের পর জানা গেল এই মহামারীর জন্য দায়ী হল দক্ষিণের এক টিয়াচন্দনাপক্ষী আমদানিকারক ব্যবসায়ী। সে লোকটা কিছু পাখিকে এমন কি নড়বড়ে পা নিয়ে দাঁড়াতে অক্ষম দেখে তাদের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে প্রকৃত অবস্থা চাপা দিয়েছে। এক কোয়ার্ট জলের সঙ্গে ৫০ মিঃ গ্রাম অরিও মাইসিন গুলে তা খাইয়ে এই অসৎ ব্যবসায়ী অসুস্থ পাখিগুলোকে চাঙ্গা করে উত্তর দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। যদিও পাখিগুলো নিয়ে এসেছে তাদের দেহভর্তি উক্ত ভয়ংকর রোগ বীজাণু।

যথোপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাকে ফেডারেশান কোর্টে অভিযুক্ত করে তোলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পিকস্কিলের স্টোরে থাকা পাখিগুলি রুগ্ন এবং রোগবাহক হিসেবে যদি সন্দেহ বশে ধরা না পড়তো এবং তৎপরতার সঙ্গে যদি তাদের খতম না করে ফেলা হত তাহলে ঐ দারুণ সিটাকোসিস রোগে বহু লোক আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু লোকের প্রাণহানি হত একথায় কোন ভুল নেই।

দুর্ভাগ্যক্রমে সিটাকোসিস রোগ আর শুধু মাত্র টিয়া চন্দনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। এ-রোগ ছড়িয়ে পড়লো হাঁস, মুরগী, বাজ পাখি এমন কি পায়রাদের মধ্যেও। মার্কিন দেশের প্রতিটি নগরীর পার্ক বাস্কোয়ারে বাস করা অজস্র পায়রার ঝাঁক, যারা জনতার দেওয়া নানাবিধ খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই কবু-তরের পাল হয়ে উঠলো এ-রোগের রিজারভার বিশেষ। যা যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে সর্বনাশা কেলেঙ্কারী ঘটাতে পারে।

ফলে এ-রোগ আর বিরল রোগ রইল না। প্যারট ফিভার আর প্যারটে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য পাখীকে যখন তাদের বীজাণুর আধার স্বরূপ ধরে নিল তখন এটা হয়ে উঠলো মার্কিন দেশের পাবলিক হেলথ সংস্থার কাছে এক ভীতিপ্রদ সমস্যা বিশেষ।

জানিত ইতিহাসে সিটাকোসিস রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের উলস্টার নামক স্থানের হ্যাজস ফ্রুহাফ নামক জনৈক বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে। এই ব্যবসায়ী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নিজ বাড়িতে নানাবিধ পোষা

প্রাণীর একটি মিনি চিড়িয়াখানা করেছিলেন। একবার তিনি জার্মানীর হামবুর্গ নগরীর জনৈক রপ্তানীকারকের কাছ থেকে ছয়টি ছোট প্যারাকিটস (টিয়া চন্দনা জাতীয় পাখি) ক্রয় করেন। বাড়িতে আরও অনেক পাখিই ছিল। নতুন আধ ডজন আসার পর ছোটরা দেখে শুনে বললে যে, এই নবাগতরা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে, প্রাণচাঞ্চল্য আদৌ নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা তারা খাবার মোটেই খাচ্ছে না।

ওর মধ্যেকার একটি পাখী ছোটরা যার নাম দিয়েছিল 'পাট্‌ল' সে বছর ১লা মার্চ মারা গেল। এর ২ সপ্তাহ বাদে ফ্রুহাফ গিন্নী স্বামীকে জানলো, বুঝলে, আর্নেষ্ট হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সারা শরীর ছেলের জ্বলে যাচ্ছে আর তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমার বড় ভয় হচ্ছে যে ...

ভদ্রমহিলার সঙ্গত কারণেই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর কোলের ছেলেটা প্রকৃতই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ-ছেলের সেবা করবার মধ্যেই পরিবারের আরও চারজন অসুস্থ হয়ে পড়লো। গ্রামের চিকিৎসক যাকে নিমোনিয়া রোগ বলে অভিহিত করলো। ২৭ এবং ২৯শে মার্চ এপরিবারের বাইরে দুজন লোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেল। তাদের একজন পড়শী যে প্রত্যহ এ বাড়িতে যাতায়াত করতো। অপর জন হল ভাড়া করা স্ত্রীলোক যে, এ বাড়ির সবাই যখন অসুখে শয্যাগত তখন ঐ পোষাপ্রাণীগুলোর দেখা শোনা এবং পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল।

প্রতিটি রুগীরই প্রচণ্ড জ্বর এবং অসহনীয় প্রচণ্ড কাশি। তিন জন মারা গেল। পড়শীরা একই বাড়িতে এরকম ভয়াবহ "মহামারী" ঘটতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলো এ অবশ্যই শয়তান এবং 'ইভল্‌-আই-এর অদৃশ্য কোপের ফলে হয়েছে।

যদিও স্থানীয় ডাঃ এবার্থ শবব্যবচ্ছেদ করে রায় দিল লোবার নিউমোনিয়া, কিন্তু এ রায়-এ সন্তুষ্ট হতে পারলো না উস্টারেরই জনৈক অনুসন্ধিৎসু প্যাথোলজিস্ট, যার নাম জ্যাকভ রিটার। রিটার অসুস্থ-মৃত প্যারাকিটস্‌ পাখিগুলিকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। মৃত মানুষের শবও পরীক্ষা করলো, পরে জানালো যে, এই পরিবার এ পর্যন্ত অজ্ঞাত ও রহস্যময় রোগে আক্রান্ত হয়েছে যার বাহক হল নতুন কেনা ছয়টি জার্মানীর পাখি।

সে তার আবিষ্কারের নামাকরণ করলো নিউমোটাইফাস্‌ (Pneumotyphus) বলে কিন্তু ১৮৯৫-তে ডাঃ অ্যান্টনিন মোরাঞ্জু নামক প্যারিসের একজন চিকিৎসক, পাখিগুলো যে খাঁচায় থাকতো, এবং তার সন্নিধানে যারা যেত সব কিছু বিচার বিবেচনা করে এ-রোগের নতুন নামাকরণ করেন সিটাকোসিস। টিয়া চন্দনার অর্থাৎ প্যারটকে গ্রীক ভাষায় বলে সিটাকোস, তারই অনুসরণে এ নাম দেন।

অতঃপর যুগের পর যুগ ডাক্তারেরা সিটাকোসিসকে নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল। তারা ক্রমক্রমেই একে মেডিকাল হিস্ট্রিতে একটা বিরল রোগ বলেই এটাকে অব-

হিত করে চলেছিল। এ-রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ প্রায় নিউমোনিয়া বা যে কোন শ্বাসকষ্টের রোগের সঙ্গে এতটাই সমতুল যে যুগে যুগে ডাক্তারেরা অনুমান করেন যে এই অজ্ঞাত প্যারট ফিভারে বহু লোক মারা পড়েছে অথচ তা ডাক্তারদের কাছে আসল রোগ বলে ধরা পড়েনি। তারা ভেবে নিয়েছে এটা নিউমোনিয়া বা অপর কোন ফুসফুসের জটিল রোগ।

উল্লেখযোগ্যভাবে এই প্যারট ফিভার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সেবার বুয়েনার্স এয়ার্সের টিয়েট্রো গ্রাণ্ডেতে ১৯২৯-এর জুলাই মাসের এক রাত্রিতে।

নগরীর অভিজাত সম্প্রদায়, অফিসার রাজনীতিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও তাঁদের পত্নীরা গিয়েছিলেন টিয়েট্রো গ্র্যাণ্ডেতে প্রখাত মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও নিলের একটি নাটক "স্ট্রেঞ্জ ইন্টার লিউড" এর উদ্বোধনী শো দেখতে।

নাটকটি তখন মাত্র ২০ মিনিট চলেছে. তখনই দর্শকদের কাছে অপর একটি নাটকের খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রধান অভিনেতা আর টুরো কাসাস-এর কি যেন হয়েছে মনে হল, অভিনয়ের বিভিন্ন অংশে মনে হল প্রধান অভিনেতা যেন কেমন টলে টলে ফিরছে আর কথাও যেন কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের মধ্যে কিছু লোক হৈ হৈ করে উঠলো এই ভেবে যে প্রধান অভিনেতা বেশ ভাল রকম মদ্যপান করে মাতাল হয়ে গিয়েছে। তারপরেই প্রবলভাবে কম্পিত হতে লাগলো অভিনেতার দেহ এবং কুল কুল ঘামে ভিজে উঠলো তার শরীর।

দ্বিতীয় অঙ্কে সে টলে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হল। জ্বরাক্রান্ত ঘোলাটে চোখ নিয়ে সে স্টেজের উপরে ঝোলানো ঝাড় লণ্ঠনের পানে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল, তার মানে হল, ওটা বুঝি যে কোন মুহূর্তে তার মাথার ওপর নেমে আসতে পারে। পার্ট উল্টোপাল্টা বলতে বলতে মাথা ও কপালে জমা স্রোতের মত বয়ে যাওয়া ঘাম সে রুমাল দিয়ে মুছতে থাকল। এরপরেই মালভর্তি বস্তার মত সে পড়ে গেল মেঝেতে একটা ল্যাম্প পোস্টকে ধাক্কা মেরে।

দর্শকরা যখন চিৎকার করে উঠলো তখন স্টেজে থাকা খাঁচার মধ্যেকার একটা প্যারট চিৎকার করে উঠলো কর্কশধ্বনীতে, যে প্যারটকে অভিনেতা প্রতিবার রিহার্সেলের সময় নাটকের নির্দেশ অনুযায়ী রুটির টুকরো এবং অপরাপর খাদ্য খাইয়ে আদর করেছে।

প্রধান অভিনেতাকে ১০৫ জ্বর ও প্রলাপ বকা অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল।

হাসপাতালের ডাক্তার হারন্যানডেজ মোরার অভিমত হল ঃ

এমন কোন রোগের সম্মুখীন আমি জীবনে ইতিপূর্বে হইনি। দেখে মনে হয় এটা এক হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমোনিয়া তবে এর আক্রমণ ও তীব্রতা অনেক অনেক বেশি খারাপ। রোগীর নিদারুণ মাথার যন্ত্রণা হয়, পেটের গোলমাল হয়, আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অকল্পনীয় বেদনায় জর্জরিত হতে থাকে, এটাকে ভ্রমক্রমে লোবার

নিউমোনিয়া হিসেবে ধরা সম্ভব। কিন্তু রোগীর ফুসফুসে এমন কনজেসন কখনো দেখিনি। রোগী প্রতি মুহূর্তে শ্বাসকষ্ট ও মরণযন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। এই-ভাবে তার হার্টকে দুর্বল করে দেয় এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়…

অত্যন্ত বলশালী দেহধারী প্রধান অভিনেতা কাসাস দু-সপ্তাহমাত্র যমের সঙ্গে লড়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেল। মরণকালে অস্থিচর্মসার নিরবচ্ছিন্ন কাশিতে জর্জর অবশেষে ফুসফুসে রক্তক্ষরণের ফলে পনের দিনের মাথার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

প্রধান অভিনেতাকে যে দিন কবর দেওয়া হল,সেদিন উক্ত নাটকের জন্য-একজন অভিনেত্রী টেরেসা মেনডোজাকে একই উপসর্গ সহকারে ঐ বুয়েনার্স এয়ার্স হাসপাতালে ভর্তি করা হল। এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত নাটকের আরো আটজন কুশীলব এবং মঞ্চকর্মী একই বেদনাদায়ক উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে শয্যা নিল।

যেহেতু অধিকাংশ চরিত্র গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী তাই অনির্দিষ্ট কালের জন্য নাটক বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু কি এই রোগ এবং কেনই বা এ-রোগ? স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এধরনের রোগের কোন পূর্ব নজির নেই। তবে কি থিয়েটারের অভ্যন্তরের কোন কিছু মারাত্মক গোলমালে এ মহামারীসদৃশ রোগের উৎপত্তি হল?

ডাক্তার এবং লেবরেটারি বিশেজ্ঞরা থিয়েটারটি চষে ফেললো এ-রোগের উৎস নির্ণয়ের ব্যাপারে। ধুলো নিল, প্লাম্বিংপাইপ চেক করালো, হিটিং সিসটেম পরীক্ষা করে দেখলো।

একজন মঞ্চকর্মী এ-রোগাক্রান্ত হয়ে পুরো ৪০ পাউণ্ড ওজন হারালো এবং দু'সপ্তাহ ধরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুর জন্যে খাবি খেয়ে অবশেষে প্রাণ হারালো… অপর রোগীরা ভাগ্যক্রমে বহুদিন অবর্ণনীয় রোগ ভোগের পর বেঁচে গেল। কেউই কিন্তু বুঝতে পারলো না এই ঘৃণ্য রোগটি কি বা কি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ডাঃ জুলিও মার্কো নামের জনৈক প্যাথোলজিস্ট এক অগাস্টের সকালে যখন সংবাদপত্রে পড়লো যে, এই রোগ করডোবা নামক স্থানেও ছড়িয়ে পড়েছে তখন সে অত্যন্ত বিচলিত না হয়ে পারলো না। সে যখন উক্ত স্থানে রওনা হয়ে গেল সরজমিনে তদন্ত করতে, তখনই খবর এল যে, একই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে টুকুম্যান নামক স্থানেও। করডোবা নামক নগরী এ-রোগের দ্রুত প্রসারে যৎপরনাস্তি হতচকিত হয়ে গেল, এই অদ্ভুতজ্বর ও ফুসফুসের রোগ দেখে। সেই ডাক্তার সরজমিনে এসে শুনলো যে, মানুষ এবং পাখিরাও যুগপৎ আক্রান্ত হয়ে এ-রোগে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। মারাও যাচ্ছে প্রচুর সংখ্যায়।

—পাখি? কি ধরনের পাখি? প্যাথলজিস্ট ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—শুধু মাত্র প্যারট। গত মে মাসে এখানে ম্যাকটস, প্যারটস, কক্কাটুজ এবং প্যারটসদের বিরাট এক নিলাম হয়। বহু লোক এ সব পাখি কেনে এবং হাজার

হাজার উক্ত ধরনের পাখি সারা পৃথিবীময় রপ্তানী হয়ে যায়। প্রায় ১০০ টির মত প্যারট শুধু মাত্র করডোবাতেই আজ পর্যন্ত মারা পড়েছে।

ডাঃ মার্কোর চোখ কুঁচকে এল এ দুঃসংবাদ শুনে।

তার স্মরণে পড়লো বুয়েনার্স এয়ার্সের মৃত অভিনেতার শবব্যবচ্ছেদ রিপোর্টের কথা। সেগুলো কি? পাখিদের ব্যাপারেই কি যেন ঘটনা। ও…হ্যাঁ নতুন একটি পাখি যা উক্ত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল… সেটাও অবশ্য মারা যায়… অবশ্য মৃত প্যারটের দেহের কোন পোস্টমর্টেম হয়নি। পাখিটার মৃত্যু নিয়ে কেউই তখন পর্যন্ত মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না।

ডাঃ মার্কোর মনে ঘোরতর সন্দেহ এসে বাসা বাঁধলো। তিনি যা সন্দেহ করছেন তাই যদি সত্যি হয় তাহলে সারা বিশ্ব এক চরম মহামারীর সম্মুখীন হতে চলেছে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা জাহাজে করে এই ধরনের রুগ্ন এবং রোগবাহী কত শত প্যারট রপ্তানী হয়ে চলেছে দিগবিদিকের দেশ থেকে দেশান্তরে। এই ভাবে সারা বিশ্বে সিটাসিন রোগবাহী পাখিরা চলেছে বিভিন্ন শহরের পোষা পাখীর খাঁচায় মৃত্যুবীজ ছড়াতে।

বয়স্ক এক মালিকের দেওয়া 'মুচাকো' নামধারী একটি ঘন সবুজ প্যারট তিন সপ্তাহ আগে কেনা হয়েছিল। এখন তার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে টুকাম্যান-এর এক হাসপাতালস্থ পাথরের টেবিলের ওপর। তার দেহাভ্যন্তর থেকে পরীক্ষার জন্য বের করে নেওয়া হয়েছে যকৃৎ, হার্ট এবং লিভার।

ডঃ মার্কো উত্তেজিত কণ্ঠে টেলিফোন যোগে বলে যাচ্ছিলেন বুয়েনার্স এয়ার্সের মিউনিসিপাল বোর্ড অফ হেলথের ডিরেক্টরের সঙ্গে ঃ

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি নগরের যাবতীয় স্টোরে পাখি বিক্রী এই মুহূর্তে নিষিদ্ধ করে দিন।

সেগুলোকে কোয়ারেন্টাইন করে বিচ্ছিন্ন করে রাখুন, কেনা পাখির মালিকদের তাদের পাখিগুলোকে এখুনি পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে অনুরোধ করুন। আমার মনে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি করডোবাতে পাঁচটা প্যারটকে এবং তিনটি মৃতপ্রায় পাখিকে ব্যবচ্ছেদ করেছি। নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে সিটাকোসিস—প্যারট ফিভার—ঈশ্বর জানেন সারা বিশ্বময় কত লোক মারা পড়বে এ বিষাক্ত রোগে। আমি জেনেছি সেই করডোবার নিলাম-এ বিক্রি হয়ে ৬০০০ পাখী রপ্তানী হয়ে গিয়েছে। এদের প্রত্যেকটাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ভারী রকম সর্বনাশ সাধিত হবার পূর্বেই। বেশি বিলম্ব হবার আগেই।

কিন্তু বিলম্ব যা হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। সর্বনাশা বিলম্ব। খুবই দুঃখের এবং পরিতাপের ঘটনা। সুইজারল্যাণ্ডে—এরোগ এর ভেতরেই ছড়িয়ে পড়লো। ওখানকার জেনেভার পেট শপ-এর এক মালিক এই করডোবা থেকে যে ২০টি পাখি কিনেছিল, সেগুলোই বহন করে নিয়ে গেছে ভয়াল রোগটির বীজাণু।

ভয়ংকর সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পাখিগুলির সংস্পর্শে এসে উক্ত মালিক সহ সাতজন মানুষ এরি মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে।

প্যারট ফিভারের বীজাণু বাতাসে ওড়ে। রুগ্ন পাখিদের থেকে সেগুলো হাওয়ায় ভেসে মানুষদের সংক্রামিত করে।

ডাঃ হেনরী নেস্টার, ইণ্ডিয়ানা পোলিস-এর পাবলিক হেলথ ডিরেক্টর জানালেন, পাখি এবং তাদের বিষ্ঠার সংস্পর্শে এসে মানুষেরা রোগাক্রান্ত হয়। তারা ফের সেই বীজাণু নিজ নিজ বাড়িতে বহন করে নিয়ে যায়। পরে বীজাণুগুলি কম্বল বা লেপের ধুলো বালিতে ছড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা নাকি এখনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি যে, এই সিটাকোসিস রোগ ভাইরাস দ্বারা হয়, নাকি মাইক্রোব দ্বারা হয়। ঘরের সেই ধুলো উড়ে উড়ে অনায়াসে যে কোন লোককে শয্যাশায়ী করতে পারে।

১৯২৯-৩০-এর সেই মহামারীতে মানুষজন এত বেশী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা প্যারটসমূহকে দেখা মাত্র গলাটিপে, গুলি করে, লাঠি মেরে খতম করে দিয়েছিল। ১৯২৯-এর নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই এ-রোগ আর্জেন্টিনা থেকে ডজনখানেক জার্মান নগরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘাতক রোগ এমন কি ওয়ারশ প্রাগ এবং ভিয়েনাতেও বধ করে ছেড়েছে।

১৯৩০-এর বসন্তকালের মধ্যে ইয়োরোপের কোন দেশই এ-রোগের করাল আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। প্রত্যেক স্থানেই পাখি আমদানী করা ও বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, আলজেরিয়া ও ঈজিপ্ট থেকে সংবাদ এল হাজার হাজার কেস্-এর কথা। যদিও সমস্ত রুগ্ন টিয়া চন্দনাদের কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে অথবা বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে কিন্তু তার আগেই বুঝি তারা ঐ ঐ দেশের স্থানীয় ঈগল, বাজপাখি, পায়রা, জাতীয় যাবতীয় পক্ষীকুলকে রোগ বীজাণু চালান করে দিয়ে গেছে।

তখনো অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে তদানিন্তন চিকিৎসকেরা অসহায়ের মত দেখেছে কি করুণভাবে নরনারীও শিশুরা এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে প্রচণ্ড শ্বাষ কষ্টে শেষ অবধি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করেছে দলে দলে।

১৯৩০-এর জানুয়ারী মাসে আমেরিকার তিনটি নগরীতে যথা ফিলাডেলফিয়া প্রভিডেন্স এবং ওয়ারেন্ট-এ একই সঙ্গে এ-রোগ যুগপৎ আক্রমণ করলো। স্টেট এবং ফেডারেল হেলথ কর্তৃপক্ষের নিচ্ছিদ্র সাবধানতা সত্ত্বেও এ-রোগের মহামারী হু হু করে ছড়িয়ে পড়লো। জুলাই-র মধ্যে ২০০ কেস্ রিপোর্ট হল এবং পনেরটি রাষ্ট্রে ৩৩ জনের মৃত্যু হল। সুদূর রাষ্ট্র হাওয়াই ও নিস্তার পেল না, অক্টোবরে জ্বর শুরু হয়ে কদিনের মধ্যে ৮ জনের প্রাণ নিল হনলুলুতে।

এমন কি ওয়াশিংটনের পাবলিক হেলথ সার্ভিস লেবরেটারির ১১ জন রিসার্চ ওয়ার্কার পর্যন্ত এ-জ্বরে আক্রান্ত হল। একজন মারা গেল।

ইডাহোর সেনেটর উইলিয়াম বোরার পত্নীর হল সিটাকোসিস। ওয়াশিংটনের বড় বড় ডাক্তাররা টেলিগ্রাফ এবং ট্রাঙ্ককলের মারফৎ চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এবং নিজেদের দেহ থেকে রক্ত দিয়ে সেই জীবনদায়িনী সিরাম সামরিক বিমানে পাঠিয়ে দিয়ে সেনেটর পত্নীর প্রাণ বাঁচালো।

পিটস্‌বার্গের এক স্টোর বন্ধ করে দেওয়া হল। কেননা তারাও কর‌ডোবার নিলাম উক্ত কিছু পাখি ক্রয় করেছিল। ফলে সাঁইত্রিশজন দোকান কর্মচারী প্যারট ফিভারে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। নজন মারা গেল।

সঠিকভাবে বলা দুষ্কর উক্ত মহামারীতে কতজন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েছিল বা মারা পড়েছিল, কেননা সিটাকোসিস আর নিউমোনিয়ার উপসর্গে এতবেশী মিল যে বহু ডাক্তার সম্ভবত তাদের ডেথ্ সার্টিফিকেটে নিউমোনিয়া বলেই উল্লেখ করে থাকবে। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৫০ জনের মৃত্যুর সরক রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

১৯৩০-এর পর পাবলিক হেলথ অফিসাররা সাধারণভাবে ধরে নিয়েছিল যে সিটাকোস রোগ শুধু মাত্র প্যারট (সিটাসাইন) জাতীয় পক্ষীকুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু ১৯৪৫-এর এপ্রিলে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকাল রিসার্চার প্রখ্যাত ডাক্তার কার্ল মেয়ার লংআইল্যাণ্ডের জনৈক ডাক্তারের কাছ থেকে একটি উদ্বেগপূর্ণ চিঠি পেলেন।

লংআইল্যাণ্ডের হাসপাতালে সেই ডাঃ পিটার্সন জানিয়েছে তার ওয়ার্ডে এই রোগ আক্রান্ত একজন লোক এসেছে। লোকটি স্থানীয় ডাক-ফার্মে (হাঁস পোলট্রি) কাজ করতো। ৪৪ বছরের এই মজুরটি প্রথমে সর্দি মাথাধরা এবং পরে প্রচণ্ড তলপেটে ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে। একস-রে-তে দেখা যায় ডান ফুসফুসের নিম্নাঞ্চলে প্যাড় ও স্থিতি।

এক সপ্তাহ বেড রেস্ট ও সালফাডায়াজিন দিয়ে চিকিৎসার পর সে ভাল হয়ে বাড়ি চলে যায়। তবুও সন্দিগ্ধ ডাঃ পিটার্সন লিখেছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটা ভাইরাস নিউমোনিয়ার কেস নয়। রোগীর দেহ থেকে তৃতীয় দিনে নেওয়া রক্তের স্যাম্পেল রয়েছে। সেটা কি আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব ? আমি চাই সেটা আপনি কমপ্লিমেন্ট-ফিকসেসান প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে বলে দিন এটা সিটাকোসিস কিনা। কেননা লোকটা হাঁসের ফার্মের জনমজুর ছিল। কে জানে হয়ত……।

প্যারট ফিভার সম্বন্ধে আমেরিকাস্থ অসাধারণ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মেয়ারও একই সন্দেহ পোষণ করলেন মনে মনে। তিনি প্যারট জাতীয়ের বাইরেকার পক্ষীকুল পায়রা এবং সীগাল পাখিদের দেহে এ-রোগের সংক্রমণ দেখেছেন। এখন ঐসব

পিকিন ডাকসমূহ যদি দেহভরা রোগ সঞ্চয় করে থাকে তাহলে তো অচিরেই ভীতিপ্রদ মহামারী দেখা দিতে পারে।

লং আইল্যাণ্ড থেকে রক্তের সেই স্যাম্পেল এসে গেল বিমানযোগে। ডাঃ পিটার্সন খুবই নার্ভাসভাবে দিনযাপন করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ কোন না কোন ডাক্-ফার্মে গিয়ে দেখতে লাগলেন হাজার হাজার হাঁস বাজারে ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এদের মধ্যে কিছু কি অসুস্থ? কত-সংখ্যক হতে পারে? এদের ডানায় ডানায় কি ছড়িয়ে রয়েছে সেই মারক সিটাকোসিস রোগ যা অনতিবিলম্বেই পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রতীরবর্তী বিভাগকে অসহনীয় কষ্টের রোগ ও মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তুলবে?

অবশেষে একসময় ডাঃ মেয়ারের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম এল তার কাছে:

Psittacosis Reaction Diagnostically Positive. Rush Sera from Sick duck.

(সিটাকোসিস রোগ পজিটিভ! অসুস্থ হাঁসদের ব্লাড-সেরাম পাঠাও)।

ডাঃ পিটার্সনের সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। সামনে বিশাল কাজ ও দায়িত্বের কথা ভেবে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। হাঁস চাষীরা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এবং সন্দিগ্ধ ধরনের মানুষ। একজন ডাক্তার গিয়ে তাদের ফার্মের কাছে ঘুর ঘুর করে সন্দেহজনক হাঁসদের থেকে সেরাম বার করে নেবার প্রস্তাবকে কিছুতেই ভাল চোখে দেখবে না।

যদি পাখিগুলি রুগ্ন হয়ে থাকে তাহলে স্টেট হেলথ কর্তৃপক্ষ ফার্মারদের অর্ডার দিয়ে হাজার হাজার হাঁসদের মেরে ফেলবার নির্দেশ দিতে পারে। এইভাবে কোর্টের অর্ডারে যদি পাখি মারতে হয় তাহলে এই চাষিদের সাংঘাতিক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

যে সময় ডাঃ পিটার্সন হাঁসদের দেহ থেকে রক্তের স্যাম্পেল বের করে নেবার জন্যে ফার্মারদের রাজি করাবার প্রচেষ্টায় ছিলেন, তারই মধ্যে ফার্ম মজুর আরও পাঁচজন এরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো।

স্টেট মহামারী বিশেষজ্ঞের একজন চলে এল ডাঃ পিটার্সনকে সাহায্য করতে। এই দু'জন চিকিৎসকেরই মনে ছিল সেই ১৯২৯-৩০ সালের প্যারট ফিভার মহামারীর কথা। এবারও কি শেষ পর্যন্ত তাই হবে নাকি? না কি তার চেয়েও আরো বেশি উত্তাল হবে?

দ্রুত আরও বারোটি কেস দেখা দিল। ওরা দুই চিকিৎসক লং আইল্যাণ্ডের বড় একটি ফার্মে ছুটে গেলেন। গিয়েই চমকে গেলেন। মোটা-সোটা গুণ্ডা ধরনের ফার্ম মালিক, দুটি করাল দর্শন কুকুর ও হাতে রাইফেল নিয়ে বন্ধ মেন গেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—না, স্যার, ওয়ারেন্ট ছাড়া আমার ফার্মে কাউকে আমি ঢুকতে দিতে রাজি নয়, কর্কশ চিৎকারে লোকটা বলে ওঠে, এই নির্বোধ কথা 'ডাক-ফিভার' 'ডাক-ফিভার' শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেটে পড়ুন। আমার অনেক কাজ আছে।

ডাক্তাররা হাল ছাড়লেন না। তাঁরা পরবর্তী আরেকটি ফার্মে চলে গেলেন। পুনরায় একই নাটকের পুনরাবৃত্তি—গেট আউট অফ হিয়ার! আমার হাঁসদের নিয়ে চ্যাংড়ামি করতে কাউকে দেব না। 'ডাক ফিভার' বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। এগুলো হল নিষ্কর্মা ব্যুরোক্রাটদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র।

ফার্ম পরিবারের মধ্যে চরম ক্রুদ্ধ উত্তেজনা দেখা দিল। কিছু হাঁস-চাষী হুঙ্কার করে বলে ওঠে, এইসব শয়তান ডাক্তারগুলোকে সর্বাঙ্গে আলকাতরা মাখিয়ে পালক সেঁটে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

ডাঃ পিটার্সন একজন পরম ধৈর্যশীল মানুষ। তিনি এবার গিয়ে স্থানীয় হাঁস-ফলন-অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। সবিনয়ে বললেন, আমরা আপনাদের উপকার করতেই এসেছি, ক্ষতি করতে নয়। মহামারীকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হয়ত আপনাদের কয়েকশ' পাখি হারাতে হবে, কিন্তু তার দ্বারা বহু লোকের প্রাণ রক্ষাও হবে। আর আপনারা যদি বাধা দেন একাজে, তাহলে রোগে কিংবা কোর্টের অর্ডারে হয়ত সমস্ত হাঁসদের হারাতে হবে আপনাদের। তাছাড়া ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষও মরে যাবে এ-কথা অনিবার্য। সেইটাই কি আপনি চান?

তাঁর ধৈর্য ও প্রচেষ্টা অবশেষে ফলবতী হল। একগুঁয়ে হাঁস-পোল্ট্রি মালিকরা নরম হল শেষপর্যন্ত। ১০ই আগস্টের মধ্যে প্রচুর পরিমান ডাক-সেরামের স্যাম্পেল সংগৃহীত হল। ১৩ই আগস্ট তারা ভ্রাম্যমান একটি শবব্যবচ্ছেদাগার খুলে মৃত পাখিদের অটোপসি চালিয়ে তাদের দেহের প্রধান প্রধান অংশসমূহ কালি-ফোর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন ডাঃ মেয়ারের কাছে।

সিটাকোসিসদের ভাইরাস বা ব্যাসিলিকে আইসোলেট করতে নিঃসীম ধৈর্য এবং সময়ের প্রয়োজন হয়। অক্টোবরে পাওয়া গেল ডাঃ মেয়ারের পরীক্ষার ফল। অসুস্থ পাখিদের মেরে ফেলা হল। বাকিদের কোয়ারেন্টাইন করা হল। হাঁস উৎপাদনকারী ফার্মে কঠোরভাবে স্যানিটারী সাবধানতা অবলম্বন করতে বাধ্য করা হল।

ক্রমে ক্রমে এভাবে মহামারী থেমে এল। তবু সাবধানতা অবলম্বনের কাজ এতটুকু শ্লথ হল না। সুযোগ-সুবিধা পেলে আবার এ-রোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগে এরোগের মারক ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে গেছে। ১৯২৯-৩০-এর পর সরকার এক আইন বলে বিদেশ থেকে টিয়া চন্দনা জাতীয়

পাখি আমদানী করার ব্যাপারে সাংঘাতিক কড়াকড়ি করেছে। কিন্তু ১৯৫২তে সিটাকোসিসকে আর মারাত্মক রোগ মনে না হওয়ায় বিদেশ থেকে পাখি আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। কেননা, পেনিসিলিন, অরিওমাইসিন এবং ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি ওয়াণ্ডার 'ড্রাগ' বেরিয়ে গেছে। এদের দ্বারা নিউমোনিয়া টাইপের প্যারট ফিভারকে অনায়াসে জয় করা সম্ভব। এ ছাড়া পাখি আমদানী-কারকরা প্রবল চাপ সৃষ্টি করলো তাদের প্রতিনিধি কংগ্রেসম্যানদের উপর, যাতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবার পুনরায় ঐ টিয়া চন্দনা জাতীয় পোষাপাখিদের ঐকান্তিকভাবে চাইছে তাদের গৃহের শোভাবর্ধন ও আনন্দবর্ধনের জন্য।

এর তিনমাসের মধ্যেই কিন্তু মিনেসোটা আর কানেকটিকাট থেকে ভীতিজনক সংবাদ এল। ওখানকার তিনটি পরিবার প্রবল জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়েছে, ডাক্তাররা যাকে সন্দেহ করছে সেই সিটাকোসিস বলে। প্রতিটি পরিবারই সাউথ আমেরিকা থেকে সম্প্রতি প্যারাকিটস্ পাখি কিনেছিল।

এর পর পরই এল আরেক দুঃসংবাদ স্বয়ং নিউইয়র্কের ওসিনিং থেকে। দু'জনের একটি পরিবার যাদের বাড়িতে তিন বছরের পুরনো একটি প্যারট ছিল, তার উপর ২রা এপ্রিল নিউইয়র্কের একটি পেট-শপ থেকে তাঁরা দুটি প্যারাকিট কেনেন। ৮ই মে বাড়ীর গিন্নী গৃহের কাজ করবার মুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তার জ্বর তখন ১০৩, কাঁপুনি এবং প্রচণ্ড কাশি। তিনি যখন এভাবে অসুস্থ, সাতদিনের মধ্যে ১৫ই তাঁর স্বামীও একই উপসর্গে শয্যাশায়ী হয়ে যান। তিনদিন বাদে তাঁদের ত্রয়োদশী কন্যা বলে ওঠে, আমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। শিগ্‌গির ডাক্তার ডাকো প্লিজ।

তাদের পুরনো টিয়াটি এর মধ্যে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ডানা দুটো ঝুলে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি কেমন উদ্ভট, সে কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করছে না। ২০শে মে পাখিটাকে খাঁচার মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্যারটের মৃত্যু, বাড়ির কর্তার মুমূর্ষু অবস্থা দেখে পারিবারিক ডাক্তার আতঙ্কিত হয়ে পাখি সম্বন্ধে তার সন্দেহের কথা স্থানীয় হেল্‌থ কর্তৃপক্ষকে জানালেন।

মৃত প্যারটটার শবব্যবচ্ছেদ করা হল। রায় ঃ সিটাকোসিস।

দু'চার জনের অসুখে তেমন ঘাবড়ালো না হেলথ অফিসাররা। তারা আমদানী করা পাখিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেও নিষেধাজ্ঞা জারির কথা ভাবলো না।

'ওয়াণ্ডার ড্রাগকে' ধন্যবাদ, তার প্রয়োগে কোন প্রাণহানি হল না, সবাই সেরে উঠলো ক্রমে ক্রমে।

তবে মাঝে মাঝে দেশের এখান-ওখান থেকে দু-চারটে এ রোগের সংবাদ আসতে লাগলো ঠিকই।

এরপর ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী পোর্টল্যাণ্ড হাসপাতালের একজন

উদ্বিগ্ন ডাক্তার ফোন করলো স্টেট বোর্ড অফ হেলথ অফিসে।

—আমার কাছে এক অদ্ভুত রোগী এসেছে। অদ্ভুত ধরনের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত সে। সহকর্মীরা বুঝতে পারেনি কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস এটি একটি সিটাকোসিস কেস।

৪১ বছর বয়স্ক জেরিটমলিনসন বহু দিন বেকার ছিল। থাকতো একটা চীপ হোটেলে। একবার কদিনের জন্য ৭০০০ পাখি সমন্বিত একটি ফার্মে অসুস্থ টার্কি পাখির পরিচর্যার কাজে লেগে যায়।

এক সকালে এই টেম্পোরারি কর্মী কাজে গরহাজির থাকে। ফার্মের লোকেরা তাকে তার শয্যায় প্রচণ্ড জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় এবং বাতাসের জন্য খাবি খাওয়া অবস্থায় পায়।

প্রচণ্ড কাশি সহ লোকটাকে পশুপাখীর হাসপাতালে নিয়ে বিরাট ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হয়।

সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক হেলথ অফিসারেরা উক্ত ফার্মে এসে কাজে লেগে যায়। তীব্র সার্চ লাইট জ্বালিয়ে মৃত ও অসুস্থ টার্কিদের দেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু করে। এরা যখন আসে ততক্ষণে এ ফার্মের ২০০০ টার্কি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এবারও রায়ঃ সিটাকোসিস। এই ফার্মের বহুলোক এদের সংস্পর্শে এসে রোগে জর্জর হয়ে পড়লো। কি আশ্চর্য 'প্যারট ফিভারে'র বীজাণু কিনা টার্কি পাখির মধ্যেও বাসা বাঁধলো!

পায়রা তো আগেই বাহক হয়েছিল। এক সময় শিকাগোতে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার পায়রা নিধন করা হল।

তবু এ-রোগকে সমূলে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। তবে আজ আর ভয় নেই। প্রাণহানি হয় না বললেই চলে। কারণ?

কারণ হল 'ওয়াণ্ডার ড্রাগে'র উপস্থিতি। অ্যান্টিবায়োটিক যাবতীয় মুস্কিলের আসান করে দিয়েছে আজকাল।

ইয়োরোপের শহর নগরের মধ্যে, জেনেভাই হল একমাত্র প্রাচীন শহর, যেখানে আভিজাত্যের প্রতি সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। ওখানকার সুখী সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবান নাগরিকগণ সদাসন্তুষ্ট জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। সেক্স অর্থাৎ যৌনবিষয়ক কোন কিছু যদি বা কদাচিৎ প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেক্স সংক্রান্ত অশোভন সবকিছুকেই এদের ভদ্র সম্ভ্রান্ত মানসিকতা কখনো বরদাস্ত করে না।

এ হেন রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সুইস নগরী জেনেভা সেদিন প্রকৃতই চমকে উঠলো, শক্ পেল, যেদিন সেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বসন্তকালে সেখানে এসে উদয় হল তথাকথিত "প্রফেসর" হোরেস ক্যাসপার বর্গ নামক এক ব্যক্তি। কেউ জানে না যে এই লোকটি মার্কিন দেশের প্রখ্যাত সিংসিং ও অপরাপর কম প্রখ্যাত কারাগারসমূহের প্রাক্তন একজন কয়েদী।

শুধু এল না, এসে এই "প্রফেসর" এই ভদ্র জনাকীর্ণ নাগরিকদের মধ্যে সেক্সকে তার লুকায়িত গুপ্ত স্থান থেকে টেনে বের করে এদেশের যাবতীয় সংবাদপত্রের শিরোনাম করে ছেড়ে দিল।

প্রফেসর বর্গ। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ, মুখে ভ্যানডাইক মার্কা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, ঈগলের মত তীক্ষ্ণ তীব্র অনুসন্ধানী দুটি চোখভরা দৃষ্টি। জোঁকের মত একজোড়া ভ্রূ। ডবল ব্রেস্ট বিজনেস স্যুট পরা এই লোকটিকে দেখলে একটি আস্ত শয়তান ছাড়া কিছু মনে হয় না।

অচিরেই এই মিঃ বর্গ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে, একথা জানিয়ে দিল যে, সে ৮নং প্লেস ডি বাগু'ইস-এ একটি অভিনব 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস'-এর অফিস খুলছে।

স্থানীয় সাংবাদিকরা বিস্মিত। এটা হবে কি ধরনের 'সার্ভিস'? বলছি বলছি, সবই খুলে বলছি মশাইরা। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মিঃ বর্গ বলে যায়, দেখুন, সেক্সই হল দুনিয়ার যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের মূল। তাই, আমার থিয়োরী হল, ভূয়া সতীত্ব, মিথ্যে লজ্জা সংকোচ, এবং প্রেম-প্রণয়-কামের প্রতি শিশুসুলভ মনোবৃত্তি অধিকাংশ নরনারীর জীবনকে বিফল করে তোলে, ফলে তারা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সর্বোপরি তারা প্রায় ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার জঘন্য প্রক্রিয়ায় মেতে উঠে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বলে প্রফেসর বর্গ বিরাট এক চুরুট ধরিয়ে প্রবলবেগে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিটিমিটি হাসতে থাকে সাংবাদিকদের পানে তাকিয়ে।

লজ্জায় কিছুটা আরক্ত, জনৈক মুখচোরা যুবক সাংবাদিক সসংকোচে বলে উঠে, মানে, মানে আপনি এই ব্যাপারটাকে অর্থাৎ এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন? এখানে প্রতিষ্ঠিত আপনার ক্লিনিক-এর উদ্দেশ্যই বা কি হবে?

মিষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হেসে 'প্রফেসর' বললে, আই অ্যাম গ্ল্যাড যে আপনি এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন। এখুনি আমি মিসেস ডরোথি ওয়েনরাইটকে এখানে উপস্থিত করাচ্ছি। তিনি আমার প্রথম রোগীনীদের অন্যতমাও বটেন। সেই সুখী তৃপ্ত ভদ্রমহিলাই আমার সুইজারল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে অর্থাৎ এক প্রদর্শন মাধ্যমে সব কিছু বিবৃত করবেন আপনাদের কাছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস ওয়েনরাইট এসে সে ঘরে প্রবেশ করল। বার্ন-এর এক তরুণ সাংবাদিক তো সহসা শিস্ দিয়েই উঠল মহিলাটির রূপ দর্শন করে। উপস্থিত প্রতিটি সাংবাদিকই ভদ্রমহিলার দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত এবং উদ্গ্রীব হয়ে পড়ল সন্দেহ নেই।

তরুণীর বয়েস সাতাশ আঠাশ। চোখের দৃষ্টি কখনো উদাস, মাদকতাময়, কখনো শূন্য, কখনো তীক্ষ্ণ সন্ধানী। নীল সিল্কের অত্যন্ত আঁটোসাটো গাউনে শারীরিক যাবতীয় আকর্ষণ যারপরনাই পরিস্ফুট হয়েছে যুবতী দেহের। কথা শুনে, গলার স্বর শুনে সাংবাদিকরা চমকে উঠলো। এ কণ্ঠস্বর যেন সারা দেহমনে সুড়সুড়ি দেয়। তবে কি কণ্ঠস্বরেও যৌন আকর্ষণ বিদ্যমান?

—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজ মিসেস ওয়েনরাইটকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। বহু ফ্রিজিড (কামশীতল) মহিলার মত ইনিও আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন উপযুক্ত মন্ত্রণা এবং চিকিৎসার জন্য। এই পোর্টফলিওর টাইপ করা তিরিশ পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমি ওর কেস্টাকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি। এটাতে পাবেন কিভাবে আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের প্রাণীজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ অহরহই লেগে থাকে। মাই ডিয়ার ওয়েনরাইট, এবার তুমি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বল!

অতঃপর সেই তরুণী দ্বিধাহীন ভাষায় সেই অতি ভদ্র সংযত সুইস সাংবাদিক-দের কাছে, সুনির্বাচিত ডাক্তারী শব্দ সহযোগে বর্ণনা করে যায় কিভাবে হোরেস বর্গ-এর সুচিকিৎসায় এক উদাসীন, বীতস্পৃহ, বিগতকাম তরুণী থেকে সে চঞ্চল যৌনোচ্ছলা কামনাবতী পূর্ণ যুবতীতে রূপান্তরিতা হয়ে গিয়েছে।

এরপর আরও এমন কিছু তথ্য বলে যায় তরুণী যাতে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখ চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। শুধু কথা নয়, অবশেষে 'প্রফেসর' হোরেস বর্গের সঙ্গে লালসাপ্লুত আলিঙ্গনাদির দৃশ্যাভিনয়ের দ্বারা সকলকে নিদারুণ বিব্রত করে তুললো এই মহিলাটি।

জনৈক সাংবাদিক আচমকা এক প্রশ্ন করে বসে যুবতীকে।

—আচ্ছা মিসেস ওয়েনরাইট, জানতে পারি কি আপনার স্বামী কোথায়?

অসংকোচে বলে গেল তরুণী, প্রফেসর বর্গের চিকিৎসার পর দেখা গেল আমার কাছে আমার স্বামী প্রকৃতই অনুপযোগী, অর্থাৎ অক্ষম। তাই স্যার, আমার শারীরিক জাগরণের রূপকার ওই মিঃ বর্গ-এর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি বিবাহ বিচ্ছেদ করে আমার স্বামী, আমার সন্তানাদি সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছি ওর কাছে। যাতে আমার মত যৌনতৃপ্তি অপরাপর ফ্রিজিড নারীরাও লাভ করে, সেই মহান কাজে ওকে সাহায্য করবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ৮৬ বৎসর বয়স্ক অ্যাডালবার্ট গ্রুবার-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অতি বৃদ্ধ পক্ককেশ ক্ষীণদৃষ্টি মানুষটি যখন এ কাহিনী বলছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন ৬০।৬৫ বছর আগেকার ঘটনা নয়, এই সেদিনকার ঘটনা এটা, সবই তাঁর চোখের সামনে ভাসছে যেন। বলতে বলতে হের গ্রুবার এখন লাল হয়ে উঠছিলেন।

—দেখুন, এর পর মহিলাটি সেদিন অঙ্গ থেকে অধিকাংশ পোষাক খুলে নিয়ে পরীক্ষা-টেবিলে শুয়ে পড়লেন। আমরা যেন ছাত্র, এমনিভাবে 'প্রফেসার' বর্গ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যৌনজীবনের উপর দেহ ও মনের প্রভাব এবং নরনারীর মিলন সংক্রান্ত অজস্র গোপন তথ্য উদাত্ত কণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করে গেলেন। ভদ্রমহিলাও বক্তৃতানুযায়ী প্রয়োজনানুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হেলন ও সঞ্চালনের দ্বারা 'প্রফেসার'-কে সাহায্য করে গেলেন।

বৃদ্ধ গ্রুবারকে প্রশ্ন করা হল, আচ্ছা হের, আপনি কি প্রফেসর বর্গের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছিলেন সেদিন?

বৃদ্ধের মুখ কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফোকলা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, তা স্যার, সেই তাজা তরুণ বয়সে একটু হয়েছিল বৈকি। পরস্ত্রীদের নিয়ে···। তবে ভদ্রলোকের শেষ পরিণাম দেখে উক্ত মনোভাব আমার নিভে গিয়েছিল। সে পরিণাম বড় ভয়াবহ। অবশ্য ওর ক্ষেত্রে ওই বুক কাঁপানো পরিণামই বুঝি সাধনোচিত ছিল।

আশ্চর্য মানুষ এই হোরেস বর্গ। সুদূর আমেরিকার দিকে দিকে হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো কাগজের নথিপত্রে ওর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কোর্ট কাছারিতে থানায় কারাগারের ফাইলে ফাইলে। বর্গ বিজ্ঞানী নয়, সে একজন প্রবঞ্চক মাত্র। কিন্তু ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল স্মৃতিশক্তি ও মেধা। কয়েকখানা ডাক্তারী বই ওর পাতার পর পাতা কণ্ঠস্থ ছিল।

সিংসিং জেলে প্রথম যায় "সাইকো-গাইরো বেল্ট কর্পোরেশন" নামক অস্তিত্বহীন ভুয়া এক কোম্পানির সৌজন্যে। এই কোম্পানির অলৌকিক "বেল্ট" পরিধান করে নাকি অজস্র ক্যানসার ও নিউমোনিয়া রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে—এই বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় ৪৫,০০০ ডলার মূল্যের তথাকথিত 'বেল্ট' বিক্রি করেছিল সে বিভিন্ন রাজ্যে।

এরপর শিকাগোতে সে সর্বপ্রথম 'ম্যারেজ কাউন্সেলিং সার্ভিস' খোলে। সে সময় থেকেই সে নারীদের কামশীতলতা এবং অপরাপর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করত। এর জন্য অবশ্য যে প্রকার দারুণ চাতুর্য আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তা এই বর্গ-এর ছিল। ওর চেহারা যদিও সুন্দর আদৌ ছিল না এবং কিছুটা নার্ভাস ধরনের মানুষও ছিল, তবু অদ্ভুত বাক্-চাতুর্যেই সে তার সুদর্শন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সদাসর্বদা হার মানিয়ে দিত। বিশেষ করে নারীদের ওপরে তার প্রভাব যেন সম্মোহক প্রভাবের কাজ করত। কিছুদিনের মধ্যেই স্বনির্বাচিত ও স্বনিয়োজিত মেডিসিন, সাইকোলজি এবং ভদ্রসমাজে অনুচ্চারিত নতুন শব্দ 'সেক্সোলজি'র ডাক্তার হয়ে বসলো সে। এবং অচিরেই নাম যশ অর্থ পসার সবই হু হু করে বেড়ে গেল।

এরপর নিজেকে 'প্রফেস'র রূপে অভিহিত করল বর্গ। জনৈক সুরা কোম্পানির মালিক ওটো কেলার-এর স্ত্রী ডরোথী কেলারকে চিকিৎসা করবার পরেই বর্গের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। উক্ত ৬৪ বৎসর বয়স্ক ওটো কেলার নাকি স্নায়বিক দুর্বলতা জাতীয় কি সব রোগে ভুগছিল, এ হল তার ২৮ বছর বয়স্কা ডরোথীর অভিযোগ। অপরদিকে বৃদ্ধ স্বামীর যুবতী স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনে ডরোথীর ছিল প্রবল অনীহা এবং সর্বোপরি চরম আতঙ্কজনিত এক ভীতিভাব।

ফলে, এই বর্গের অধীনে উক্ত ডরোথী কেলার এমন কয়েকটি পর্যায় ও প্রক্রিয়ায় চিকিৎসিত হতে লাগলো যে সম্পর্কে শহরের বিভিন্ন বার-এ ও বহু ড্রইংরুমে ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসাহাসি করে ফিসফিসিয়ে আলোচিত হতে লাগলো অনেক কথা। তিনমাস চিকিৎসান্তে নবজীবন ও নবযৌনজীবন ও যৌবন লাভ করে ডরোথী একদা গিয়ে উপস্থিত হল স্বামীর গৃহে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবার পরই পুনরায় বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি অব্যক্ত এক ঘৃণায় ডরোথী উৎসাহ উদ্দীপনা এক ফুঁয়ে নিভে গিয়ে সে পূর্বেকার মত ফের ফ্রিজিড ওয়াইফ-এ পরিণত হয়ে গেল। ডরোথীও বড় ঘরের মেয়ে, তার বাবা স্বনামধন্য এক ব্যবসায়ী সাইরাস ওয়েনরাইট। কি হল, সেদিন রাত্রে, ঘুমন্ত স্বামীকে ডরোথী এক ছুরিকা দিয়ে আক্রমণ করে মারাত্মক জখম করে ফেলল। হাসপাতালে নেবার পূর্বেই প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সুরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক প্রাণত্যাগ করল।

মানসিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে থাকাকালীন ডরোথী ওয়েনরাইট কেলার তার নার্সকে আচমকা আক্রমণ করে তাকে বেঁধে ফেলে। পরে নার্সের পোষাক পরে বাইরে এসে ২০,০০০ ডলার-এর চেক ক্যাশ করে তার নতুন প্রেমিক হোরেস বর্গ-এর সঙ্গে নিউইয়র্কের পথে রওনা হয়ে যায় চুপিসারে।

অবশেষে এই যুগল, ১৯০৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে উঠে ইয়োরোপের পথে পাড়ি জমায়।

এক মহাদেশ ছেড়ে আরেক মহাদেশে এল পরম প্রবঞ্চক একজন হাতুড়ে চিকিৎসক, সঙ্গে নিয়ে পরস্ত্রী-এক সহচরী। শেষের শুরু এখানেই। সুচতুর বর্গ বেছে নিল এমন একটি দেশ যে সুইজারল্যাণ্ড হল স্যানিটোরিয়াম, ক্লিনিক ইত্যাদিতে আকীর্ণ এবং যেখানে—সাধারণত আশ্রয় নেয় অসুখী একক নারীবৃন্দ! নিজেকে ডাক্তার বলে জাহির বা দাবি না করে বর্গ শুধু 'বিবাহিত নরনারীর উপদেষ্টা' হিসেবে জেনেভা নগরীতে সুইচ্ আইনকে কদলী প্রদর্শন করে এই অভি-নব ব্যবসা শুরু করে দিল।

কুমারী উপাধি 'ওয়েনরাইট' গ্রহণ করে ডরোথী মন্ত্রমুগ্ধার মত এই তথাকথিত 'প্রফেসারের' সঙ্গে একাত্মভাবে লেগে রইল। প্রেমিকা স্বেচ্ছায় ওকে ১৮,০০০ ডলার দিল অফিস খোলবার জন্য। বর্গ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দৃষ্টান্তসহ সব কিছু দেখিয়ে বক্তৃতা করে এই কথাই বুঝিয়ে দিল যে, সে যেকোন কামে বীতস্পৃহ কামশীতল রমণীকে তার অভিনব চিকিৎসার দ্বারা পুনরায় চঞ্চলা, কামনাবতী ও লালসাময়ীতে রূপান্তরিতা করতে সক্ষম। সেসব কথা ওখানকার সংবাদপত্রাদিতে ফলাও করে মুদ্রিত হল।

এই প্রচারের ফলে অজস্র চিঠিপত্র হু হু করে আসতে লাগলো বর্গের অফিসে। অধিকাংশ চিঠিই এল ইয়োরোপের ডজনখানেক দেশের মহিলাদের কাছ থেকে। তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে ডঃ বর্গের সুচিকিৎসায় পুনর্জীবিত করতে প্রয়াসী। কেন না তাদের মিলিত জীবন যৌন অসঙ্গতির চোরাবালিতে পড়ে ডুবে যাবার দাখিল হয়েছে। এসব পত্রের মধ্যে যে-গুলিতে বোঝা গেল লেখিকা ধনী নয়, অর্থাৎ প্রচুর কাঁচা পয়সার মালিক নয়, যেসব চিঠি সঙ্গে সঙ্গে বর্গ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

—এই চিঠিটা পড়ে দেখো ডরোথী, উল্লসিতভাবে ডাঃ বর্গ বলে, এটা এসেছে ওয়ারশ'র ম্যাডাম হেলগা মেরীউইকজ-এর কাছ থেকে। চিঠির কাগজ কি দামী দেখেছ? লিখেছে, ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি ও দেশের একজন বস্ত্রশিল্পী সম্রাট, নাম থ্যাডিয়াস মেরীউকজ। ভদ্রমহিলা এক্ষুণি আসতে প্রস্তুত আমার এ ক্লিনিক-এ। চিকিৎসার জন্য ইনি ৩০,০০০ জলটিস ব্যয় করতে প্রস্তুত। মাই গড।

সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব করে দেখলো উক্ত অর্থের পরিমাণ বর্তমান এক্সচেঞ্জ-এর রেট অনুযায়ী দাঁড়াবে প্রায় ৭,০০০ ডলার। প্রথম পেয়িং পেশেন্ট-এর পক্ষে আদৌ মন্দ নয়, কি বল?

ডরোথী তার প্রেমিকের পানে সেই দৃষ্টি নিয়ে তাকালো যা ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট অর্থাৎ কখনো ভাবলেশহীন কখনো ঈর্ষা সন্দেহ ঘৃণায় জীবন্ত, মুখে শুধু বললে, আশাকরি মহিলাটি কুৎসিৎ এবং বয়স্কা হবে হোরেস। কেননা তুমি কোন যুবতী নারী বিশেষ করে সুন্দরী রূপসীকে চিকিৎসা কর, এটা সম্পূর্ণ আমার না-পছন্দ। আমি সেকথা চিন্তাও করতে পারি না। বুঝলে ডার্লিং?

ম্যাডাম মেরীউইকজকে দেখা গেল বেশ তন্বী চেহারার অভিজাত, উচ্চবংশীয়া এবং প্রচুর ধনী জনৈকা পোলিশ ভদ্রমহিলা। বাদামী চুল, গালের হাড় কিছু উঁচু। বয়সে ২৪ বছর। এক সন্তানের জননী। বর্গ-এর তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নে ভদ্রমহিলা লজ্জায় সংকোচে যারপরনাই বিব্রত বোধ করছিল। বর্গ তার প্রাইভেট চেম্বারে সংগোপনেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন।

—থ্যাডিয়াস, যদিও অধিকাংশ সময় তাঁর ঘোড়া, রেস এবং ক্লাব নিয়ে রাত কাটায়, তবুও তাকে আদর্শ ও ভাল স্বামীই বলব। কিন্তু রাত্রে যখন বিছানায় সে আমার সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে, বিশ্বাস করুন, আমি—আমি সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করি, মানে বিতৃষ্ণায় শারীরিক প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ি বলা যায়। একবার সে আমাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি, তাতে থ্যাডিয়াস দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। আরেকবার আমি তার চুম্বন সহ্য করতে না পেরে বথরুমে পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। প্লিজ, মিঃ বর্গ, আমায় আপনি বাঁচান, এ রকম চললে আমাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। অথচ আমার মনে হয়, আমি তো আমার স্বামীকে সত্যিই ভালবাসি, তাহলে, সে যখন আমায় কামনা করে কাছে আসে, তখন কেন আমি ওরকম জঘন্য খারাপ ব্যবহার করি!

যদিও সে মোটেই ডাক্তার নয় তবু বর্গ মেডিসিন ও সাইকোলজি বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে রেখেছিল। ফ্রয়েড তার কণ্ঠস্থ। এসব শুনে সে বাঁ হাত দাড়িতে স্থাপন করে আঙুলের টোকা দিল আর অভিব্যক্তিতে আনলো একটা গুরুগম্ভীর প্রফেসনাল্ পোজ, বললে,—মাই ডিয়ার লেডি। একে আমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলে আনরিজল্ভ্ ট্রান্সফারেন্স। মানে আপনার মনের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আপনার হতভাগ্য স্বামী ছাড়া অপর কোন এক ব্যক্তির প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা, যাকে আপনি আদৌ দেখতে পারতেন না, পছন্দ করতেন না।

এইভাবে শুরু করে কঠিন কঠিন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কঠিন সব বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যা মহিলার কাছে দুর্বোধ্য, অনেক কিছু বলে অবশেষে আশ্বাস দিয়ে বর্গ জানালো, মাভৈঃ, হতাশার কিছু নেই, নিরাময়ের পথ এখনো খোলা আছে; এখনো ভয়াবহ মানসিক কোন ক্ষতি হয়ে যায়নি।

ভদ্রমহিলা এতসব গূঢ়তত্ত্ব শুনে প্রায় বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। পরে সানুনয় কণ্ঠে বললে,—তাহলে এখনো আশা আছে বলছেন? প্লিজ, তাহলে আমায় সাহায্য করুন। যা বলবেন তাই করতে রাজী আমি।

শেয়ালের মত মুখাকৃতি বর্গের মুখে এক অবৈধ হাসি সঞ্চারিত হল, সে উঠে গিয়ে চেম্বারের দরজা নিঃশব্দে লক্ করে দিল। তারপর পোলিশ ভদ্রমহিলা কিছু বুঝে ওঠবার পূর্বেই দেখা গেল সে এই ডাঃ বর্গের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শেটির ওপর শায়িত হয়ে গিয়েছে। ভেতরে যখন এই আজব চিকিৎসা সুরু হল, বাইরে তখন অধৈর্যভাবে পায়চারিরতা ডরোথীর পক্ষে ভেতরের কোন

কিছু শ্রবণ বা দর্শন করে গুপ্তচরবৃত্তি করবার উপায় রইল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, ম্যাডাম মেরীউইকজ এই অবৈধ চিকিৎসায় সত্যি সত্যি পরম তৃপ্তি লাভ করল। মুখ ফুটে বলেই ফেললো, ওয়াণ্ডারফুল আপনি ডাঃ বর্গ। অশেষ ধন্যবাদ। আমি কত বছর পর যে শান্তি পেলাম, তা আর কি বলব। প্লিজ, আমায় আপনার ক্লিনিক-এ থাকতে দিন। আমার কত কিছু এখানে শেখবার আছে।

—বেশ ম্যাডাম, আপনাকে আমি পেশেণ্ট করে নিলাম, বর্গ প্রফেশনাল পোজ বজায় রেখে জবাব দেয়, যখন চিকিৎসান্তে ফিরে যাবেন, আমি নিশ্চিত যে আপনার স্বামী খুব খুশী হবেন কামনাবাসনাবতী একজন স্ত্রীকে নবরূপে পেয়ে। আমি আমার প্রাথমিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ার দ্বারা এ প্রমাণ আপনাকে দিয়েছি যে, আপনি মূলতঃ ঠিকই আছেন, নারীত্বের এতটুকু অভাব আপনার মধ্যে নেই, চমৎকার সুস্থ ও ভোগবতী মহিলা। তবে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করছে সাফল্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা এবং ততদিন আমাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহৎ স্বার্থে আপনার স্বামীর স্থান সাময়িকভাবে অধিকার করে তাঁরই বকলমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এসব চিকিৎসা অবশ্য সময়সাপেক্ষ।

—বেশ তো আপনার যত খুশী প্রয়োজন সময় নিন। আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি আমার ভাল লেগেছে, বলে ম্যাডাম মেরীউইকজ তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক বুক বের করে লডজ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ওপর এক বিরাট অঙ্কের চেকে সই করে দিল।

মনে মনে বুঝি প্রফেসর বর্গ কামনা করল যে, তার প্রাক্তন জেল-বন্ধুরা এসে দেখে যাক. বুদ্ধিবলে সে কি অসাধ্য সাধন করে চলেছে। দুনিয়ার রূপবতী ধনী যুবতী মেয়েদের ভোগ করছে এবং সেই বাবদে উল্টে তাদের কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক দক্ষিণাও আদায় করছে সে। একেই বলে বুঝি ভেলকিবাজি।

জেনেভাস্থ এই ম্যারেজ ক্লিনিকে সব সুদ্ধ চৌদ্দখানা ঘর ছিল। এর আটটি ব্যবহৃত হত তথাকথিত মহিলা পেশেণ্টদের শোবার ঘর হিসেবে, যারা এসে এই "ইনস্টিটিউট ফর ম্যারিটাল রিসার্চে" নাম লেখাত। রাঁধুনেসহ চারজন কর্মচারী ছিল। ক্রমে দেখা গেল এতে কুলোচ্ছে না। বর্গের উচ্চাশা হল এমন এক ম্যানসন ভাড়া করার, যেখানে অন্ততঃ চল্লিশজন আবাসিক মহিলা রোগী থাকতে পারে।

বছর খানেকের মধ্যেই বর্গ বুঝতে পারলো যে, সে একটি স্বর্ণখনির সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা তাকে কাম-শীতলতাগ্রস্ত রোগিণীদের ব্যাপারে রিসার্চ চালাবার অজুহাতে প্রচুর নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করবার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে ১৩০,০০০ স্বর্ণ ফ্র্যাঙ্ক-এ দাঁড় করিয়েছে।

মাঝে মাঝে ঈর্ষাপরায়ণ ডরোথী যে না ক্ষেপে গেছে এমন নয়। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ বস্ফোরণে সে ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছে এই বলে যে, ফের বর্গ যদি মহিলা

রোগিণীদের গাত্র স্পর্শ করে তো তাকে কিন্তু সে ভয়ংকর ও সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিন্তু বর্গও ছলাকলা বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ। প্রথমে কথায়, পরে কার্য-প্রণালীতে প্রগাঢ় প্রণয়ের অভিনয়ে তার পক্ষে স্বামিত্যাগিনী ডরোথীকে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তিদানান্তে শান্ত করতে বেশী সময় লাগত না।

পরের জুন মাসে বর্গ তার ক্লিনিককে চ্যাটো ব্রিগুলিয়ারস্থ ৪০ কামরার এক প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এল। নীল জল রোন নদীর সামনে অবস্থিত এই প্রাসাদ থেকে নীচে চতুর্দিকের জেনেভা শহর যেন ছবির মত মনে হত। এখানে থেকে তুষারশুভ্র মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও তাদের দুটি খ্যাত শীর্ষ চমৎকার দেখা যেত।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিধি বাম। ঝামেলার শুরু হল হেলইস স্প্যাগনোস নামক ২৭ বছরের এক মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এ মহিলাটি এথেন্স-এর প্রধান জাহাজ-ব্যবসায়ীর স্ত্রী। আঁটোসাটো গড়নের পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এই মহিলাকে আর যাইহোক 'ফ্রিজিড' বলে আদপেই মনে হয় না। তবে কেন এখানে এসেছে? চোখে-মুখে ক্লান্তি, বোঝা যায় মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা চরম অশান্তি প্রবহমান। অথচ দৃষ্টি বা হাবভাবে তাকে পূর্ণ লালসাময়ী রমণী বলেই মনে হচ্ছে।

বর্গ উৎকর্ণ হল শোনাবার জন্য উক্ত মহিলার কাহিনী :

—আমার স্বামী এল্যুথেরিস যদিও আজগুবী রকমের ধনী কিন্তু সে একজন অতি স্থূল রুচিসম্পন্ন মানুষ। কোটি কোটি ডলারের মালিক, উপরন্তু তার রয়েছে তিরিশটির ওপর জাহাজ। আমার ওই স্বামীটি নিদারুণ ঈর্ষাপরায়ণ। আমি যদি তার দেহজ প্রেম-প্রণয়ে সাড়া না দিই তবে সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু জানেন প্রফেসর, আমার এই স্বামীটির দেহে কি বিচ্ছিরি ছাগলের বোটকা গন্ধ। লোকটা বিছানায় শুয়ে হাঁসের কাঁচা ডিম ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। সে কামোন্মত্ত লোমশ দেহ নিয়ে যখন আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন তাকে মনে হয় কোন বিশালকায় লোমশ গরিলা বিশেষ। ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে যাই। অবশ্য ডাইভোর্সের কথা অচিন্ত্যনীয়। তাহলে আমার নিজের পরিবারই আমাকে পরিত্যাগ করবে, ত্যাজ্য করে দেবে। প্লিজ, প্রফেসর আমায় বলে দিন কিভাবে আমি আমার স্বামীর কাছে স্বাভাবিক প্রেমবতী স্ত্রী হতে পারব?

ইতিমধ্যেই প্রফেসর বর্গ তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করেছে যারা ক্লিনিকে আসা মহিলাদের তথাকথিত "চিকিৎসা"য় তাকে সাহায্য করে থাকে।

একজনের নাম রাওল স্টি সির, লোকটির ওজন আজগুবী ধরনের, সে একজন টেনিস স্টার। প্যারিসে থাকতে লোকটা নাকি কুখ্যাত পল্লীর পালোয়ানরূপে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, হেন্ডরিক লুবেব, আমস্টারডামে এককালে লঞ্চে স্টিমারে কাজ করত। ভ্রাম্যমান মেলায় মেলায় মাংসপেশী সঞ্চালন দেখিয়ে ফিরত এই ব্যায়ামবীর মানুষটি। তৃতীয় জনের নাম লুইস ওয়ার্নার, ক্ষীণদেহী

একজন ইংরেজ সে। স্মাগলিং-এর অভিযোগে ডার্টমুর-এ একবার জেল খেটেছিল লোকটি।

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজযোটক বুঝি। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। অর্থাৎ এই গ্রীক রমণী বোধ করি নিঃসীম কামাচারী বর্গ-এর উপযুক্ত দোসর, যোগ্য সঙ্গিনী। কিন্তু কার্যকালে সমুৎপন্নে দেখা গেল সীমাহীন কামনা বাসনার অধিকারিণী এই হেলইস স্প্যাগনোস নামক নারীটিকে তৃপ্তিদান করা বর্গের অসাধ্য। দুঃখের সঙ্গে সে তার এই নতুন পেশেন্টকে ওলন্দাজ লুব্বার হাতে ফেলে রাখলো তিন দিন তিন রাত।

চতুর্থ দিন লুব্বা রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত কম্পিত দেহে বেরিয়ে এসে বর্গকে নিবেদন করল, মাইনহিয়ার, ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক। আমায় ক্ষমা করবেন। ওকে বরং ফরাসী-দাদার দ্বারা 'চিকিৎসা' করান।

সেও চতুর্থ দিনের শেষে হাউমাউ করে এসে নিবেদন করল, মন্-ডিউ! মাফ করুন প্রফেসর। এ ধরনের দ্বিতীয় পেশেন্ট আমার কাছে পাঠালে আমি এ চাকরি ছেড়ে চলে যাব। অকালে প্রাণে মারা পড়ব নাকি স্যার!

ম্যাডাম স্প্যাগনোস নগদ ৪০,০০০ ড্র্যাস্‌মাস্ দিয়েছে এ ক্লিনিকে ভর্তি ও চিকিৎসিত হবার জন্যে। এটা প্রায় ৮০০০ ডলারের মত। বর্গ বেশ ভড়কে গেল। তার ভুয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং চার চারজন পুরুষ-পুঙ্গবদের সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে এই গ্রীক ভদ্রমহিলার কাছে। গ্রীক কন্যাটি যদিও নিজ স্বামীর কাছে 'কামশীতল' বনে যায়, আসলে সে একজন পরিপূর্ণ নিম্‌ফোম্যানিয়াক। এরপর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী শীর্ণকায় সেই ইংরেজ ওয়ার্নারও বিফল হয়ে হার মেনে অধোবদনে সরে এল ম্যাডাম স্প্যাগনোস-এর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

—আপনারা সবাই এখানে জঘন্য প্রবঞ্চক, গ্রীক ভদ্রমহিলা এবার পরম ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জে উঠলো, আমি আমার স্বামীকে জানাচ্ছি আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে। এলিওথেরিস জানে কিভাবে আপনার মত চোরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আমার প্রচুর অর্থ খেয়েছেন, পরিবর্তে আপনি ও আপনার ঐ ছোটলোক গুণ্ডা হাড়হাভাতে সহকারীরা আমার এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি।

একজন পরিচারিকাকে ঘুষ দিয়ে মহিলা এথেন্স-এ তার স্বামীর কাছে তার পাঠালো। একথা বর্গ অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। পরবর্তী রোববার সকালে দেখা গেল ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ী এসে প্রবেশ করল চ্যাটো ব্রিগুলিয়ার চত্বরে। তা থেকে নেমে এল গাট্টাগোট্টা শক্ত মাংসপেশীওয়ালা বুলডগের মত মুখাকৃতি একজন ভদ্রলোক। যদিও পরনে ছিল তার খুবই অভিজাত ও মূল্যবান পোষাক, তবু জামার ফাঁকে, কলারের পাশ দিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ চুল বেরিয়ে থাকায়, তাকে মানুষের চেয়ে গরিলার মতই দেখাচ্ছিল সমধিক।

আগন্তুক এসেই বাজখাই কণ্ঠে বিদেশী ·টানে জানতে চাইল সংস্থার মালিক কে ?

এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটির সামনে এক সময় এসে দাঁড়ালো প্রফেসর বর্গ কিঞ্চিৎ নার্ভাস অবস্থায়, বললে, আমিই হলাম স্বত্বাধিকারী স্যার। আমার নাম বর্গ। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ ?

—আমার নাম এলিউথেরিয়স স্প্যাগনোস। তুমি হলে একজন হতচ্ছাড়া জুয়াচোর। আমি এথেন্স থেকে চলে এসেছি আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কিন্তু তার আগে প্রথমে আমি তোমায় এমন কিছু দিয়ে যেতে চাই যাতে আজীবন আমাকে তোমার স্মরণে থাকে।

এই বলে গ্রীক জাহাজ-মালিক তার ডান হাতের বজ্রমুষ্টি বর্গের নাকের কাছে হুঁশিয়ারী ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলো। আঙুলের গাঁটে গাঁটে তীক্ষ্ণধার সূচাগ্র পেতলের তৈরি বোতাম লাগানো। সেই শূকরের মত হাতটি প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানলো বর্গের গালে। হাতুড়ে বর্গ সে আঘাতে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়তে, তার মাথায় পেছনে হাতুড়ির মত ক্রমাগত আঘাত করে গেল গ্রীক বণিক। এর পর আধা অজ্ঞান বর্গের দেহটাকে ফুটবলের মত ড্রিবল করতে থাকল সে।

তিনজন সহকারী প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে হোরেসবর্গ-এর রক্তাপ্লুত দারুণ আহত দেহটাকে অগ্নিশর্মা দানব গ্রীক স্বামীর হাত থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হল।

স্প্যাগনোস্ সরাসরি স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লিনিক ত্যাগ করে চোখের আড়ালে চলে গেল।

উপরতলার এক গবাক্ষপথে জালি পর্দার আড়াল থেকে ডরোথী ওয়েনরাইট উঁকি মেরে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। দেখে শুনে সে যেন খুবই খুশী হল, আনন্দিত হল। ক্লিনিকের কর্মীরা যখন প্রফেসর বর্গের আঘাতস্থল ও রক্তাক্ত স্থানগুলিকে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিল সে সময় ডরোথীর মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি, যার অর্থ হল, বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমন ফল।

এই গুরুতর ও লজ্জাজনক প্রহারের ধকল থেকে সেরে উঠতে বর্গ-এর প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগলো। তবে সে দমে যাবার বাচ্চা নয়, সেরে উঠে ফের পূর্ণোদ্যমে পেশেন্টদের নিয়ে চিকিৎসা কর্মে লেগে গেল।

এরপর এল এক চরম সাফল্য। সাফল্য এল এক নতুন পেশেন্টরূপে। পেরু-দেশীয় প্রখ্যাত টিন ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারিণী এই বিবাহিতা মেয়েটির নাম ডলরেস সিমকো। বর্গ প্রমাণ করে দিল যে, তরুণীটি আদৌ 'কামশীতল' নারী নয়, যা সে নিজে ও তার স্বামী ভেবে নিয়েছিল এতকাল।

একদিন যখন বর্গ গল্‌ফ খেলার নিকার-বোকার পরে, মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয় বিষয়ে আলোচনা করছিল, তখন দেখা গেল ডলসের যেন কেমন উত্তেজিত

হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে এসে গেছে এক চাপা চঞ্চলতা, তার মুখাবয়ব রক্তাভ হয়ে উঠেছে লাজুক লাজুক ভাবে। চতুর বর্গের মনে চট করে এক সন্দেহ এল। সে ফ্রয়েডের শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সে সাইকোঅ্যানালেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেয়েটির গুপ্তকথা বের করে নিল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

মেয়েটি সসংকোচে স্বীকার করল, যখন তার পনের বছর বয়েস, তখন তার পিতার গলফের পার্টনার এক ভদ্রলোক তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে তোলে নিকটবর্তী গ্রীন হাউসে। লোকটার পরনে ছিল তখন নিকারবোকার। সে দিনের সেই স্মৃতি কেশোরী মেয়েটির কাছে খুবই রোমাঞ্চকর, জীবনের প্রথম যৌনসংযোগের সুখ-স্মৃতি সে আজও ভোলেনি। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে ঘটনাকে অবচেতনের গভীরে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতকাল।

বর্গ এর পর নিজে ও সহকারীদের দিয়ে নিকারবোকার পোষাক মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের বাস্তব অভিনয় করিয়ে চরম সাফল্য লাভ করেছে। অতঃপর সে মেয়েটির স্বামীর কাছে এক পত্রযোগে জানিয়েছে ঃ

প্রিয় সেনর,

সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয় অনিবার্য কারণে, তবু বলছি আপনার স্ত্রী খুবই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী যৌবনবতী রসিকা এক মহিলা। প্রশ্ন করবেন না, আমার অনুরোধ, এরপর আপনি নাইট শার্টের পরিবর্তে নিকার-বোকার পরিধান করে স্ত্রী মিলনে যাবেন এবং দেখবেন আর কোন বাধা নেই বিপত্তি নেই, নেই কোন হতাশা, অচিরে স্বর্গীয় আনন্দে অবশ্যই বিভোর হয়ে যাবেন দুজনে।

স্বামী ছেলেটি বর্গের কথা রেখে অতীব সুফল পেয়ে এতই আনন্দিত হল যে অবিলম্বে হোরেস বর্গ-এর নামে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ২০,০০০ ডলারের এক চেক লিখে পাঠিয়ে দিল। সে বিপুল অর্থ পেয়ে বর্গ এর চেয়েও বড় এক প্রাসাদে তুলে নিয়ে গেল তার ক্লিনিক।

কিন্তু নেভবার আগেই বুঝি প্রদীপ শিখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই বৃত্তান্ত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। প্রফেসর বর্গ তার সুযোগ্য সহকারী তিনজনকে ডেকে সংগোপনে জানালো ডরোথী ওয়েনরাইট-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

—জানো এই স্ত্রীলোকটি একধারে ভয়াবহ এবং অসহ্য। এক সময় ও আমার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল ঠিকই। কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমশঃ এ মহিলা তার বিদিকিচ্ছিরি ঈর্ষাপরায়ণ মনের দ্বারা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জানো, কত বড় আস্পর্ধা, ও আমার পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ছে, ক্লিনিকের সমস্ত মহিলা পেশেন্টদের অযথা অপমান করে চলেছে। ডরোথী আমেরিকা ফিরে যেতে নারাজ, পরিবর্তে আমার ঘাড়ে বসে আমার জীবনকে সে অতিষ্ঠ করে তোলবার পণ করছে।

—প্রফেসার, আমাদের কি করতে বলেন ওকে নিয়ে ?

—বলছি শোন। মার্সেলিস বন্দরে এস. এ. ট্রিয়েস্ট্রি নামে একটি ৭০০০ টনের ছোট জাহাজ নোঙর করে আছে। তার ক্যাপ্টেন আমার জানাশোনা লোক। ৫ই নভেম্বর সে জাহাজ রিও ডি. জেনেরো যাত্রা করবে কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে। আমি স্কিপারকে অর্থ দিয়ে রাজী করিয়েছি এই অনিচ্ছুক মহিলা ডরোথীকে যাত্রীরূপে সে জাহাজে নেবে। ব্রেজিলে স্কিপার সহজেই ডরোথীকে যে কোন গণিকালয়ের মালিকের কাছে বেচে দিতে পারবে ভাল অর্থের বিনিময়ে।

এই বলে বর্গ তার অভিনব পরিকল্পনার কথা ওদের বুঝিয়ে বলল, কিভাবে স্মগল্ করে নিয়ে জাহাজে তোলা হবে। তারপর সে বন্দিনী অবস্থায় কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার হয়ে বন্দরস্থ গণিকা ব'নে গিয়ে দেশবিদেশের নাবিকদের মনোরঞ্জন করে ইহজীবন কাটাতে বাধ্য হবে।

নভেম্বরের তিন তারিখে বর্গ ও ডরোথী মার্সেলিস বন্দরে পৌঁছে হোটেল ভিক্টর হুগোতে স্বামী-স্ত্রীরূপে নাম লিখিয়ে উঠল। ডরোথীকে বর্গ বলেছে জাহাজের এক ব্যবসায়ে কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে সে তাকে এই বন্দর নগরে এনেছে, এ ব্যাপারে তার পরামর্শও সে চায়। খুশী করবার জন্য বর্গ মহিলাটিকে একটা নীল রঙের কোট কিনে দিল।

সে রাতে বর্গের দিক থেকে প্রণয় সোহাগ যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমই হল। এক সময় ক্লান্ত ডরোথী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। বর্গের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ত্রস্তে সে উঠে ক্লোরোফর্ম ভেজানো একটি রুমাল চেপে ধরলো ডরোথীর নাকে। প্রথমটা প্রবল ঝটাপটি করলেও শেষে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। বর্গ এবার উঠে গিয়ে খিড়কির জানালাপথে রাস্তায় দাঁড়ানো দু'জন সহকারীকে টর্চ জ্বেলে ইশারা করল।

মিনিটখানেক বাদে ফায়ার এস্‌কেপ দিয়ে দু'জন লোক সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল। ওলন্দাজ লুব্বে রাস্তায় রইল পাহারায়, যদি কোন জেণ্ডারমে (পুলিশ) বা হোটেলকর্মী সামনে এসে যায় তো সে পূর্বাহ্লেই হুঁশিয়ারী করে দেবে। ফরাসী ও ইংরেজ দুইজন অচৈতন্য ডরোথীকে একটা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথে নেমে গিয়ে দণ্ডায়মান একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল।

স্বস্তির প্রবল নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বর্গ-এর বুক থেকে। উঃ কি শান্তি, বাঁচা গেল। নচ্ছার মেয়েমানুষটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল অবশেষে। হোটেল ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিল সে। ঘর থেকে ক্লোরোফর্মের গন্ধ যাতে চলে যায়। তারপর আরাম করে দেহ এলিয়ে দিল দুগ্ধফেননিভ বিছানায়। সে নতুন নতুন মহিলা রোগীর আগমন, অজস্র অর্থোপার্জন প্রভৃতির সুখচিন্তায়

বিভোর হয়ে গেল। যাক ঐ পথের কাঁটা ডরোথীটাকে তো সরানো গেছে, আপদ চুকেছে। এবার প্রাণভরে স্ফূর্তি করা যাবে।

চোখে বুঝি তন্দ্রা নেমেছিল। শেষ রাত প্রায় পাঁচটা। বর্গের তন্দ্রা সহসা ভেঙ্গে গেল। আধা নিদ্রা আধা জাগরণে মনে হল যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ঘরে। কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে।

—কে! বর্গ ভাবলো সহকারীরা বোধহয় ফিরে এসেছে এই সংবাদ নিয়ে যে ডরোথীকে তারা বন্দিনী অবস্থায় ট্রিয়েস্টি জাহাজের কেবিনে তালা বন্ধ অবস্থায় রেখে এসেছে।

এমন সময় গলার মাঝখানে তীক্ষ্ণ একটা ধাতব ছোঁয়াচ লাগতেই বর্গ সহসা জেগে গেল। নিদারুণ আতঙ্কে তার জিভ শুকিয়ে গেল। শেষ রাতের আবছা আলোয় দেখলো একটা মানবমূর্তি তার ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে। চোখ থিঁতোতে দেখলো সেই ছায়ামূর্তির অঙ্গে নীল রঙের একটা কোট। এতো মানব নয়, এযে এক মানবী। স্ত্রীলোকটি হাতের ছুরিটাকে আরো একটু চাপ দিতে মৃত্যুভয়ে দিশেহারা বর্গ মাথাটাকে আরেকটুকু ঠেলে তোষকের মধ্যে পেছন দিকে ডুবিয়ে দেবার চেস্টা করল।

সর্বনাশ! বর্গের এবার নজরে পড়লো, এযে আর কেউ নয়, এযে স্বয়ং ডরোথী ওয়েনরাইট! অ্যাঁ…তুমি…!

—আমার কয়েক বছর আগেই তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল, ভয়াবহ কণ্ঠে ডরোথী হিসহিস করে বলে ওঠে, ঐ নির্বোধ গুণ্ডাগুলি আমাকে ভুল এক জাহাজে নিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফেলে এসেছিল। ক্যাপ্টেন জেণ্ডারমে (পুলিশ) ডাকে, আর তারাই আমাকে এ হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এখন আমি দেখতে চাই তুমি মর, বুঝলে শয়তান হোরেস।

এরপর বর্গ বৃথাই প্রাণভিক্ষার জন্য করুণভাবে আকুলিবিকুলি করল কিন্তু তার কথাগুলি ভালভাবে বোঝা গেল না, কারণ তখন তীক্ষ্ণধার ছুরিকাটি তার কণ্ঠের তাজা রক্তপান করতে শুরু করেছে। অবশেষে পুরুষটির বিরক্তিকর আর্তস্বরে ক্লান্ত হয়ে ডরোথী ছুরিকাটিকে সমূলে ঢুকিয়ে দিল বর্গের গলায়। ছুরি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বালিশে গিয়ে বিঁধলো। ফিনকি-দেওয়া রক্তে বালিশ বিছানা লাল হয়ে গেল।

সকাল আটটার সময় হোটেল পরিচারিকা এসে দেখলো মৃত হোরেস বর্গের পাশে রক্তাক্ত বিছানায় এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিল বিছানার চাদরটা বুঝি লাল রঙে ছোপানো, পরে যখন বুঝলো ওটা রক্ত, তখন সে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল।…

ডরোথী অতি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, এই নির্বোধ মেয়েটা! অমন করে চাবার কি আছে? এটা একটা মৃত ব্যক্তি। হোরেস কামশীতল মেয়েদের

চিকিৎসা করছিল…এবং তাতে বেশ আনন্দলাভই করছিল কয়েক বছর ধরে। এখন সে নিজেই পরিপূর্ণ শীতলকাম ব'নে গেছে আর আমি এখন খুবই আনন্দলাভ করছি।

বলে হো হো করে বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো প্রতিহিংসাপরায়ণা একদা চরম লালসাময়ী নারী ডরোথী ওয়েনরাইট।

দেখে শুনে ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল পরিচারিকা সেই মৃতের ঘর থেকে।

৯

॥ যে মানুষটি আমাদের মনের পরিবর্তন এনেছিল ॥

একটি রূপসী তরুণী ভিয়েনা শহরের ছোট এক রাস্তায় অবস্থিত একটি বাড়ির সামনে এসে ক্ষণেক দাঁড়ালো, অতঃপর দ্রুতপায়ে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলো ডাক্তারের চেম্বারে। এখানে আসা তার আজই প্রথম নয়। চেয়ারে-বসা নাতিবৃহৎ আকৃতির ডাক্তার তার ফ্যাকাশে ও কালো দাড়ি সমন্বিত মুখ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহকারে শুনে গেল তরুণীটির অদ্ভুত কাহিনী। মেয়েটির মুখের ডান পাশে নাকি নিদারুণ বেদনার উদ্ভব হয়েছে কিছুকাল ধরে। অসহ্য সে ব্যথায় তার চামড়া এমন স্পর্শ কাতর হয়ে পড়েছে যে, সামান্যতম ছোঁয়াচেও বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে।

অথচ এ বেদনা তার শারীরিক কোন রোগ নয়। তার প্রমাণ পেল ডাক্তার কয়েকটি সুচতুর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি যা বললো তা হল এই : কিছু কাল পূর্বে বাপের এক বিবাহিত বন্ধু মেয়েটির ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে কুপ্রস্তাব করে এবং তার দিকে লালসাঘন দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে মেয়েটি তখন সেই লোকটার ডান গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। এখন তার নিজেরই ডান গালে প্রচণ্ড অসহনীয় ব্যথা শুরু হয়েছে।

ডায়গ্‌নোসিস হল : অপরাধ বোধ থেকে হিস্টোরিকাল বেদনা। নিজের অজান্তেই মেয়েটি সেই বিবাহিত বাপের বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। ডাক্তারের মুখে সে যখনই জানতে পারলো, তার এই বেদনাবোধ হল নিওরোটিক অনুশোচনার প্রকাশ, তন্মুহূর্তে তার ব্যথা বেদনা বিলীন হয়ে সে নিরাময় হয়ে গেল।

আরেকটি কেস হিস্ট্রি :

'আঠারোশ' নব্বুই খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি। বিকেলের দিকে এক তন্বী ইংরেজ তরুণী গভর্নেস এসে উপস্থিত হল ভিয়েনার তদানিন্তন উদীয়মান ঐ একই চিকিৎসকের সার্জারীতে। স্নায়বিক (নার্ভাস) অসুখ-বিসুখের বিশেষজ্ঞ তরুণ ডাক্তারের নাম সিগমণ্ড ফ্রয়েড।

ইংরেজ তরুণীর অসুখটি কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। ইতিপূর্বে দেখানো বহু ডাক্তারই তার বিচিত্র ও অদ্ভুত রোগের কোন হদিস বা নিরাময় করতে পারেনি।

মেয়েটির বাচনিক প্রকাশ পেল প্রায় মাস ছয়েক ধরে মেয়েটি একটি বিশেষ 'গন্ধ'র দ্বারা অহোরাত্র আক্রান্ত হয়ে আসছে। সে গন্ধটি হল পোড়া পেস্ট্রির (কেক বিশেষ) গন্ধ। সব সময় নিরবছিন্ন এই গন্ধে মেয়েটি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিছুতেই তার হাত থেকে সে রেহাই পাচ্ছে না।

ডাঃ ফ্রয়েড সে সময় 'সম্মোহিত' অবস্থার সাহায্যে তার রোগীদের নিরাময় করা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত ছিলেন। তিনি এই গভর্নেস তরুণীকেও সম্মোহক ভাবাবেশে আচ্ছন্ন করে প্রশ্ন শুরু করলেন, কবে থেকে এই গন্ধ-পেতে শুরু করেন আপনি ?

সংবেশনের ঘোরে তরুণীটি বলে, আমি যখন দুটি বালিকাকে রান্না শেখাচ্ছিলাম, ঠিক সে সময় থেকে।

—বালিকা দুটি কারা ?

—ওদেরই দেখা শোনা করার জন্য আমি গভর্নেস নিযুক্ত আছি। ব্যথা শুরু হওয়ার সময় তারিখটা বিশেষ করে মনে আছে এই জন্যে যে, সেদিনই ইংল্যাণ্ড থেকে মায়ের চিঠি পাই। মা আমাকে দেশে ফিরে যেতে লিখেছিলেন সে চিঠিতে।

—আপনি কি দেশে ফিরে যেতে চাইছিলেন ? ফ্রয়েডের প্রশ্ন।

—উঁহুঁ, মাথা দুলিয়ে ইংরেজতনয়া অসম্মতি প্রকাশ করে বললে, আমি ভিয়েনাতেই থাকতে চাই।

সেদিন ঐ পর্যন্তই। আরও কয়েকদিন এল মেয়েটি। ডাঃ ফ্রয়েড পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেরা করে গেলেন তাকে। যে বাড়িতে সে গভর্নেস, সে বাড়িটি কেমন, বাড়ির লোকজন কেমন, বাড়ির কর্তা কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েটির কথায় জানা গেল, বাড়ির কর্তা ধনী যুবক এবং বিপত্নীক।

অতঃপর অকস্মাৎ একটি নতুন প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন ডাঃ ফ্রয়েড।

—আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আপনি বাড়ির কর্তার প্রেমে পড়েছেন, নয় কি ?

সংবেশন আবিষ্ট হয়েও মেয়েটি যেন কিছুটা অস্বস্তিতে বিব্রত হল, থেমে থেমে বললে, তা·· মানে···হ্যাঁ, বলতে পারেন বটে···

—বেশ বেশ। আপনি কিন্তু আমাকে নিজে থেকে সে কথাটা বলেননি আগে। চেপে গেছেন। চেপে গেছেন এই লজ্জায় যে, আপনি এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়েছেন যে ভদ্রলোক কিনা আপনার দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাবার প্রয়োজন মনে করেন না। নয় কি ?

—হ্যাঁ। লজ্জা লজ্জা চাউনি সহ ইংরেজ তরুণী বলে ওঠে।

—আর, মায়ের পত্র যখন পান, সে সময় আপনি ঐ ভদ্রলোকেরই কথা চিন্তা করছিলেন, কেমন ? আর ঠিক সে সময়েই আপনার নাকে পেস্ট্রি ভাজার গন্ধ প্রবেশ করেছিল, তাই না ?

—ঠিক তাই, কিছুটা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ে তরুণী।

এর ক'দিন বাদে গভর্নেস মেয়েটি আনন্দে ডগমগ হয়ে এসে উপস্থিত হল ডাক্তারের চেম্বারে।

সোল্লাসে জানালো, আর সে পোড়া পেস্ট্রির গন্ধ নাকে পাচ্ছে না। একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে সেই কুৎসিৎ বিরক্তিকর গন্ধ থেকে। কি লজ্জা। মেয়েটির হাবভাব এত বেশি খুশি খুশি যে ফ্রয়েডের তক্ষুণি মনে হল মেয়েটির মনিব সেই বিপত্নীক ভদ্রলোকও অবশ্যই তরুণীটির প্রেমে পড়েছেন।

—কী ব্যাপার বলুন তো ? সাগ্রহে ডাঃ ফ্রয়েড প্রশ্ন করেন।

—আমি কি যে স্বস্তি পেয়েছি, কি যে শান্তি পেয়েছি তা আর বলে বোঝাতে পারব না ডক্টর, তরুণী আবেগে বারেক চোখ বন্ধ করে, ফের বলে যায়, আপনার সঙ্গে আলোচনার পর আমি আমার মনোভাব, মানে আমার এতাবৎ মানসিক অনুভূতি-গুলোকে পুনঃ পরীক্ষা করি, বিশ্লেষণ করি। পরে মনে হয়, কী সাংঘাতিক বোকা আমি, প্রেমে পড়াকে আমি লজ্জাকর ভাবছিলাম। প্রত্যেক মানুষেরই তো আকাঙ্ক্ষিত সব কিছু বস্তু পাবার বা সব কিছু হবার অধিকার অবশ্যই আছে। এতে লজ্জা পাওয়া একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

এই আত্মবিশ্লেষণ এবং এই বোধোদয় মেয়েটিকে তার যন্ত্রণাদায়ক লজ্জার নিগ্রহ থেকে বাঁচিয়েছে। আর লজ্জাভাব যেই চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পোড়া পেস্ট্রির অসহনীয় গন্ধও উধাও হয়ে গেল নাক তথা মন থেকে। মেয়েটি মানসিক ব্যাধি মুক্ত হয়ে গেল।

এ ঘটনার অল্প কদিন বাদেই আরেকটি অদ্ভুত কেস আসে ডাক্তারের কাছে।

সে পেশেন্টও একজন যুবতী নারী। ফ্রয়েড তার নামকরণ করেছিলেন এলিজাবেথ। মৃত্যু শয্যায় শায়িতা বোনের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন এলিজাবেথের দুটি পা সহসা অবশ-হয়ে যায়, প্যারালাইজড হয়ে যায়। ভিয়েনার যাবতীয় ডাক্তাররা তাকে নিরাময় করতে পারেনি। সেসব ডাক্তারের, মেয়েটির শরীরে দেহজ এমন কোন কারণই খুঁজে পায়নি যার ফলে ওর পদদ্বয় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারে।

ফ্রয়েড তরুণীকে সম্মোহক ভাবাবেশে আচ্ছন্ন করে জেরা শুরু করলেন। জেরায় জেরায় এলিজাবেথ এক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, যদিও সে তার বোনকে ভীষণ ভালবাসতো, তবু বোন যে মারা যাচ্ছে এ ঘটনায়, কি আশ্চর্য, সে আনন্দই অনুভব করেছিল মনে মনে।

—আনন্দটা কি এই কারণে যে, আপনি ঐ বোনের স্বামীকে ভাল বাসতেন এবং তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ? আচমকা জিগ্যেস করেন ডাঃ ফ্রয়েড।

—হ্যাঁ, বিস্মিত তরুণী বলে ওঠে, আপনি কি করে জানলেন ?

—সে কথা থাক। আর এই ধরনের করুণ ঘটনা থেকে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন এই বিচ্ছিরি অনুভূতিটাই আপনাকে সমধিক লজ্জা দিচ্ছিল, পীড়িত করছিল, নয় কি ?

—ঠিক বলেছেন, তরুণী যেন আর্তনাদ করে উঠলো, বিশ্বাস করুন, আমি

আমার বোনকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। ও মরুক এ-কথা ভাবছি এবং ভেবে আনন্দ পাচ্ছি, এই বোধটাই সাংঘাতিক, বীভৎস…উঃ। আমি এজন্য ভয়ংকরভাবে লজ্জিত।

আর এই স্বীকারোক্তির পর বিকেল থেকেই এলিজাবেথের পা দুটিতে হৃতশক্তি ক্রমে ক্রমে ফিরে আসতে আসতে অচিরেই সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হল। অচল পা দুটি সচল হয়ে গেল। গালে বেদনা, পেস্ট্রির গন্ধ পাওয়া যুবতী দু'জনের মত, যেই অব্যক্ত লজ্জাবোধ থেকে মুক্ত করলো নিজেকে অমনি এলিজাবেথও মানস সঞ্জাত রোগাক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

এই কেস কয়টিই মেডিকাল ইতিহাসে উজ্জ্বল এক দিগন্ত চিহ্ন হয়ে রইল। পরবর্তী কালের মনোজগতের এক মহত্তর আবিষ্কারের ভিত্তি মূল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল বলা যায়। আজ এই কেসগুলোকে সাইকোম্যাটিক (Psychosomatic) রোগ বলে। এ রোগের উপসর্গের দৈহিক কোন কারণ বর্তমান থাকে না।

দেখা গেল এই তরুণীত্রয় এমন এক একটি অনুভূতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল যেগুলিকে অন্যের কাছে দূরস্থান নিজেদের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করেছিল তারা।

ডাঃ ফ্রয়েড এই প্রকার নিজের কাছ থেকে সত্য গোপন করাকে অবদমন কার্য বা 'রিপ্রেসন' নামে অভিহিত করেন। উপরোক্ত তিনটি কেস-এ একথা প্রমাণিত হল যে, উক্ত অবদমিত অপরাধবোধ অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে বিস্ফোরিত হয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক উপসর্গ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম।

এই আবিষ্কার চিকিৎসা শাস্ত্রে এক মহা বিপ্লব নিয়ে আসে। আর এর দ্বারাই ফ্রয়েডের সুদীর্ঘ সূত্র সন্ধানী গবেষণার সূত্রপাত হয়। যার ফলে উৎপত্তি হয় নতুন মনঃসমীক্ষণ বিজ্ঞানের (Science of Psycho analysis).

বিশেষভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডাক্তারের পরিচালনাধীনে কথাবার্তা এবং আলোচনার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষের সমস্যাসমূহের প্রকাশন বা উন্মোচন করে সমাধান প্রক্রিয়ার নাম মনঃসমীক্ষণ বা সাইকো অ্যানালিসিস।

এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্য খুবই সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাধ্য। উক্ত তিনটি তরুণী অবশ্য খুবই দ্রুত সেরে উঠেছিল, ওরা বলতে গেলে ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম বিশেষ। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসাই দারুণ সময় নেয়। পুরোপুরি সমীক্ষিত হতে গেলে যে কোন জটিল রোগীকে দৈনিক এক ঘণ্টা করে ডাক্তারের কাছে কাটাতে হয় সুদীর্ঘ প্রায় চার কিংবা পাঁচ বছর সময়। আর প্রতি ঘণ্টায় ডাক্তারের ভিজিট লাগতো কম বেশি দুশো থেকে আড়াইশো টাকা। এখন অবশ্য ব্যয়ভার অনেকটা কমে এসেছে।

এতদসত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও মার্কিন মুলুকে হাজার হাজার মানসিক রোগী এই চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে চলেছে। এইসব রোগীদের

(analysands) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইমোসনাল জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ কোন কাজ করতে পারে না। কেউ ঘুমুতে পারে না। এমন কি প্রভাতে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের পৃথিবীর মুখোমুখি হতে পর্যন্ত সাহস পায় না। কেউ বা সমকামী, অথচ মনে মনে স্বাভাবিক যৌনজীবন প্রত্যাশী। কোন কোন নারী রোগী স্বামীমিলনে আতঙ্কগ্রস্থা। অনেক পেশেন্টই এমন বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে নিজেকে তারা হত্যা পর্যন্ত করতে সচেষ্ট হয়। আত্মহত্যার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক হয় তাদের।

ডাক্তার সিগমণ্ড ফ্রয়েড। সারা দুনিয়ায় সর্বাধিক কথিত এক নাম।

অথচ এক কালে এই মানুষটিকেই একদল লোক "উন্মাদ", "পার্ভাট", "সেক্সুয়াল ম্যানিয়াক" ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেছিল। অপরাধটা কি? অপরাধ হল এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটি 'সেক্স'কে তার ভিক্টোরিয় যুগের হিমায়ণ কক্ষ থেকে বাইরে বের করে এনে তাকে যথাযোগ্য সমাদরে প্রাতঃরাশের মর্যাদা দান করেছিলেন। আর আজ মানবসমাজ সেই যৌনবিষয়ক যাবতীয় বিষয়েই ফ্রয়েডের বিধি নিয়মকে অমান্য করে চলতে পারে না।

এই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি প্রেম-প্রণয়-ভালবাসা প্রভৃতির ধ্যান-ধারণায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন, শুনলে অবাক লাগে, সেই মানুষটির নিজের জীবনই ছিল প্রেম-প্রণয়-যৌন ব্যাপারে চরম অসুখী। সরষের মধ্যেই বুঝি ছিল ভূত। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের একজন নিকৃষ্টতম পেশেন্ট।

যাইহোক, ফ্রয়েড বুঝতে পারলেন মানুষের দুটি মন বর্তমান। একটি চেতন অপরটি অবচেতন বা নির্জ্ঞান। মানুষ যখন কোন লজ্জাজনক অনুভূতি বা মনোভাবকে দমন করে ফেলে, তখন সেই ভাব নির্জ্ঞান মনে ডুবে যায়। কিন্তু সজ্ঞানে সে বুঝতে পারে না অচেতনে কি ঘটনা ঘটে গেল। তাই পেশেন্টদের উক্ত ব্যাপার উন্মোচনে নিয়োজিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রয়েড দেখলেন সবচেয়ে সহজ উপায় হল রোগীদের স্বপ্নসমূহকে পরীক্ষা করে দেখা। মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনই শুরু হয় অচেতন মনের কর্তৃত্ব। মানুষ স্বপ্নের মধ্যেই তাদের লজ্জাকর অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করে থাকে, যে-গুলোকে জাগরণে তারা কখনোই মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় না।

একসময় জনৈক রোগী এল। লোকটি সাংঘাতিক ঈর্ষা দ্বেষ, রোগে ভুগেভুগে প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জীবনে। সে একটি স্বপ্নের বিবরণ দিল যাতে সে ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে।

ফ্রয়েড রোগীকে বললেন, মনোগত বাসনার প্রতিফল কার্যকরী হয় স্বপ্নে। আপনি যখন স্বপ্নে ভাইয়ের মৃত্যুদৃশ্য দেখেছেন, তার অর্থ হল আপনি অজ্ঞাতসারে অচেতন মনে সত্যিই ভাইয়ের মৃত্যু চান।

শুনে-রোগী প্রকৃতই রেগে গেল, বলেনাকি। না না। একি বাজে কথা বলছেন ডক্টর। আমার প্রিয় ভাইয়ের জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, আর আমি কিনা ওর মৃত্যু চাই বলছেন!

ডাঃ ফ্রয়েড তাঁর নিজ বক্তব্যে অটল রইলেন, প্রশ্ন করলেন, সত্যি করে বলুনতো আপনি কি ছোট ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করেননি? মনে করুন ছেলেবেলাকার কথা…

সেদিন কিছুতেই ভাঙলো না। বেশ কয়েকদিন বাদে লোকটা অবশেষে স্বীকারোক্তি করলো। সে জানালো, খুব ছোটবেলায় নবজাত এই ভাইয়ের প্রতি মা বাবার অত্যধিক ভালবাসা দেখে তার ভীষণ হিংসে হয়েছিল এবং মনে মনে সে এই প্রার্থনা করেছিল যে, তার এই ছোটভাইটা যে কোন উপায়ে সরে গেলেই যেন সে শান্তি পায়।

—কারেক্ট! ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করে বললেন, আপনি ওকে সরাতে চেয়েছিলেন, মানে ওর মৃত্যু কামনা করেছিলেন। আপনি ভাবলেন সেই শিশুকালের চিন্তাধারা বুঝি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন বয়সের চাপে। কিন্তু আসলে সেই লজ্জাকর স্মৃতিকে আপনি অচেতন মনে দমন করে রেখেছিলেন মাত্র। অজ্ঞাতসারে সেই শৈশবের হিংসা ও দ্বেষ ভাব এখনো আপনার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সেই ঘৃণা ও দ্বেষ আজও আপনাকে জ্বালাচ্ছে।

ফ্রয়েড ঠিকই ধরেছিলেন। চাপা দেওয়া লজ্জাকর মনোভাব পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হল। রোগী তার মুখোমুখি হওয়ায় হালকা হয়ে গেল। আর তাতেই সে আরোগ্য লাভ করলো। এইসব অবদমিত অনুভূতিরা স্বপ্নের মাঝে দেখা দিত। এরপর থেকে আজে বাজে স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হয়ে গেল তার।

পূর্বেই বলা হয়েছে ফ্রয়েড নিজেই ডাক্তার এবং নিজেই তাঁর রোগী। প্রচুর বিষয় তিনি আবিষ্কার করলেন নিজেকে অ্যানালাইজ করে, আত্মবিশ্লেষণ করে, ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। সন্তানাদিও হয়েছে! অবশ্য সংসার বা পরিবারের দিকে নজর দেবার তাঁর সময় কোথায়? আত্মসমীক্ষণ করাটাই যেন একটা প্রচণ্ড নেশা বা খেয়ালের মত পেয়ে বসলো তাঁকে। দৈনিক ১৫ ঘন্টা অক্লান্তভাবে কাজ করতেন তিনি। সকালে ও বিকেলে চলতো রোগী দেখা, তার-পর আহারের পর প্রতি রাত্রিতে, বছরের পর বছর তিনি তাঁর স্টাডি কক্ষে নিঃসঙ্গ একাকী নিজেকে নিয়ে পড়তেন। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যেতেন নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস-কল্পনা-খেয়াল এবং স্বপ্ন প্রভৃতিকে। নির্জন মনের গভীরতা থেকে সে-গুলিকে উত্তোলিত করে উন্মোচিত করতেন।

কাজটা ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক ধৈর্যসহ। রোগীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মনোভাবের জন্য লজ্জিত থাকে, এবং যথারীতি মনঃসমীক্ষাবিদ চিকিৎ-সককে তারা সত্য উদ্‌ঘাটনে নিয়ত বাধা দিয়ে থাকে। ডাক্তার হিসেবে ফ্রয়েড এটা

বেশ ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু আশ্চর্য, রোগী হিসেবে তিনি নিজেকেই নিজে বাধা দিতেন সত্যান্বেষণের ব্যাপারে, ফ্রয়েড আবিষ্কার করলেন যে. যেমন হৃৎ-স্পন্দনের উপর মানুষের কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি নিয়ন্ত্রণ নেই তার অচেতন মনের উপরেও। চেতন মন সুপ্ত সমস্যাকে প্রকাশ করতে বা তার মুখোমুখি হতে ভয় পায়, আতঙ্কিত হয়। সে সমস্যাকে অচেতন মন থেকে খুঁড়ে উত্তোলিত করতে প্রকৃতই শক্তির প্রয়োজন। ফ্রয়েড মনের এমন সব আনাচ-কানাচের গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিলেন যা তাঁর পূর্বে কোন মানুষের সেগুলোর:অস্তিত্ব কল্পনা করাও সম্ভব হয়নি। নিজের গুপ্ত লজ্জাজনক অনেক কিছু আবিষ্কার করে দেখলেন। অন্তরের অন্তস্থল খুঁড়ে খুঁড়ে কৌতূহলদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ বহু ভাবনার সন্ধান পেলেন।

প্রথম সূত্র পেলেন যে, এখনো তাঁর মনে বর্তমান রয়েছে নিজ পিতার প্রতি ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দীতার ভাব। শৈশবে লালিত ঈর্ষা ভাব আজও তাঁর মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। দ্বিতীয় সূত্র হল, আজও তাঁর মনের মধ্যে মায়ের প্রতি নিজ স্ত্রীর চেয়েও বেশি দরদ ও মমতা বিদ্যমান রয়েছে।

এইসব বিচিত্র সূত্রসমূহের দ্বারা ধীরে ধীরে যে চিত্রটা ক্রমশ উদ্ভাষিত হল ফ্রয়েডের সামনে তা বড়ই নিদারুণ এক ভয়ংকর বাস্তব সত্য। অচিন্ত্যনীয় চমকপ্রদ সত্য। শৈশবে তিনি মায়ের ভালবাসায় পড়েছিলেন এবং তাঁকে লালসা পঙ্কিল অনুভূতি নিয়ে কামনা করেছিলেন। কিন্তু মা হল বাবার সম্পত্তি। ফ্রয়েডেয় মনে আছে অতি শৈশবে তিনি একদা বাবা-মার মিলন দৃশ্য দেখেছিলেন। সেখানেই ঈর্ষাভাবের জন্ম। এই ঈর্ষাভাব ক্রমান্বয়ে পিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধা থেকে কঠিনতম ঘৃণায় প্ররোচিত করেছে, ফ্রয়েড অনুভব করলেন যে, তিনি অচেতন মনে তাঁর পিতাকে হত্যা পর্যন্ত করতেও চেয়েছেন, যাতে তিনি নিজ মাকে পুরোপুরিভাবে নিজের করে পেতে পারেন।

একটি গ্রীক নাটকের নায়ক তাঁর পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করে—এই ঘটনা অনুসারে ফ্রয়েড এই বিশেষ অনুভূতিকে "ঈডিপাস সিচুয়েসান (Oedipus situation) বলে অভিহিত করেন। এর মাধ্যমে ফ্রয়েড একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে-উপনীত হন। তা হল, সমস্ত-ছেলেরাই তাদের মাকে ভালবাসে, এবং এর ফল তাদের পিতার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বিনষ্ট হয়ে ঈর্ষা দ্বেষপূর্ণ ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। একইভাবে তিনি ঘোষণা করেন, সমস্ত মেয়েরাই তাদের পিতাকে ভালবাসে এবং মাতাকে ঘৃণা করে। তার নাম হল, ইলেকট্রা কমপ্লেক্স।

তাহলে এই পিতৃমাতৃ হত্যার বাসনা অচেতন মনে সুপ্ত থাকে কেন? কারণটি সহজ। শিশুদের প্রথম থেকেই এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা সদা সর্বদাই পিতা-মাতাকে ভক্তি করবে, শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে। তাই তাদের যে কোন একজনকে ঘৃণা করার অনুভূতিতে নিজেরাই লজ্জানুভব করে, তাই সেই ভাবনাকে অবদমন করে রাখে অচেতন মনের অতল গহবরে।

এইভাবে টুকরো টুকরো ঘটনা সংগ্রহ করে তাঁর অভিনব আবিষ্কারের শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন। মনে পড়ে, যখন তিনি প্যারিসে ডাঃ চারকটের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন, সে সময় ডাঃ চারকট তাঁকে জনৈক তরুণ দম্পতির একটি কেস হিষ্ট্রি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তরুণী স্ত্রীটি নার্ভাস ফিটে ভুগছে। ঐ রোগের কারণ তার তরুণ স্বামীটি এক হয় যৌনক্ষমতাহীন ব্যক্তি, নয়ত সে অতিশয় কদর্য এক শয্যাসঙ্গী।

কিন্তু মেয়েটির ফিট-এর রোগের সঙ্গে তার স্বামীর যৌন অক্ষমতা বা কুৎসিৎ যৌনাচারের সম্পর্ক কি? ফ্রয়েড সবিস্ময়ে জানতে চান।

ডাঃ চারকট জোর দিয়ে বলেন, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই ধরনের কেস-এর পেছনে কারণ হিসেবে সর্বদাই যৌন ব্যাপার বর্তমান থাকে, এটা একটা অবধারিত সত্য।

এর অনতিকাল পরে অপর একজন ডাক্তার ফ্রয়েডকে জনৈকা নারী পেশেন্টের ঘটনা বলেন। সেই নারীটি এমন প্রবল দুশ্চিন্তারোগে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন যে, প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় তিনি ডাক্তারের খোঁজ করতেন।

—বিস্ময়ের কথাহল, সেই ডাক্তার জানান, যদিও ঐ মহিলার বিয়ে হয়েছিল পাক্কা আঠারো বৎসর কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন অপাপবিদ্ধা কুমারী অবস্থায়ই, অর্থাৎ যৌনসঙ্গম অনভিজ্ঞা। কারণ হল, তার স্বামী ছিলেন যৌন-মিলন-অক্ষম পুরুষত্বহীন ব্যক্তি। এই ধরনের রোগের ঔষধ সব ডাক্তারেরই জানা। অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌনসম্পর্ক শুরু হলেই রোগিণী ভাল হয়ে যায়, কিন্তু মুশকিল এই যে ডাক্তারদের সুনাম রক্ষার সৌজন্যে তথাকথিত এ দাওয়াই-এর কথা তো সোজাসুজি বলাও সম্ভব নয়।

নিজের পেশেন্টদের উপসর্গের কাহিনী শুনতে শুনতে ফ্রয়েডের এইসব অতীতে শোনা কথা মনে পড়ে যেত। ক্রমে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রতিটি স্নায়বিক পীড়ার (যাকে বর্তমানে বলা হয় নিউরোসিস) উৎপত্তি হয় যৌন অশান্তি বা যৌন অতৃপ্তি থেকে। এবার তাহলে প্রশ্ন জাগে: কেন তার রোগীরা অশান্ত বা অতৃপ্ত হন? কেন তারা স্বাভাবিক যৌন জীবন-যাপনে সক্ষম হন না? কেন কিছু পুরুষ যৌনক্রীড়াঅক্ষম বা কিছু নারী কামশীতল হয়?

ফ্রয়েড এর উত্তর খুঁজে পেলেন সেই ঈডিপাস সিচুয়েসনের মধ্যে, সুস্থ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান মানুষ ঐ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু মানুষ ঐ ঈডিপাস অবস্থাতেই বদ্ধ বা আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেইরূপ অবস্থাকে ফ্রয়েড ফিকসেটেড (Fixated) বলে অভিহিত করেন। তাদের মধ্যে 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'-এর বা ঈডিপাস গুঢ়ৈষার বিকাশ ঘটে। ঐসব মানুষেরা অচেতন মনে মাকে প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসতে থাকে। অজ্ঞাতসারেই তারা স্ত্রীর মধ্যে মাকে দেখতে পায়, ফলে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলনে রত হতে সঙ্কোচ বোধ করে, লজ্জিত

হয়। এই লজ্জাসংকোচ কালক্রমে তাদের যৌনক্ষমতা অক্ষম করে তোলে। একই পন্থায় স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত স্ত্রীরা কামশীতল হয়ে ওঠে কেননা তারাও স্বামীর মধ্যে নিজ পিতাকে দেখতে পায়।

একই কমপ্লেক্সে ভুগে স্বয়ং তিনিও নিজ ছেলের মৃত্যু কামনা করেছিলেন পত্নীকে দেখতেন মায়ের মত। অজ্ঞাতসারেই বুঝি অচেতনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন নিজ কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর প্রেমাসক্তা হোক, যার ফলে ইলেকট্রা কমপ্লেক্সে ভুগে সেই মেয়ে অ্যানা সারাজীবন একটি মানুষের প্রতিই একনিষ্ঠ হয়ে রইল, সে মানুষটি হল স্বয়ং তার পিতা।

এইভাবে তিনি মনের নতুন এক বিশাল বিশ্বকে জয় করে ফেলেছিলেন। মনের সেই জগতের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছিলেন মানুষের সার্বিক মন হল একটা ভাসমান শৈলের মত। যেটা ওপরে দেখা যাচ্ছে সেটা হল সজ্ঞান মন। কিন্তু মনের সেটা হল অতি সামান্য অংশই। হিমশৈলের যেমন ৮ভাগের ৭ভাগই জলের তলায় থাকে, মানুষের মনেরও তেমনি চৌদ্দ আনা ডুবে থাকে অচেতনে। এরই ফলে আমরা আমাদের নিজেদের মনকেই চিনতে পারি না, জানতে পারি না। অথচ আমরা কিন্তু পরিচালিত হই ঐ সুপ্ত গুপ্ত লুপ্ত মনের দ্বারাই।

একজন ভক্ত প্রকৃতই বলেছিলেন যে, ডাঃ সিগমণ্ড ফ্রয়েড ছিলেন তাঁর নিজেরই একজন নিকৃষ্টতম পেশেন্ট।

আমি একজন বিদেশী ডাক্তার, তথাকথিত 'গুপ্তচর' বৃত্তির অপরাধে বন্দী। আর সেই আমার অপারেশন ছুরির অধীনে এলেন কিনা রাশিয়ার স্পেস্ রেস-কে যে মস্তিষ্কটি সর্বাধিক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফিজিসিস্ট লেভ ল্যাণ্ডাউ। আমার অপারেশন নাইফ-এর কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম সকলের সতর্ক দৃষ্টি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর আমি এও নিশ্চিতরূপেই জানি যে, যদি এই মহান বিজ্ঞানী মারা যান, তাহলে তাহলে আমারও মৃত্যুরেব ন সংশয়।

এই কথাগুলো হল ডাঃ লুই ডিলেটুর-এর। তাঁর জীবনে ঘটা এই রোমাঞ্চকর কাহিনীটি তাঁরই জবানীতে শোনা যাক।

*　　　*　　　*

এম. ভি. ডি. এজেন্টরা আমাদের নিয়ে গেল মস্কোর ন্যাশনাল হোটেল-এর কনফারেন্স রুম-এ। ঐ হোটেলের ১১৫ নম্বর ঘরে একদা স্বয়ং লেনিন এসে বাস করে গিয়েছেন। প্রায় ষাটজন নরনারী একজন বক্তার-টেবিলের মুখোমুখি হয়ে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। টেবিলের ওপর একটি ফিল্ম প্রজেক্টর রয়েছে আর বক্তার পেছনে টাঙানো একটি স্ক্রীন।

সবাই বসলে পর এম. ভি. ডি. এজেন্টরা দরজা আগলে প্রহরায় দাঁড়াল।

দীর্ঘাঙ্গ টাক মাথা এক ব্যক্তি বক্তার টেবিল-এর কাছে গেলেন। তিনি হলেন মস্কোর প্রখ্যাত মাইটি শোরা হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ডাঃ ডিমিট্রি অসট্রভ।

তিনি বললেন, আপনাদের এখানে এক বিশেষ গুরুতর ব্যাপারের জন্য সমবেত করা হয়েছে। কদিন আগে একটি অত্যন্ত ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। লেভ ল্যাণ্ডাউ মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত। একজন শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে তার ড্রাইভার বেসামাল হয়ে একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। পেছনে বসা প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ সে দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক রূপে আহত হন। তাঁর মৃত্যু হওয়া মানে আপনারা জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা কোনমতেই ল্যাণ্ডাউকে হারাতে চাই না। আপনাদের ওকে বাঁচিয়ে তুলতে স্ব স্ব-সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি মৃত্যুর হাত থেকেও হয় তবু ওঁকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। মরে গেলেও বাঁচাতে হবে। এটা আদৌ কোন অতিশয়োক্তি নয়, কমরেডগণ।

লেভ ল্যাণ্ডাউ। ৫৪ বৎসরের অসাধারণ ব্রিলিয়ান্ট ফিজিসিস্ট বিজ্ঞানী, যাঁর

সক্রিয় সাহায্যে রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয়। চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠাবার প্রতিযোগিতায় যাঁর সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে, কোন মতেই সাফল্য সম্ভবপর নয়। সেই মানুষ কিনা আজ মৃত্যুপথযাত্রী।

এই ভদ্র, স্বপ্নালু দৃষ্টিসম্পন্ন মহান বৈজ্ঞানিকের সুবিধার্থে সোভিয়েট সরকার ৫/৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ল্যাবরেটরী নির্মাণ করে দিয়েছেন। বারো বছর ধরে মস্কোর ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল প্রবলেম-এর নেতৃত্ব করে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। বিজ্ঞান জগতে তখন থেকেই জল্পনা-কল্পনা কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে, তিনিই ১৯৬২-তে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হবেন। লিকুইড হেলিয়াম-এর সম্পূর্ণ জিরো টেম্পারেচার-এ আচার-আচরণ-বিষয়ক আঙ্কিক ব্যাখ্যাই উক্ত পুরস্কার বিজয়ের কারণ হবে, অতএব এই বিজ্ঞানীর মৃত্যু মানে মহাকাশ প্রতিযোগিতায় দশ বছর পিছিয়ে যাওয়া।

—অ্যাটেনসন প্লিজ! বক্তার কথার সঙ্গে সঙ্গে কনফারেন্স রুম-এর আলো নিভে গেল এবং এক রঙিন ছবি প্রতিফলিত হল পেছনের পর্দায়।

ছবিতে দেখা গেল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শুধু একটি মুখ। বেদনাপীড়িত দুটি চোখ। ছবিতে একজন ডাক্তার হাসপাতাল বেডে শোয়ানো পেশেন্ট-এর গায়ের চাদর সরিয়ে দিল।

অন্ধকার ঘরে ডাঃ অসট্রভ-এর কাটা কাটা কথাগুলো যেন মেশিনগান-এর গুলির মত শ্রুত হতে থাকলো।

—এবারে আঘাতসমূহের বিবরণ শুনুন ঃ ফ্র্যাকচারড স্কাল···ব্রেন কনটুশান, নিদারুণ শক ··চূর্ণ-বিচূর্ণ নয়টি পাঁজর ··পানচারড চেষ্ট পেলভিক ফ্র্যাকচার··· রাপচার অফ ব্লাডার ··বাঁ বাহু প্যারালাইজড, ডান বাহুর আংশিক পক্ষাঘাত, দুপা সম্পূর্ণ অসাড়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং সার্কুলেশন ফেল করছে। পর্দায় দৃশ্যান্তর হল। একজন মেডিকাল টেকনিশিয়ান ল্যাণ্ডাউর দিকে ঝুঁকে পড়ে রোগীর পায়ের ছোট্ট একটা ব্যাণ্ডেজের ওপর ইলেকট্রোডস্ স্পর্শ করালো। কিন্তু কোন রিঅ্যাকসন দৃষ্ট হল না।

ডাঃ অস্ট্রভের কণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিত হল ঃ প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ কালা-বোবা এবং অন্ধ হয়ে গেছেন ··কোন রিফ্লেক্স পরিদৃষ্ট হচ্ছে না, ব্যথা বা উত্তেজনায় কোন রিঅ্যাকসন হচ্ছে না। পাঁচদিন পূর্বে দুর্ঘটনা হওয়ার পর থেকে আমরা ওঁকে বাঁচাবার জন্য কি কি প্রচেষ্টা করেছি পর্দায় ভালভাবে তা লক্ষ্য করুন।

পাঁ-চ দিন! বলেকি! তার মানে ১৯৬২-র ৭ই জানুয়ারী। ডাঃ ল্যাণ্ডাউ যে এখনো জীবিত রয়েছেন এটাই তো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। নিউরো সার্জন হিসেবে আমার যাবতীয় প্রফেসনে ইন্টারেষ্ট জাগ্রত হল এবার। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঝুঁকে পড়ে পর্দার দিকে তাকালাম।

—ইনি হলেন লেনিন পলিক্লিনিকের ডাঃ মেলানেক, ডঃ অসট্রভ-র কণ্ঠ বলে

গেল, তিনি এখন পেশেন্টের মাথা ওপন করে তাতে কেমিক্যাল ইউরিয়া দিচ্ছেন, প্রেশার এবং ফোলা কমিয়ে আনবার জন্য। প্রফেসারকে অক্সিজেন দেবার জন্য আমরা পাম্প অক্সিজেনেটর প্রয়োগ করে চলেছি দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে। খাওয়ানোর ব্যাপার হয়েছে এক নিদারুণ সমস্যা। শুধুমাত্র আধা তরল খাদ্য নাক দিয়ে প্রবেশ করানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

—এখন ভালভাবে লক্ষ্য করুন পর্দার দিকে। তাহলে বুঝতে পারবেন ওঁকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কি দুর্দান্ত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। ওঁর—টেম্পারেচার ১০৭° পর্যন্ত ওঠে এবং ১০৪-এর নিচে বলতে গেলে নামেই না। স্পেশ্যাল ড্রাগ ও অ্যান্টিবায়োটিকেও কোন কাজ হচ্ছে না। পরের দৃশ্যে আপনারা দেখতে পাবেন সত্যি সত্যিই মৃত অবস্থা থেকে ওকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা হল।

পর্দায় ডাক্তার রোগীর নাড়ি দেখলো। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের ছিদ্রের সামনে একটা আয়না ধরলো। অসট্রভ-এর কণ্ঠ শোনা গেল, ইনি এখন ক্লিনিক্যালি মৃত। বহু রবার টিউব ও চকচকে ক্রোম পাইপ সমন্বিত একটি মেসিনকে ঠেলে নিয়ে আসা হল ঘরে। ল্যাণ্ডাউর বাম বাহুতে আর্টারীতে রক্ত পাম্প করে দেওয়া হতে লাগলো। জনৈকা মেয়ে ডাক্তার রোগীর পায়ে স্টিমুল্যাণ্ট ইনজেকসন করে দিল। অন্যান্য ডাক্তাররা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো "মৃত" পেশেণ্টকে। প্রতীক্ষা…প্রতীক্ষা… অধীর প্রতীক্ষা। সিনেমার দর্শক আমরাও রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। রক্ত পাম্প করা চলতে লাগলো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

উত্তেজনায় আমার গলাও শুকিয়ে কাঠ। তিন মিনিট…চার…পাঁচ—রক্ত পাম্প চলছে…পর্দা এবং হোটেল রুমের দর্শক সবাই চরম উৎকণ্ঠিত। সাড়ে পাঁচ মিনিট…ছয়। ল্যাণ্ডাউ-র খাটের পাশে ঝুলে থাকা বাঁ হাত-টা সামান্য একটু নড়ে উঠলো।

ক্যামেরা আঙ্গুলের প্রতি জুম হয়ে ক্লোজআপ হল। মরা কীট-এর মত ফ্যাকাশে-শীর্ণ এবং আর্টিস্টিক সেই আঙুলগুলো। সাত মিনিট…প্রায় বার মিনিট স্তব্ধ থাকার পর দেহের আঙুলগুলো নড়ে উঠলো। সন্দেহ নেই ল্যাণ্ডাউ পুনরায় প্রাণ ফিরে পেলেন।

ক্ল্যাম্প খুলে মেশিনটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সিনেমা শেষ। ঘরের আলো ফের জ্বলে উঠলো।

অসট্রভ বলে যাচ্ছেন, এ হল বলতে গেলে ওকে পুরোপুরি কবর থেকে ফিরিয়ে আনবার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। ফিরিয়ে আনা না বলে মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা বলাই বোধ করি যথোপযুক্ত হবে। আরও কয়েকবার তাঁকে এমনিভাবে প্রাণ দান করা হয়েছে। এই তো দুদিন পূর্বে নিউরোপ্যাথলজিস্ট ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তুললেন যখন তিনি যাবতীয় ক্লিনিকাল টেস্ট-এ মৃত বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জনৈক ড্যানিস ফিজিসিস্ট স্পেশ্যাল ওষুধ প্লেন মারফত আনিয়ে ওঁকে

তৃতীয় বারের মত বাঁচিয়ে তোলেন। ড্রাগ থেরাপি করে ওঁকে ফের চেতনায় ফিরিয়ে আনার মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে এই আশংকা দেখা দিচ্ছে যে, ওঁকে হয়ত চিরদিনের মতই হারাতে হবে। তবে যে করেই হোক আপনাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওঁকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে।

আপনারা ভালভাবেই জানেন ল্যাণ্ডাউ আমাদের দেশের পক্ষে কতখানি। তাই আপনাদের এখানে এনে জমায়েত করা হয়েছে। যান নিজ নিজ ঘরে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে ঠিক ৮-৪৫-এ এ হল ঘরে ফিরে আসুন। সে সময় আপনাদের যথাযথ অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক করে দেবেন ডাঃ সি. মিয়ন ওব্‌রেজট্। তিনতলাস্থিত আমার হোটেল রুম-এ আমার জন্যে একজন গাট্টাগোট্টা অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি সম্পন্ন দারুণ গম্ভীর লোক অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখে ভয়ে মনটা ধক্ করে উঠলো। এ ধরনের ভয়ংকর লোকেদের সংশ্রবে বহুবারই ইতিপূর্বে আমায় আসতে হয়েছে।

ইনি আরেকজন এম. ভি. ডি. এজেন্ট। কোনপ্রকার গৌরচন্দ্রিকা না করে বজ্রসম কণ্ঠে তিনি সরাসরি বক্তব্যে এসে গেলেন, শুনুন ডাঃ ডিলেটর, যদি আমরা আমাদের নিজস্ব ধারায় চলতাম তাহলে এখনও আপনি লৌহগরাদের অভ্যন্তরেই থাকতেন। তবে মিনিস্টার অফ হেলথ জানালেন যে, বৈজ্ঞানিক ল্যাণ্ডাউর অপারেশন-এর ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আপনাকে প্রয়োজন। অতএব মস্কো থেকে পালাবার চেষ্টা হবে আপনার পক্ষে চরম মূঢ়তা। তাছাড়া আপনার প্রয়োজনীয় পেপার্সওতো নেই। সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও হয়ে যাবেন আপনি। এই হোটেলে ঐ ক্লিনিকে এবং সেই হাসপাতালে সর্বত্রই লোক রয়েছে আমাদের। যারা অহোরাত্র আপনার প্রতি নজর রেখে যাবার জন্য নির্দিষ্ট। যথাজ্ঞা কাজ করে যান, নিখুঁতভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে কোন বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ব্যস এইটুকুই নির্দেশ রইল এখন-কার মত। তিন বছরের নিপীড়িত দেহ মন সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বলে উঠলাম, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি তাহলে আমার কি লাভ হবে শুনি? আমি আর জেলে ফিরে যেতে চাই না। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ালো, ওসব আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আমার ওপর অর্ডার আছে আপনার প্রতি গোপন নজর রাখবার তবে একথা জেনে রাখা ভাল, সহযোগিতা করলে তার-ফল ভালই হবে। প্রফেসার ল্যাণ্ডাউ-র জীবন রক্ষা পেলে তবে পুরস্কার অবশ্যই পাবেন।

বলে সে গট গট করে বেরিয়ে গেল। আর যদি প্রফেসর মারা যায়? আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম তার পরিণাম। সহসা প্যারিসে থাকা আমার স্ত্রী জারমেইন ও আমাদের ছোট্ট মেয়ে লিসেত্তির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমার প্যারিসে গৃহ আমর সুন্দর সংসার। যদি ল্যাণ্ডাউ মারা যায়, তাহলে আমি কি আর আমার পরিবারদের দেখতে পাব এ জীবনে?

আমি ১৯৫৯-তে রাশিয়া এসেছিলাম মস্কোর এক সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে

যোগ দিতে এবং তিনমাসের জন্য এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেকেণ্ড মস্কো হাসপাতালে অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে।

মেয়ের অসুখ থাকায় স্ত্রী আসতে পারেনি সঙ্গে। না এসে খুব বেঁচে গেছে বলবো।

মস্কোতে আমার বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ মিখাইল জুরকেল। এক কালে ইনি ফরাসীদেশে আমার স্কুলে সহপাঠি ছিলেন। ওর অ্যাপার্টমেন্টে আমি বহুবার চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছি। হাস্যরসিক মিখাইলও তার সদা হাস্যময়ী স্ত্রী লুডমনকে আমার খুব ভাল লাগত। ওদের আটবছরের ছেলেটিও আমার প্রিয় ছিল। আমি জানতাম না যে, মিখাইল কম্যুনিষ্ট সিস্টেমের দারুণ শত্রু ছিল। এবং সে যে এক বিদেশী শক্তি অর্থাৎ তুরস্ককে গোপন সংবাদাদি প্রদান করে গুপ্তচর বৃত্তি করতো তাও ছিল আমার কল্পনাতীত।

মিখাইল ১৯৫৯-র মে মাসে গ্রেপ্তার হয়ে সিক্রেট কোর্টে বিচারাধীন হল। ওর ছোট্ট ছেলে সহজাত সরলতায় মামলার সময় বলে দিল যে, আমি ছিলাম ওদের বাড়িতে একজন নিয়মিত অতিথি। একদিন একরাতে ডিনারেও আমি যোগ দিয়েছিলাম যে, আসরে উপস্থিত ছিল ইসমাইল পনন্নু নামক একজন তুরস্কের ব্যবসায়ী।

পনন্নু সোভিয়েতদের কাছে গুপ্তচররূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। তার দুবছর জেল ও জেলান্তে রাশিয়া থেকে চিরতরে বহিষ্কার হয়ে সে পার পেয়ে গেল। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মিখাইলের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। আর আমি? যে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নিরপরাধ নিরীহ নির্দোষ, সেই আমাকে সহযোগিতার অভিযোগে দেওয়া হল ১০ বছর কারাদণ্ড। লেনিনগ্রাদের পিটার অ্যাণ্ড পল জেলে বন্দী থাকতে হবে। সেটা তিন বছর পূর্বের ঘটনা!

সেদিন রাত দুটোয়, অর্থাৎ ১৯৬২-র ১২ই জানুয়ারী শেষ রাতে একজন এম. ভি. ডি এজেন্ট এসে প্রবেশ করলো আমার সেল-এ। আমায় টেনে তুলে পোষাক পরে নিতে অর্ডার করলো। প্রথমে আমার অকল্পনীয় ভয় এসে গিয়েছিল মনে। আমি ইতিপূর্বে দেখেছি মাঝরাতে জেলের কুঠরী থেকে অনেক বন্দীদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তারা ফিরে আসেনি। কিন্তু আমার ভয় ক্রমে বিহ্বলতায় রূপান্তরিত হল যখন দেখলাম একটা কালো ব্যাগ নিয়ে এসেছে উক্ত এজেন্ট। যেটা আমারই ডাক্তারী কিট-ব্যাগ। যদি আমায় টর্চার করত বা মেরে ফেলতো তাহলে ওরা এ ব্যাগটা আনত না বোধ করি।

আমায় কোন কারণ দর্শানো হল না। আমায় ধরে নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমান পোবেডা গাড়ীতে তুললো। আমাকে নিয়ে গেল লেনিনগ্রাদ এয়ার পোর্টে। সেখানে এরোফ্লোট জেট বিমানটি বুঝি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল রানওয়েতে। আমি ওঠবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা আকাশে পাড়ি দিল, আরও চারজন

যাত্রী ছিল সে প্লেনে। দু'জনকে আমি চিনতে পারলাম, তারা অবশ্য স্বভাবতই আমার পরিচয় অগ্রাহ্য করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

সেই দু'জনের একজন হলেন লেনিনগ্রাদ সামরিক হাসপাতালের প্রফেসার ইলিয়া করনেভ, যিনি স্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধের সময়ে সৈনিকদের প্রায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাত পা পুনরায় জুড়ে দিয়ে খুব প্রখ্যাত হয়েছেন।

অপরজন হল ডাঃ লিডোভ বেরোনভ নাম্নী মোটাসোটা পুরুষালি পোষাকপরা এক বাজে মনোবৃত্তির মেয়ে ডাক্তার। মনটা যেমন তার বাজে, তেমনি পেশাগত-ভাবেও সে একজন হাতুড়ে। সে হল হেমাটোলজিস্ট (রক্ত বিশারদ) কিন্তু রাজনীতির প্যাঁচ পয়জারের প্রতিই তার যেন বেশী অনুরক্তি। কতকগুলো উদ্ভট টোটকা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী সে।

মস্কো এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের একটা বাস-এ করে নিয়ে যাওয়া হল ন্যাশনাল হোটেলে। অপরাপর প্লেন থেকে নামা বহু মানুষ একই বাসে এখানে এল। অধিকাংশই ডাক্তার এবং এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। একজনকে চিনতে পারলাম। তিনি হলেন ব্লাড ভেসল স্টিচিং মেসিন উদ্ভাবক ডাঃ আইভ্যান পাইজিকেভ।

তারপর কনফারেন্স হল-এ। সেখানেই প্রকাশিত হল কেন আমাদের এখানে আনা হয়েছে।

ফ্যাক্টরী ওয়ার্কারদের বাসস্থান অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত হাসপাতাল নং ৫০। দুর্ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার ল্যাণ্ডাউকে তড়িঘড়ি এনে তোলা হয়েছিল ওই ছোট হাসপাতালটিতে।

আমায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হল একটি এম. ভি. ডি.-দের গাড়ি করে। আমার সঙ্গে গেলেন ডাঃ ফেওডোর গানুজ। ইনি মৃতদেহ থেকে জীবিত মানুষের শরীরে রক্তপ্রদান করবার ব্যাপারে সর্বপ্রথম পারদর্শিতা দেখান। এঁর মতে জীবিত রক্তদাতার চেয়ে ছয় থেকে আটগুণ বেশী রক্ত পাওয়া যায় মৃতদেহ থেকে। সদ্য মৃতদেহ থেকে চামড়া কেটে নিয়ে জীবিত মানুষের মুখে তা গ্র্যাফটিং করেও নাম কিনেছেন ইনি।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম সরকারী নির্দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে একাধিক স্পেশালিস্ট, টিচার, সার্জন, ফিজিওথেরাপিস্ট, অর্থপেডিস্ট, নার্সিং একস্পার্ট, ডারমাটোলজিস্ট এবং হেমাটোলজিস্ট।

ওখানে পরিচিত হলাম ডাঃ ডেভিড লুপোর সঙ্গে। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই লাজুক ভদ্রলোক সসঙ্কোচে জানালেন তিনি হলেন 'ব্লাড-স্টিকস'-এর উদ্ভাবক, সঙ্গেকার আইস-বকসে করে শুকনো মানবিক রক্তে নির্মিত স্টিকস নিয়ে এসেছেন।

মস্কোর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে এসেছে ডাঃ ইগর সেমেল। সঙ্গে তার সার্জিক্যাল ক্যামেরা। উক্ত ক্যামেরার সাহায্যে তিনি দেহাভ্যন্তরের রঙিন ফটো নিতে সক্ষম।

সমবেত ডাক্তারদের দলপতি, ডাঃ সেমেয়ন ওবরাজট্ বললেন, ডাঃ ডিলেটুর আপনি ষ্ট্যাণ্ড-বাই বেসিসে থাকবেন।

কাল ডাঃ কুশকোভো অপারেশন করবেন। আপনি তাঁকে অ্যাসিষ্ট করবেন। কুশকোভোর চেয়ে ভাল সার্জন হয় না।

আমি সম্মতিতে মাথা নাড়লাম। ঠিকই, সন্দেহাতীতভাবে কুশকোভো এ ব্যাপারে মাস্টার। ব্রিলিয়ান্ট নিওরো সার্জন তিনি। পশ্চিমী দেশসমূহের ডাক্তারদের সঙ্গে সখ্যতা রেখে চলেন। স্টালিনের মৃত্যুর কিছু আগে তিনবছরের জন্য রাজনৈতিক কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এলে তিনি এই ডাক্তারকে পুনরায় তার স্বমহিমায় এনে বসান।

সেদিন রাত্তিরে অভাবিতভাবে আমার ন্যাশনাল হোটেল রুমে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং ওব্রাজট। রাত তখন নটা। আমি যখন দরজা খুলে দিলাম তখন চেয়ে দেখি সেই ডাক্তার মহিলা তাঁর ঘরের দরজা খুলে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি তার মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমি অনুসন্ধিৎসু নয়নে চাইতে ডাঃ ওবরাজট বেশ নার্ভাসভাবেই বলে উঠলেন, ডাঃ ডিলেটুর, এদিকে আমাদের প্ল্যান একটু পালটে ফেলতে হয়েছে। কাল সকালে প্রফেসর ল্যাণ্ডাউকে আপনিই অপারেশন করবেন।

—কেন? ডাঃ কুশকোভোর কি হল?

তিনি চারদিকে তাকিয়ে কোন গুপ্ত মাইক্রোফোন আছে কিনা তা লক্ষ্য করলেন। এম. ভি. ডি-র অসাধ্য কিছু নেই। পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, ডাঃ কুশকোভো দেশত্যাগ করে চলে গেছেন। সীমান্ত পার হয়ে সম্ভবত পোল্যাণ্ডে চলে গেছেন। মনে হয় তিনি পশ্চিম জার্মানী চলে যাবেন। তিনি আপনার খুব প্রশংসা করেছিলেন। প্যারিসে অনবদ্য আপনার কার্যাদির খবরাখবর তিনি রাখতেন। আমার মতে প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ-র জীবন এখন আপনার সুদক্ষ হাতের উপরেই নির্ভর করছে...।

আমি নিরুত্তরে তাকিয়ে রইলাম শুধু। পরদিন সকাল ৭-৩০। আমি গিয়ে অপারেশন রুমে প্রবেশ করলাম। সেখানে সাদা অ্যাপ্রন পরা প্রচুর নরনারী প্রতীক্ষারত ছিল। আমি ঘরে ঢুকতে তাদের গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। সার্জিকাল মুখোশের ফাঁকে তাদের দৃষ্টিগুলি একযোগে আমার প্রতি তীক্ষ্ণতর হয়ে নিক্ষিপ্ত হল।

আমি একে বিদেশী, তার উপর কিনা এম. ভি. ডি-র প্রিজনার, আর অজ্ঞাত পরিচয় বটে। সেই আমাকে কিনা মহা মহা ভি. আই. পি. ল্যাণ্ডাউ-র অপারেশনের ভার দেওয়া হয়েছে। নিদারুণ একটা শংকাশিহর দায়িত্ব। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগলো। অনেক কষ্টে নিজেকে ফের নর্মাল করে তুললাম। এ টেনসনের বুঝি তুলনা নেই।

এই দলে দাঁড়িয়েছিল সেই তথাকথিত রক্তবিশারদ হাতুড়ে মহিলাটি যাকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না।

আমি ডাঃ ওব্রাজটকে দিয়ে তাকে ঘরের বাইরে বার করে দিলাম। প্রথমটা ডাক্তার রাজী হননি, কেননা মহিলাটির ওপর মহলে যথেষ্ট হাত আছে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার কথা রাখতে বাধ্য হল।

মহিলা ডাক্তারটি তীব্র ঘৃণিত দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুযোগ পেলে সে আমাকে ছাড়বে না এ রকম ভাব। আমি হাতুড়ে নিয়ে কাজ করব না। এ ধরনের একটা সাংঘাতিক অপারেশনে ওর মত লোকের সাহায্যকে বিশ্বাস করা যায় না কোন মতেই।

ও টি-র দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রফেসর ল্যাণ্ডাউ-র জটিল অপারেশনের জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক খারাপ দৈহিক অবস্থা দেখলাম প্রফেসরের। বলতে গেলে তিনি বর্তমানে একটি সব্জি বা ভেজিটেবিল স্বরূপ। তিনি কথা বলতে পারেন না। সম্পূর্ণ অন্ধ, একেবারে কালা…কোন ইন্দ্রিয়ই বুঝি কাজ করছে না তাঁর।

উপুড় করে তাকে শোয়ানো হয়েছে অপারেশন টেবিলের ওপর। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র রবার টাম্বারের দ্বারা এসেছে। এ যন্ত্রকে আমি পায়ের সাহায্যে চালাব। তিনজন ডাক্তার আমায় সহায়তা করবে। অপারেশন টেবিলের ডাইনে বাঁয়ে বিভিন্ন ছুরি কাঁচি যন্ত্রপাতি নিপুণভাবে সাজানো রয়েছে।

একজন সহকারী এক সিরিঞ্জভর্তি লোকাল অ্যানেস্থেটিক আমার হাতে তুলে দিল। অপর একজন মাথার খুলি কামিয়ে তাতে আইওডিন পেইন্ট করে দিল। মাথার পেছন দিকটা প্রথমে কেটে ফেললাম। মনে মনে প্রার্থনা, আমার হাত যেন নিষ্কম্প থাকে, স্টেডি থাকে। আমার প্রতিটি কার্যক্রমে শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আমার চতুর্দিকের মানুষেরা। প্রথম ইনসিসনে সামান্য পরিমাণ রক্ত বেরিয়ে এল। সহকারী একজন ডাক্তার তুলো দিয়ে সেটা মুছে নিল। আমার বুকের মধ্যে ভয় যেন তোলপাড় করে উঠছে। প্রচণ্ডগতিতে দপ দপ করছে তা।

একজন নার্স আমার হাতে একটি স্কালপেল্ (সার্জিকাল ক্ষুদ্র ছুরি) তুলে দিল। পরবর্তী ইনসিসন করলাম পেরিওস্টেয়াম পর্যন্ত। ব্লাডভেসলকে ফরসেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত রক্তপাত না হয়। এরপর আমি ড্রিল চাইলাম।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো দুজন এম. ভি. ডি. এজেন্ট। তাদেরও পোষাক শ্বেতশুভ্রই। ভয়ে আমার হাত কেঁপে গেল কিঞ্চিৎ। সামলে নিলাম, এটা কি আমার প্রতি হুঁশিয়ারী? ল্যাণ্ডাউ পুনরায় মৃতাবস্থার কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি যদি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, তাহলে? মনের মধ্যে নানান চিন্তা পাক খেতে লাগলো।

মুহূর্তে তা সামলে নিয়ে ফের পেশাগত দায়িত্বে ফিরে এসে মন হয়ে গেল কুলিশকঠোর শান্ত। আমার হাতের ড্রিল নিঃশব্দে ক্ষুদ্রবৃত্তাকারে মাথার হাড়কে কেটে ফেললো। তিন সেন্টিমিটার দূরে আবার আরেকটি গর্ত করলাম।

"—ফরসেপস্।"

নিজের জরুরী এবং কর্কশকণ্ঠ ধ্বনীত হল। আমি এবার হাড়ের চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলিকে তুলে এনে একটা ছোট পাত্রে সঞ্চিত করলাম। উষ্ণ স্যালাইন-জলে সেই হাড়ের গর্তগুলো ধুয়ে দিলাম। অ্যাসপিরেসন যন্ত্র দিয়ে তরল পদার্থ-সমূহ 'সাক' করে আনলাম। ভিজে কমপ্রেস করলাম খুলির গর্তদ্বয়ে।

এবার সবচেয়ে কঠিন অবস্থা সমুপস্থিত হল। এ অপারেশনে অকৃতকার্য হওয়ার কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না। আমার অস্ত্রোপচারকালীন প্রফেসার ল্যাণ্ডাউ-র মৃত্যু হতে পারে না, হতে দেব না। হলে তার পরিণতি আমার পক্ষে হবে বিধ্বংসী।

আমি তারের করাত চেয়ে পাঠালাম। খুলি কেটে ব্রেইন উন্মুক্ত করব এখন। নিজের মনেই নিজ সম্বন্ধে সাবধান বাণী ধ্বনিত হল, হুঁশিয়ার ডিলেটুর, স্টেডি হও। স্টেডি। আমি অনুভব করতে পারছি আমার ওপরের ঠোঁট ঘেমে গেছে। অতি ধীর স্থির অচঞ্চল চিত্তে ও দক্ষ আঙুলে করাত দিয়ে কর্তন কার্য সমাপন করলাম। চকিতে একবার দেওয়ালের ঘড়ির পানে তাকালাম। ১১-৩০ মিঃ। তিন ঘন্টার ওপর অপারেশন করে চলেছি ...

মাথার খুলি সরাতে আমার অকস্মাৎ জমে যাওয়া নার্ভহীন আঙুলের সামনে নিরাবরন ব্রেইন উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। আমার ইশারায় একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যাণ্ড বাঁধা ইলেকট্রিক আলো আমার কপালে লাগিয়ে দিল। কড়া অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মেনিংস, ব্রেইনকে আবৃত করা তিনটি মেমব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ড।

ডাঃ ডিলেটুর, আমি পাল্‌স্ পাচ্ছি না।

বজ্রপাতের মত এই লাইনটি কানে আসতে আমার দেহমন ক্ষণিকের জন্য অবশ হয়ে গেল। ল্যাণ্ডাউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এই পজিসনে তাঁকে কোন মতেই অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব নয়। আর ওকে সরানোও যাবে না এখন।—শক্ মেসিনটা নিয়ে আসুন, দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম, পেশেন্ট-এর ডান পায়ের গোড়ালীতে ইলেকট্রডটা লাগিয়ে দিন।

তাই হল। এই মেশিনটা এখন কাজ করলে হয়। এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমায় বিশদভাবে বলা হয়েছিল। রোজা শালফ নামে একজন সোভিয়েত মহিলা ডাক্তার এটা উদ্ভাবন করেন। এখন রোজা বিচক্ষণতার সঙ্গে এর ডায়েল ঘুরিয়ে দিতে আমি খুব আলতো স্বরে একটা গুনগুন শব্দ শুনতে পেলাম। মেশিন চালু হয়েছে। পেশেন্টের দেহে কিন্তু কোনপ্রকার রি-অ্যাকসন পরিলক্ষিত হল না।

আমি নিজের দু'হাতের আঙুল বজ্রমুষ্টিতে ধরে প্রার্থনা করতে থাকলাম। আঙুলগুলো বুঝি লোহার হয়ে গেছে। অনুভূতি নেই।

এম. ভি. ডি. এজেন্টদের দৃষ্টিতে অভিযোগ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেমন ক্রুদ্ধ ঘোরালো চাউনি তাদের।

হে ঈশ্বর। পরম করুণাময় ঈশ্বর, এতে যেন ফল ফলে। মেশিনটা যেন কার্যকরী হয়, ফলবতী হয়।

গুন গুন ধ্বনিটা যেন দুবার ফেল করল, ধাক্কা খেল। ডাঃ শালফ আরেকটা সুইচ টানলো···আবার গুন গুন শব্দ শুরু হয়ে গেল একটানা। অকস্মাৎ দেখলাম লেভ্ ল্যাণ্ডাউ-র ডান কাঁধটা মৃদু কেঁপে কেঁপে উঠলো বারেক।

আবার তাহলে বেঁচে উঠেছেন এই মহামান্য প্রফেসর। ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমাকে।

—ডাঃ ডিলেটুর, আপনি পুনরায় অপারেশন চালিয়ে যেতে পারেন, রোজার শান্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক সুমধুর কণ্ঠ যেন কানে সুধা-বর্ষণ করলো আমার। ধন্য এই মেয়ে ডাক্তার, ধন্য তার মেসিন।

ব্রেইনের যে অংশটা মানুষের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে কিছুটা জমাট রক্ত চেপে বসে আছে লক্ষ্য করলাম। সাক্সন মেশিনের দ্বারা সে রক্তটাকে বের করে এনে স্থানটা পরিষ্কার করে দিলাম। একই প্রক্রিয়ায় প্রফেসরের চিন্তাধারা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণকারী স্থানগুলোকে রক্তমুক্ত করলাম। পুনর্বার যখন আমি পেশেন্টের মাথার খুলিকে যথাযথ স্থানে বসিয়ে সেলাই করছি, তখন মনে হল, দুটো পা আমার যেন দুটো জমে যাওয়া অতি ক্লান্ত স্তম্ভের মত হয়ে গেছে।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলাম, গুড গড্, এখন বেলা ৩-৩০ মিঃ। আমি তাহলে একটানা সাত ঘণ্টা অপারেশন করেছি।

বাহুদ্বয়ও আমার কাঠের মত অসাড় হয়ে গেছে। আঙুলগুলোও সম্পূর্ণ অসাড়। রক্তমাখা অ্যাপ্রন ও মুখোশ খুলে ফেলবার উদ্দেশ্যে ও. টি. থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ধোয়া মোছার রুমে আমার জন্যে একজন লোক অপেক্ষা করছিল। কুলিশ-কঠোর নির্দয় হাবভাব। ইনি সেই এম. ভি. ডি. এজেন্ট যিনি কাল আমায় হোটেল রুমে গিয়ে হুঁশিয়ারী সহ জ্ঞান দিয়েছিলেন। আমাকে ফের সেই পিটার অ্যাণ্ড পল দুর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন ইনি?

আমি মরণ ক্লান্তি সহ একটা চেয়ারে বসে পড়তে সেই এম. ভি. ডি. ম্যানের গলা কানে এল।

—আপনার ফ্রেঞ্চ পাশপোর্ট ভ্যালিড এক্জিট ভিসার স্ট্যাম্প সহ কাল সকালে আপনার হোটেলের ডেস্ক-এ পৌঁছে দেওয়া হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে সোভিয়েট ইউনিয়ান ছেড়ে চলে যেতে হবে···।

—আমি মুক্ত ! আমি স্বাধীন···

পরদিন সন্ধ্যায় আমি প্যারিস-এ এসে প্লেন থেকে নামলাম। অবশেষে যেন অনন্তকাল পরে, আমার স্ত্রী ও ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। পশ্চিম ইয়োরোপের কোন পত্র-পত্রিকায় লেভ্ ল্যাণ্ডাউ এবং তাঁর জীবনমরণ সংকটের সংবাদ বা তাঁকে বাঁচাবার আজগুবি প্রচেষ্টা-বিষয়ক কোন সংবাদই বের হয়নি।

অতঃপর ১৯৬২-র নভেম্বরে স্টকহলম্ থেকে সরকারীভাবে ঘোষিত হল যে, রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক লেভ্ ল্যাণ্ডাউকে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

তখনই আমি জানতে পারলাম যে, প্রফেসর প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন পুনরায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের পাঠ নিচ্ছেন তিনি এবং হাসপাতালের করিডোরে পঞ্চাশ-ষাট ফিট পর্যন্ত কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে পারছেন। তাঁর বাকশক্তি যদিও একটু বাধো বাধো, তাহলেও ফিরে এসেছে। দিনে দুবার দীর্ঘক্ষণব্যাপী ফিজিওথেরাপী নিচ্ছেন তিনি। সোভিয়েত মেডিকালম্যানরা আশা করছেন যে ছ'মাসের মধ্যেই প্রফেসর তার ল্যাবরেটরীতে ফিরে যেতে পারবেন।

আমি আনন্দিত, এই ভেবে যে তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে আমারও হাত ছিল।

খর্বকায়, কুৎসিৎ-দর্শন এক স্কচ, যাকে দেখে রবার্ট লুই স্টিভেনসন, তার প্রখ্যাত চরিত্র "ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড" কল্পনা করেছিলেন, যে বিজ্ঞান পাগল ব্যক্তি শব অপহরণের জন্য গুণ্ডা ভাড়া করতেন, যার ব্যক্তিগত মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকতো বিভিন্ন তরুণীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশ্বের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক ডাঃ জন হান্টারের লোমহর্ষক কাহিনী এটি।

লণ্ডনের 'গোল্ডেন বাক্' নামক পানশালায় সেদিন যেন একটা ঝিমুনি ভাব এসেছিল। খদ্দেরদের মনে উৎসাহ নেই। পান করতে হয়, তাই পান করছে, এমনিভাবে সবাই প্রায় নিজ নিজ সুরাপূর্ণ পাত্রে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিল।

হেনকালে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো সেখানে। অধোন্মাদ, ভিখিরী, পালোয়ান, ষণ্ডাগুণ্ডা ও খামখেয়ালী লোকে ভরা তখনকার লণ্ডন নগরীতেও লোকটির চেহারা দেখে চোখে মনে রঙ ধরা খদ্দেরদের দৃষ্টিতেও বুঝি নতুন ঠেকল। লোকটি বেঁটে, মোটা, বদরাগী, চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যেন ঠিকরে পড়ছে, নাকটা ঈগল পাখির মত, রক্তবর্ণ কেশরাশি, তার উপরে পরনে লাল ভেলভেটের স্যুট, তাতে বিক্ষিপ্তভাবে লেগে রয়েছে নানাপ্রকার দাগ। বেশিরভাগই দ্রুতগতিতে সমাপ্ত করা আহারের সময়কার খাদ্যদ্রব্যের দাগ।

গটগট করে লোকটি পানশালার মালিকের কাছে এগিয়ে গেল। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ভাব তাঁর আচার-আচরণে। অতঃপর গভীর স্কচ—উচ্চারণে বললে, মাই ভাররা গুড চ্যাপ্, হে বৎস, আমায় একটি মহিলা দিতে পার? না-না, মনে রেখো কোন সাধারণ গণিকা আমি চাই না। আমি চাই এমন একটি মেয়ে, যে প্রকৃতই রোগে ভুগছে।

পানশালার মালিক স্যাম টাবস্ কৌতুকস্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল, আপনি কি পরিহাস করছেন স্যার? সোজাসুজি বলুন কি ধরনের মেয়ে আপনি চান?

আগন্তুকের রগ-চটা মুখ ক্রোধে লাল হয়ে গেল।

—তুমি একটি আকাট নির্বোধ। ইডিয়ট। প্রায় চিৎকার করে উঠলো আগন্তুক, আমি এমন একটি স্ত্রীলোক চাই যে, 'ফ্রেঞ্চ পক্সে' ভুগছে, 'স্পোর্টিং ডিজিজ' বুঝলে এবার? আমি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাবিষয়ক এক পরীক্ষা চালাচ্ছি। আমি চেম্বারে নিয়ে রুগ্ন একটি রোগিণীকে পর্যবেক্ষণ করতে চাই।

পানশালা মালিকের আবেগহীন মুখাবয়বে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি

ফুটে উঠলো। হল-এর মধ্যে বসে থাকা পানরত খদ্দেরদের উদ্দেশ্য করে পরিহাস তরল কণ্ঠে সে বলে উঠলো, শুনছেন ভদ্রমহোদয়রা। এই ভদ্রলোক এমন একটি পণিকা মেয়ে চাইছেন যে, 'স্পোর্টস' রোগে ভুগছে। ভাবুন একবার ঐ রকম সাংঘাতিক রোগগ্রস্তা একটি মেয়ে চাইছেন ইনি।

তারপর আগন্তুকের দিকে ফিরে বললে, এই মুহূর্তে এখান থেকে কেটে পড়ুন স্যার। এটা একটা অভিজাত পানশালা। যেসব মেয়েরা এখানে আসে তারা আমার মত আপনাকে একটা আস্ত-মুর্খ ভাববে।

বেঁটে-খাটো গোলগাল আগন্তুক ক্রোধে যেন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। হাস্যকর পোষাক সহ তাকে মনে হতে লাগলো আজগুবি একটা ব্যাঙের মত। কাউন্টারে ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে গ্লাস-বোতল ও ডিকান্টারসমূহে জল-তরঙ্গের শব্দ-তুলে ফেললে। গর্জন করে বলতে লাগলেন, তুমি একটি আস্ত গাধা। সিলি অ্যাস্। আমার নাম হল জন হান্টার। আমি একজন শল্যচিকিৎসক এবং নামকরা চিকিৎসক, বুঝলে, হাঁদারাম? ঐ ধরনের মেয়ে আমার প্রয়োজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে। আমায় ঐরকম একটি মেয়ে সংগ্রহ করে দাও, তাহলেই আমি তোমার সমস্ত অভদ্রতা ক্ষমা করবো এবং ভুলে যাব। আর তা না পারলে আজ তোমায় আমি বেতিয়ে ঢিট করে যাব।

পানশালার মালিক চরম অপমানিত হয়ে ঘৃণাভরে একদলা থুথু ছুঁড়ে মারলো ডাক্তারের জুতো লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হাতের লিকলিকে বেতের ছড়িটা তুললো ওকে প্রহারের উদ্দেশ্যে। ছড়িটার মাথায় আটকানো রয়েছে একটি মৃত শিশুর করোটি। শিশুটি কিছুদিন আগে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে মারা যায়।

সাঁই করে বেতটি গিয়ে আঘাত করলো পানশালা মালিকের বাঁ কানে। বেদনায় ও ক্রোধে চিৎকার করে উঠলো সে। জনা বারো মত্ত খদ্দের মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল ডাক্তারের দিকে। অতঃপর তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রবল হাস্যরোল উঠলো পানশালার টেবিলে টেবিলে।

ভূপতিত অবস্থা থেকে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো। পোষাক ও সিল্কের মোজা থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেললো। তারপর ঘুষি বাগিয়ে পানশালার মালিককে উদ্দেশ্য করে গর্জে উঠলেন, স্যাম টাবস্! জেনে রাখ্ তুই নিজেই সাংঘাতিক অসুস্থ। তোর মুখ আর গায়ের চামড়ার রঙ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। বলে দিলাম শুনে রাখ, তিন মাসের মধ্যেই তোর মৃত্যু হবে। অতঃপর তোর শবদেহ আমি নিয়ে যাব আমার চেম্বারে। তোর কঙ্কাল দিয়ে আমার ছাত্রদের শিক্ষাদান করবো। বলবো, এ হল এমন একটি লোকের স্কেলিটন, যে জীবিত অবস্থায় ভদ্রতা কাকে বলে জানতো না।

শোঁ করে একটা কাচের পানপাত্র এসে লাগলো ডাক্তারের টুপিতে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেশ অভিজাত সম্ভ্রমের সঙ্গে ডাক্তার গিয়ে আরোহণ করলো

রাস্তায় দাঁড়ানো কিম্ভূতাকৃতি একটি আজব শকটে। পুরোপুরি কাঠের চাকা সমন্বিত সে গাড়িটি টানছে তিনটি মহিষে। এরা শল্য চিকিৎসকের নিজস্ব চিড়য়াখানার প্রাণী। ১২ নং গ্রীন স্ট্রীটের পনের লক্ষ টাকার প্রাসাদ ও বীভৎস-ভয়ংকর চেম্বারের পথে গাড়িটি এগিয়ে গেল। সেটা ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।

স্যাম টাবস্ সম্বন্ধে ডাঃ হাণ্টারের ভবিষ্যদ্বাণী করুণভাবে ফলে গেল। তিন দিন বাদে একটা মদের গামলা তুলতে গিয়ে টাবস্ হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল। মুখ ছাইএর মত বিবর্ণ হল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টসহ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই "কঞ্জেস্টিভ হার্ট" ফেলিওরে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

পানশালা মালিককে সমাধিস্থ করার কয়েক ঘন্টা বাদেই দেখা গেল তিনজন লোক সেই মহিষটানা একটি শকটে করে কবরখানার অভিমুখে চলেছে। সেখানে পৌঁছে ব্যাঙের মত আকৃতির ডাঃ হাণ্টার গাড়ি থেকে অবতরণ করে, সদ্য দেওয়া কবরটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পা দিয়ে ফুল-লতা-পাতা সরিয়ে দিয়ে তারের বেড়া কেটে দিলেন।

—তুলে ফেলহে ব্যাটাকে। রাত বেশি নেই, ফ্যাসফেসে কণ্ঠে ডাক্তার সঙ্গীদের বললেন, যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক আগেই বেচারাকে পেয়ে গেলাম।... ব্যাটার বড় মুখ ছিল। যাক গে, সেসব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আমার শব ব্যবচ্ছেদ ক্লাসে প্রায় মাস খানেক ধরে হার্টের রুগীর একটি মৃতদেহের সবিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মিঃ টাবস্-কে পেয়ে ছাত্ররা খুশীই হবে।

পরদিন সকাল আটটা। সারা ইয়োরোপ এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ডাঃ হাণ্টারের কাছে শিক্ষারত জনা কুড়ি অভিজাত চেহারার তরুণ ছাত্র, সোৎসুক নয়নে দেখতে লাগলো ডাঃ হাণ্টার হাতের অস্ত্রোপচারের তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে মৃতদেহটার বুকের কাছটা চিরে ফেলছেন।

—এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত প্রত্যঙ্গ, স্কচ চিকিৎসাবিদ ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বলে উঠলেন, বেঁচে থাকতে মিঃ টাবস্ খুব উদার হৃদয় ছিলেন না। কিন্তু দেহের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ডটাই অথচ ছিল অস্বাভাবিক বৃহৎ। তরুণ বন্ধুগণ, এটা প্রকৃতই 'ভেরি-লার্জ' 'এবং রুগ্ন প্রত্যঙ্গ ছিল ওর।' তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে আমাদের এ উপকার করবার জন্য মিঃ টাবসের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ছাত্ররা কিন্তু সিরিয়াস। কিন্তু ডাঃ হাণ্টার যেন পরিহাস মগ্ন। সেই মুহূর্তে তিনি আরও উনিশ জন নর-নারীর আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিলেন, যাতে করে, তাদের শব ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হাড়সমূহ সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিজস্ব চিড়িয়াখানায় কখনো বাঘকে পরীক্ষা করেন, টেমস নদীতে ধৃত এক তিমিকেও তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন। এমন কি ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্যে একবার নিজদেহে ভি ডি (যৌন ব্যাধি) বীজাণু পর্যন্ত প্রবেশ করিয়েছিলেন (যার

পরিণাম হয়েছিল অতীব শোচনীয়। (যেটা আমরা পরে প্রমাণ পাব)।

ডাঃ জন হান্টার যেন রহস্য-রোমাঞ্চ গ্রন্থের একটি রোমহর্ষক চরিত্র। তাঁর দুঃস্বপ্নসম বিদ্যালয়ই রবার্ট লুই স্টিভেনসনকে তাঁর 'ডঃ জেকিলের' লেবরেটারি চিত্রণে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' ও এই অর্ধোন্মাদ ডাক্তার হান্টরের অনুকরণেই কল্পিত। লুই স্টিভেনসন তাঁর নায়ককে "মেডিসিনের শেক্সপীয়র" রূপে বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, "সামান্য কিছু তঞ্চকতা ছাড়া সে ছিল তাঁর পেশার জগতে এক মহান ব্যক্তি"। অবিকল ডাঃ হান্টারের চরিত্র।

স্কটল্যাণ্ডের নিজ গ্রাম ইস্ট কিলব্রাইডের মেয়েরা জন হান্টার নামক 'ভয়ংকর কুৎসিৎ' একটা ছেলের বিরুদ্ধে প্রায় একই প্রকার নালিশ জানাতো। তারা বলতো যে, ঐ জঘন্য ছোঁড়াটা, যখন তারা স্নানের জন্য বিবস্ত্রা হত, সে সময় সে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাদের দেখতো। নচ্ছার পিপিং টম।

একদা যখন এই পনের বছর বয়সের ছেলেটা স্নানরতা একটি বিবস্ত্রা বালিকার কুঠুরির ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সে সময় জনৈক ক্রুদ্ধ-পড়শী ওকে হাতে নাতে পাকড়াও করে। হান্টার ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বলে, আমি ভবিষ্যতে যে ডাক্তারী বই লিখবো, তাতে ছাপাবার জন্য মেয়েটার বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এঁকে নিচ্ছিলাম।

দেখতে দেখতে সেখানে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মারমুখী এক জনতার ভীড় জমে গেল। কিশোর জন হান্টারকে তারা একটা গাছের সঙ্গে দাড় দিয়ে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো। তারপর শহরের কনস্টেবল—'ওর নিজের কুৎসিৎ মনের আনন্দের খোরাকের জন্য, মেয়েদের বিবস্ত্র দেহের দিকে উঁকি মারবার অপরাধে, সমুচিত শিক্ষা দেবার প্রয়াসে' —ওর উন্মুক্ত পিঠে কুড়ি ঘা চাবুক মারলো।

প্রহার জর্জরিত ছেলেটিকে সবাই ভুল বুঝলো। ছেলেটি মানুষের দেহতত্ত্ব, বিশেষ করে যৌনতত্ত্ব-সম্বন্ধে সবিশেষ উৎসুক ছিল শুধুমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজনে। কোন বিকৃত কামনার তাড়নায় নয়। প্রকৃতির অপরাপর বিষয়বস্তুর প্রতিও তার কৌতূহলের সীমা ছিল না। ছেলেবেলায় সে অহরহ বাড়িতে নিয়ে আসতো জন্তু জানোয়ারদের পচা চামড়া, গরু-মোহিষের হাড়, মরা পাখি, পচা গলা মাছ এবং আরও অনেক প্রকার দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু। বাবা রেগেমেগে সেগুলো সব দূর করে ফেলে দিতেন।

যোল বছর বয়সে—'বাগ মানানো যায় না'—বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করে দিল। শিক্ষণযোগ্য ছেলে নাকি আদৌ সে নয়। শাপে বুঝি বর হল। পরবর্তী জীবনে উন্নতির পথ এইভাবে তার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

গ্রামের গীর্জার পাশে কাঠের একটি উচ্চ টাওয়ার ছিল। তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকত একজন প্রহরী। নতুন দেওয়া কবর থেকে শব যাতে না ডাকাতরা

চুরি করতে পারে, সে দিকে সে লক্ষ্য রাখতো।

এক গভীর রাত্রে, অর্ধ নিদ্রারত অবস্থায় সেই প্রহরীকে কে যেন পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে, তার চোখ, হাত-পা দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে ফেললো। আততায়ী যদিও নিষ্ঠুরভাবে তাকে বন্দী করে ফেললো, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল অতি কোমল। সে বললে, ম্যাকলয়েড জোরজবরদস্তি করো না, তাহলে তোমাকে জখম করব না। তোমায় কবরখানায় আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং তা এখুনি। চুপচাপ এখানে এ অবস্থায় পড়ে থাকো। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমি কাজ সেরে ফিরে আসছি।

পর দিন সকালে পথচারী জনৈক ব্যক্তি প্রহরী ম্যাকলয়েডকে বন্ধনমুক্ত-করতে সে একটি সদ্য খোঁড়া কবরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, ঐ দেখুন সেই হান্টার ছোঁড়াটার কীর্তি। যদিও ওর চেহারা আমি চোখে দেখতে পাইনি কিন্তু ওর গলা আমি ভালভাবেই চিনি। ছোঁড়াটা বোধহয় আবার তার এক জঘন্য পরীক্ষার জন্য এই কাজ করেছে। বসন্ত রোগে মরে যাওয়া হতভাগ্য ওথরির মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে গেছে।

যথারীতি হান্টার প্রবলভাবে মাথা নেড়ে উক্ত শব চুরির কথা অস্বীকার করলো। কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা হান্টারদের বার বাড়ির একটা প্রকোষ্ঠে এসে সেই শব আবিষ্কার করে ফেললো। শবের হাত-পা কেটে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে বললেন, জন ছেলেটা বাড়াবাড়ির শেষ সীমায় পৌঁচেছে। রোগ বিষয়ে জানবার জন্য মানুষ কাটবে, বটে! এ ছেলেটা হল শয়তানের বাহন। তিন বছর জেলে থাকলেই ওর সমুচিত শিক্ষা হবে।

কিন্তু রায়দান কার্যকরী করতে ম্যাজিস্ট্রেটের বুঝি কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই হান্টার গাঁ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দু'সপ্তাহ ধরে বিপদ ও কষ্টসংকুল পথ হেঁটে সে গিয়ে উপস্থিত হল তার দাদার কাছে লণ্ডনে। দাদা উইলিয়াম একজন শল্য-চিকিৎসক। বেশ নামযশও হয়েছে তাঁর সে সময়।

দাদা যখন দেখলেন নোংরা, জীর্ণ পোষাক পরিহিত শীর্ণকায় ছোটভাই স্কটল্যাণ্ড-থেকে পালিয়ে লণ্ডনে এসেছে ডাক্তারী শেখবার জন্যে, তখন অভিজাত উইলিয়াম হান্টার নিজ পকেট থেকে সুগন্ধী রোমাল বের করে নাকে চাপা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে বললেন, এই নে এক গিনি। গায়ের ঐ নোংরা র‍্যাগ্‌গুলি খুলে ফেলে দে। নতুন পোষাক কিনে নিয়ে আয় এ অর্থ দিয়ে। সাবান মেখে ভালভাবে দেহ পরিষ্কার কর! ওহ্ গড্। একি জঘন্য নোংরা ছেলেরে বাবা। আমি তোকে প্রথমে পুরো সহবত এটিকেট শিক্ষা দেব। পরে শিক্ষা দেব কিছু শল্য বিজ্ঞান। তবে আমার মনে হয় সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে। তুই কোনদিন ডাক্তার হতে পারবি বলে তো আমার মনে হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সরাসরি নিন্দা ও ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী কালে যে মিথ্যা

প্রমাণিত হয়েছিল সে কথা ইতিহাসই প্রমাণ দেয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডনে নাপিত সম্প্রদায়ই শল্য চিকিৎসকরূপে গণ্য হত। তারা ছুরি-কাঁচি-কাঁটা- সূঁচ প্রভৃতি নিয়ে রক্তাক্ত রোগিদের অস্ত্রোপচার সাধন করতো। বিজ্ঞ ডাক্তারগণ পর্যন্ত সে সময় যত সব আজগুবি ব্যাপার বা ঘটনায় বিশ্বাস করতো।

যেমন জনৈক পোষাক-ব্যবসায়ীর স্ত্রী মেরি টফট নাকি একযোগে ছয় ছয়টি খরগোস বাচ্ছা জন্মদান করেছে। অথবা মিসেস গেইল ফ্রেণ্ড-নামে এক মহিলার দুটি শিং গজিয়েছে কিংবা কর্নিশ সেই মায়ের কথা, যে একবার একটি মাছ প্রসব করেছিল।

জন হান্টার 'কক্‌ড হ্যাট-ইন'-এ বয়-এর কাজ নিল। সেখানে আসতেন প্রখ্যাত পুরুষ-ধাত্রী স্যার রিচার্ড বডিংহাম। তাঁর সর্বশেষ ডাক্তারী যাদু-সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী শুনতো বালক হান্টার।

স্যার রিচার্ড বডিংহাম একদা বললেন, বিশ্বাস করুন, এটা সত্যি ঘটনা। সেই আজব প্রাণীটির জন্মকালে আমি স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। সেটাকে বলে 'মডিওয়ার্প' দেখতে ঠিক অক্টোপাসের মত, দশবারোটা ভয়াবহ পা। আর পুঁতির মত চোখ। সমুদ্রপ্রাণীর মত সে একটা 'জলভর্তি' বালতীতে বাস করছে এখন। উঃ বেচারা মাদাম কুইগ্‌লি, এমন একটা ঘৃণ্য জীবের মা হতে হল কিনা তাঁকে।

—আচ্ছা স্যার রিচার্ড, এধরনের দানবাদির জন্ম হয় কেন? সরলভাবে হান্টার জিগ্যেস করে।

—আমার মনে হয় বিকৃত কোনপ্রকার যৌন-বিবাহের ফলেই মডিওয়ার্প জাতীয় সন্তানের জন্ম হয়।

সহসা প্রায় ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে হান্টার বলে ওঠে, কিছু মনে করবেন না স্যার। আপ-নাকে আমার একজন বৃদ্ধ প্রতারক বলে মনে হয় স্যার রিচার্ড 'মডিওয়ার্প'? যত-সব গাঁজাখুরি গাল গপ্পো। মানুষের পেটে এই ধরনের জীবের জন্ম হওয়া পুরোপুরি অস্বাভাবিক, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও কাল্পনিক ঘটনা। আপনি তাহা মিছে কথা বলছেন।

সামান্য একজন বয়-এর মুখে এত বড় আস্পর্ধার কথা শুনে মাননীয় পুরুষ-ধাত্রী সাহেব, স্বর্ণমুণ্ড শোভিত তার হাতের লাঠিটা সশব্দে বার কয়েক মেঝেতে ঠুকে সগর্জনে বলে উঠলেন, তুই একটা বদমাইস স্কটিস রাস্কেল। তোর এত বড় আস্পর্ধার জন্যে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। জেন্টলমেন। আপনাদের যে কেউ এই বাঁদরটাকে এখান থেকে যে ছুঁড়ে দিতে পারবেন তাকে আমি নগদ এক গিনি পুরস্কার দেব।

চেয়ার টেবিল উল্টে পাল্টে যদিও প্রবলভাবে বাধাদানের জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করলে। হান্টার, তবু চারজন বলিষ্ঠ বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে কেন, তাঁরা

তাকে যথা সময়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

এক যুগের মধ্যেই সেইসব বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই কিন্তু পুনরায় ডাঃ জন হান্টারের দরজায় ধর্ণা দিয়েছিল, নিজেদের নানাপ্রকার চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায়, স্খলপক্ষ থেকে নারীদের বন্ধ্যাত্ব—নানা রোগের জন্যেই উপদেশ নির্দেশ নিয়ে গেছে তারা ডাঃ হান্টারের কাছ থেকে।

অত্যন্ত কেতাদুরস্ত পোষাকআশাক পরিহিত অগ্রজ ডাঃ উইলিয়াম হান্টার টেবিলের ওপর শোয়ানো একটা মৃত দেহের দিকে হাতের পাইপ দিয়ে নির্দেশ করে বললেন, নে গেট রেডি জন। এবার আমি তোর শব ব্যবচ্ছেদ করা দেখতে চাই। বহুবার তুই আমার শব ব্যবচ্ছেদের কাজ দেখেছিস। এবার যদি না পারিস তো তোকে এ লাইন থেকে তাড়িয়ে কোন ফার্নিচার মেকারের দোকানে কাজে লাগিয়ে দেব।

এমনিতে জনকে একটা অতি বাজে ছেলে বলে ধারণা হয়। কিন্তু হাতে অস্ত্র তুলে নিলে সে যেন একজন অদ্ভুত দক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠে। যখনি সে কাজে লাগলো, ডুবে গেল ব্যবচ্ছেদ কর্মে। তার নিখুঁতভাবে কাজ করা দেখে দাদা ডাঃ উইলিয়াম সপ্রশংস ও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নিখুঁত ও চমৎকারভাবে এই স্কটিশ তরুণ চামড়া পেশী, উপশিরা, শিরা প্রভৃতি চিরে চিরে উন্মুক্ত করতে লাগলো। এক সময় মৃতদেহের পেশীসমূহ ভালভাবে উন্মোচিত হল। অগ্রজের পানে তাকিয়ে জন সসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করে, কেমন হল দাদা?

—চমৎকার, মার্ভেলাস, সাবাস। খুব খুশি হলাম ভাই, ডাঃ উইলিয়াম বললে, তোর ঐ কুৎসিত হাত যেন যাদু জানে! এবার থেকে ভালভাবে আমার কাছ থেকে আরও কিছু শিখে নে। আমি তোকে সার্জন তৈরী করে দেব। কিন্তু এইটেই আমার স্টকে-থাকা শেষ শব। দ্বিতীয় কোন শব পেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। অথচ সামনের বৃহস্পতিবারেই কতগুলো ছাত্র আসবে নতুন ক্লাসে শরীর-বিদ্যা শিখতে।

জন হান্টার পকেট থেকে এক খণ্ড রুটি বের করলো। মনেই রইল না তার যে মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি তফাতেই পড়ে রয়েছে ক্ষত-বিক্ষত উলঙ্গ একটা ব্যবচ্ছেদ-করা শব। তারপর রুটি চিবুতে চিবুতে বললে, ও নিয়ে ভেবো না দাদা। আগামী কাল টাইবার্ণ গাছে পাঁচটা লোকের ফাঁসি হবে। তুমি যখন আমায় শিখিয়ে দেবে বললে, তখন চিন্তা করো না। আমি ওখান থেকে তিনটে শব তোমাকে এনে দেব।

প্রতি সোমবার গায় লালবর্ণের কোট পরিহিত ড্রাম-বাদকেরা ডুম ডুম রবে ঘোষণা করে যে ফাঁসির সময় উপস্থিত। মাঝে মাঝে বিশালকায় এক একটি ওক গাছের ডালে এমন কি আট আটটা দেহকেও ফাঁসি দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। এ ধরনের মুক্তাঙ্গনে ফাঁসি দেখতে কখনো-কখনো লাখ-খানেক জনতার

ভীড়ও হয়। সিট ও জানালা ভাড়া দেওয়া হয় এই বীভৎসকার্য দর্শনের জন্য। জনতা, অধিকাংশ বদ্ধ মাতাল জনতা, মৃতদেহগুলির দিকে পচা সব্জি ও ফল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে।

কোন কোন হাতুড়ে ও সাধারণ ডাক্তার বিশ্বাস করেন যে ফাঁসিতে মরা মানুষের ঘাম নাকি গলগণ্ড ও অপরাপর কিছু রোগের পক্ষে মহৌষধ। জন হান্টার অত্যন্ত বিরক্তিভরে দেখলো, ফ্রেঞ্চ পক্স (সে সময় সিফিলিস রোগকে ঐ নামেই অভিহিত করা হত) বিশেষজ্ঞ ডাঃ হার্বার্ট পিকারেল হামাগুড়ি দিয়ে গাছের দিকে এগোচ্ছে হতভাগ্য মৃত ব্যক্তির কিছু ঘাম সংগ্রহের জন্য।

—পিকারেলটা একটা মূর্খ ও গর্ধভ, নিজ মনেই হান্টার বলে উঠলো, ঘাম, ঘামই। এর কোন নিরাময়-ক্ষমতা আদৌ নেই। কিন্তু হায়, অবোধ মানুষ বুঝি সবই বিশ্বাস করে।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো। জন হান্টার অনুভব করলেন, কে একজন ভিড়ের মধ্যে তার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে মানি-ব্যাগটি চুরি করবার উদ্দেশ্যে। খপ্ করে সে ধরে ফেললো সেই চোরের হাত এবং ভয়ংকরভাবে তা মুচড়ে দিল। বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো ছিঁচকে চোরটি। চেয়ে দেখলো, চমৎকার ভেলভেট ও সিল্কের পোষাক চোরের গায়ে। ভাল টুপী মাথায়, আঙুলে দামী আংটি। লোকটি আর কেউ নয়, লণ্ডনের কুখ্যাত পকেটমার ও শব অপহরণকারী, বেন ক্রাউচ। দাদা উইলিয়াম একদা দূর থেকে ওকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

চার্চের একজন কর্মচারী সন্দিগ্ধভাবে ক্রাউচকে লক্ষ্য করছিল। সে এগিয়ে এসে জনকে জিজ্ঞেস করলো, বেন ক্রাউচ কি তোমার কিছু চুরি করেছে? যদি করে থাকে তো আমাকে বলো। তাহলে ব্যাটাকে এখুনি ফাঁসীতে লটকে দিই। এখনো অনেক ডাল খালি রয়েছে।

—না না অফিসার, ও আমার একজন বন্ধু, জন হান্টার শান্ত স্বরে তখুনি বলে ওঠে, ইয়ার্কী করে আমরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলাম।

বেন ক্রাউচ ভয়ে আতঙ্কে কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। টাইবার্ণ গাছ থেকে ফাঁসিতে তার দেহ ঝুলছে, একথা কল্পনা করতেই তার দেহ যেন অবশ হয়ে এসেছিল।

কৃতজ্ঞ চিত্তে জনকে সে বললে, ভাই তুমি মহৎ। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছ। কিভাবে যে তোমার এ ঋণ শোধ করবো?

—আমার দাদা ডাঃ উইলিয়ম হান্টারকে আমি কথা দিয়েছি যে, কালকের মধ্যে তিনটি শব সংগ্রহ করে দেব। বন্ধু, সে ব্যাপারে আজ রাত্রে তোমাকে আমায় সাহায্য করতে হবে। না করলে তোমায় আমি ধরিয়ে দেব। বল রাজী?

—রাজী।

পরদিন প্রতিশ্রুতিমত ডাঃ উইলিয়ামের লাশকাটাঘরে শব পৌঁছে গেল। এবং

এরপর থেকে শব-চোর বেন ক্রাউচ হয়ে গেল জন হান্টারের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

এ ঘটনার পর দুবছর কেটে গেল। শিক্ষায়-দীক্ষায় জন হান্টার বড় ভাইকেও ছাড়িয়ে গেলেন। অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শরীরতত্ত্ববিদ। কিন্তু দেশের সার্জনদের গীল্ড, ওঁর যশ দেখে বিদ্বেষবশত বললে, ওঁকে পরীক্ষা দিতে হবে আর উপযুক্ত লাইসেন্স নিতে হবে।

এ এক অগ্নিপরীক্ষা। ল্যাটিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না জন হান্টার। শল্যবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হলেও, সাধারণ বিদ্যায় তিনি ছিলেন প্রকৃতই কমজোর। যাই হোক, পরীক্ষকদের ঘুষ দেওয়ায়, বাধা নিষেধহীনভাবেই তিনি তাঁর ডাক্তারী চালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন।

তাঁর প্রখ্যাত পেশেণ্ট রাজা তৃতীয় জর্জের কাছ থেকে রাজকীয় বনের দুএকটা হরিণ ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে। একবার একটি পুরুষ-হরিণ এনে তার ক্যারোটিড আর্টারীর একটা উন্মোচন করে সার্জিকাল সুতো দিয়ে বেঁধে দিলেন। দেখা যাক, হরিণটার শিং-এর পুষ্টির ব্যাপারে কি পরিবর্তন হয়। কদিন বাদে হরিণটিকে পরীক্ষা করলেন, হরিণের শিং যে আর্টারীর দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, সেটা বেঁধে দেওয়ায় দেখা গেল শিংটি শীতল ও নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। স্পর্শ করলেও হরিণ তা টের পায় না। তাহলে এ শিংটা কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে? কিন্তু প্রায় হপ্তাখানেক বাদে সেলাইয়ের ঘা শুকিয়ে এলে ডাক্তার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, শিংটি পুনরায় গরম হয়ে উঠেছে এবং পুনরায় পুষ্টি লাভ করছে। তাহলে কি বন্ধনটা তেমন শক্তভাবে হয় নি? তবে কি কোনপ্রকারে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে হরিণটির শিংটাকে বাঁচিয়ে তুলেছে?

জন হরিণটাকে বধ করে লণ্ডনের বাড়িতে শবব্যবচ্ছেদের নির্দেশ দিলেন। পরে তিনি লিখলেন—"আমার সুতো বাঁধা সঠিকভাবেই হয়েছে। কোনপ্রকারেই রক্ত চলাচল করতে পারেনি তার মধ্য দিয়ে…কিন্তু এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে… কোন কোন ক্ষুদ্র শিরার শাখা-প্রশাখা, বন্ধনের উপরে এবং নিচে বড় হয়ে গেছে। ব্লাড ভেসল্-এর একটি সাহায্যকারী পন্থার বিকাশ ঘটেছে। একটা পরোক্ষ পথে শিং-এতে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে…তাহলে কি মানুষের বেলায় এরকম হতে পারে?"

এইভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন—'কোল্যাটারাল সার্কুলেশান'—অর্থাৎ ছোট ও শাখা আর্টারীগুলির স্ফীতি এবং প্রয়োজনে বড় আর্টারির রক্ত সঞ্চালনের কাজ করে যাওয়া। পরে কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করেও একই ফল পেলেন।

মাসখানেক বাদে ওয়াল্টার সোয়ামন নামে একজন কোচম্যানকে নিয়ে আসা হল ডাঃ হান্টারের কাছে। লোকটার বাঁ পাটা বীভৎসভাবে ফুলে গেছে, আর চক্র চক্র সব দাগ ফুটে উঠেছে তাতে। স্পর্শ করলে ভয়ানক উত্তপ্ত মনে হয়।

রোগ নির্ধারণ হল, অ্যানারিজম—আর্টারীর মধ্যে স্ফীত একটা কোষ। অন্য ডাক্তারেরা অবিলম্বে পা-টা কেটে ফেলবার নিদান দিয়েছেন।

হরিণের শিং নিয়ে পরীক্ষা করবার কথা হান্টারের মনে পড়ে গেল, রোগী কোচম্যান রাজী. লাইসেন্স বিহীন সার্জেন তাকে নিয়ে নতুন পরীক্ষা করতে চায় করুক। ডাঃ হান্টার পেশেন্টের পায়ের ফোলা স্থানের কিছু উপরের আর্টারি উন্মুক্ত করে বেঁধে দিলেন। বললেন, এখন আমাদের অপেক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। তাঁর সহকর্মীরা মাথা নেড়ে জানালে, কোচম্যানের মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু হান্টার এ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত যে রক্ত স্ফীত অ্যানারিজমকে অতিক্রম করে নিচস্থ আর্টারিতে অবশ্যই যাবে এবং পায়ের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করবে।

দেড় মাস বাদে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কোচম্যানটি বাড়ি ফিরে গেল। ডাঃ হান্টার এরপর সাফল্যের সঙ্গে আরও ডজনখানেক এই ধরনের অপারেশন করে রোগী সারালেন। আজও প্রায় একই প্রক্রিয়ায় এই ধরনের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে—যা কিনা হান্টার দুশো বছর পূর্বে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন হান্টার সেণ্ট জর্জ হাসপাতালের স্টাফ-মেম্বার হয়ে যান। গরীবদের কাছ থেকে তিনি নগণ্য পয়সা নিতেন কিন্তু ধনীদের কাছ থেকে এক-একটি অস্ত্রোপচারের জন্য দুহাজার আড়াই হাজার টাকাও গ্রহণ করেছেন।

হেলেন দোর্টেস্কু গ্রাহাম নাম্নী একটি গুণবতী তরুণীর সঙ্গে একদিন দেখা করতে যান পকেটে কাগজ মোড়া একটি মানব-ভ্রূণ নিয়ে। দেখে তরুণীটি মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। ফলে জন্মের মত হান্টারের সে বাড়িতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে নারীদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ক্রমশই সীমাবদ্ধ হয়ে আসে।

তিনি গণিকালয়ে গেলে মেয়েরা তাকে গ্রহণ করতে রাজি হত না। উঃ কি বিদঘুটে লোকটা বাবা! একজন জনপ্রিয় গণিকা একদা বলেছিল, একদিন হয়েছে কি জানেন। আমার ঘরে ও এসেছে। কিছুক্ষণ বাদে বালিশের তলায় ঠাণ্ডা আর ভিজেভাব অনুভব করে দেখি সেখানে রয়েছে একটা গা শির শির করা ঈল্-মাছ, তারপর থেকে লোকটাকে আর ঢুকতে দিইনি, নোংরা পাজিটা।

হান্টার অবশ্য গণিকাদের মতামতের তোয়াক্কা করতেন না। গণিকা কেন অপর কারুরই তোয়াক্কা করতেন না। তখন তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। সবাই তাঁকে ডাকে খোঁজে উপদেশ চায়। লণ্ডনবাসীরা নিয়মিত ভীড় করে তাঁর চেম্বারে। প্রচুর পয়সার মালিক হয়ে গেলেন তিনি। বড় ভাই ডাঃ উইলিয়াম ছোট ভাইয়ের উন্নতি দেখে মাৎসর্যে আক্রান্ত হয়ে ওঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিলেন।

হাসপাতালে যৌনব্যাধির ওয়ার্ড দেখা শোনা করতেন ডাঃ জন হান্টার। নারী ও নারীদেহ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞ, হান্টার যেন ভেনারেল ডিজিজের প্রেমে পড়ে গেলেন। দিকে দিকে তিনি যৌনব্যাধিযুক্ত স্ত্রীলোক খুঁজে ফিরতে লাগলেন।

চরিত্রহীনারা এবং গণিকাবৃন্দ তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝতে লাগলো। ডাক্তার যখন তাদের জিজ্ঞেস করতে যেত যে তাদের কোন যৌনব্যাধি আছে কিনা, শুনে তারা মহাক্রুদ্ধ হয়ে যা-তা খিস্তি খেউর করতে লাগলো এবং ঢিল, পচা-ডিম ও রাবিশ ছুঁড়ে মারতে লাগলো তাঁকে উদ্দেশ্য করে।

স্যাম টাবস্-এর পানশালা থেকে নিক্ষিপ্ত হবার পর থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিনি রোগিণী খুঁজতে লাগলেন। সে সময় মার্টিন ভ্যান বুচেল নামক জনৈক আনাড়ি ডাক্তার পুরুষদের 'শক্তি বর্ধক' ও মেয়েদের 'বন্ধ্যাত্ব' ঘোচানোর পিল বিক্রি করে বেড়াতো। তার সঙ্গে হান্টারের হয়ে গেল গভীর বন্ধুত্ব, হাণ্টার তার সাহায্য চাইলেন। আনাড়ি ডাক্তার একদা হাণ্টারের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এনে তুললো তিন তিনজন ভি. ডি রোগিণী গণিকাদের, তাদের গায়ের চামড়া, কণ্ঠস্বর ও রুক্ষ কথাবার্তা শুনে হাণ্টার বুঝলেন মেয়েগুলি ক্রমবর্ধমান সিফিলিস রোগে ভুগছে। একটি ছুরিকার সাহায্যে তাদের রুগ্ন রক্ত নিয়ে তিনি নিজ ধমনীতে মিশিয়ে দিলেন। তারপর প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে সেই গণিকাত্রয়কে বিদায় দিলেন।

উৎসুক হয়ে অপেক্ষায়রইলেন সেদিনটির, যে দিন উক্ত রোগ সত্যি সত্যি তাঁকে আক্রমণ করবে এবং তিনি তাঁর অনুভূতি ও উপসর্গসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট নিতে পারবেন। এক শুক্রবারে তিনি নিজ দেহে ঐ ভয়ংকর বীজাণু প্রবেশ করালেন। এক সপ্তাহ বাদে তাঁর 'জার্নালে' লিখলেন, 'আমি সিফিলিস রোগের প্রাথমিক সব লক্ষণ আমার মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখছি। ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, গ্ল্যাণ্ডসমূহ ফুলেছে। তামাটে চক্র চক্র দাগে শরীর ছেয়ে যাচ্ছে। এই ভয়ংকর রোগে সিলভার নাইট্রেট ও মার্কারী দিয়ে কোন কাজ হয় না। আমি এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার করতে চাই যার দ্বারা ভবিষ্যতে শত শত হতভাগ্যরা পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারে।'

কিন্তু হায়, তিনি কোন নিরাময় ঔষধ আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না। এ ছাড়া আরেকটি মারাত্মক এবং ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, সিফিলিসও গণোরিয়া একই জাতের সংক্রমণ। যার ফলে ভি. ডি সম্বন্ধে ডাক্তারদের সঠিক জ্ঞানকে এক পুরুষেরও বেশি সময় পিছিয়ে দিল।

অচিরেই এই বীভৎস রোগের অপরাপর উপসর্গও তাঁর মধ্যে দেখা দিল। লাল চুল হয়ে গেল সাদা। সমস্ত শরীরে এল অবিরত মৃদু কম্পন। দেহ তাঁর কেমন এক অদ্ভুতভাবে বক্র হয়ে গেল। যখন তিনি ভি. ডির স্বেচ্ছা সংক্রমণ করেন নিজ দেহে, সে সময় তেইশ বছর বয়স্কা অ্যানি হোম নাম্নী জনৈকা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তিনি প্রেমাবদ্ধ হয়েছিলেন। এখন তিনি সেই প্রেমিকাকে অনুরোধ জানালেন, বিয়ে কিছু পরে হবে। তাকে কারণ না জানিয়ে শুধু বললেন কয়েকটি মেডিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করে অন্ততঃ কয়েক বছরের পূর্বে তাঁর পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। সরলমতি মেয়েটি রাজী হল তাতেই।

পাগলা ডাক্তারের পাগলামতি। প্রেম করার সময়ও তিনি পোষাক পরিচ্ছদ তেমনি নোংরা ব্যবহার করতেন। চুল থাকতো এলোমেলো। পকেট ভর্তি থাকতো ছুরি কাঁচি, ফরসেপ ও নানা বিচিত্র বস্তু। জামায় যথারীতি খাদ্যদ্রব্যের ছোপ। মেয়েটি বুঝি প্রকৃতই ভালবাসতো তাঁকে। ওঁকে ওঁর সর্বপ্রকার বদ খেয়ালের সঙ্গেই হোম গ্রহণ করেছিল, মেনে নিয়েছিল।

অদ্ভুত! একটা এনগেজমেন্ট রিং পর্যন্ত কেনার সুবিধে হয়নি তাঁর। অথচ রোজগার ছিল প্রচুর। অবশ্য খরচাও ছিল অপরিমেয়। বিজ্ঞান সাধনায় সমস্ত ফতুর। দেনায় দেনায় মাথা বিক্রি। নিজস্ব একটি চিড়িয়াখানা তৈরী করেছিলেন। হেন জন্তু জানোয়ার নেই যা তাঁর তিনশর উপর প্রাণীসম্বলিত 'জু'-তে না ছিল।

বছর তিন বাদে হান্টারের শরীর থেকে যৌনব্যধির যাবতীয় চিহ্ন ক্রমে ক্রমে সব মিলিয়ে গেল। অবশেষে প্রতীক্ষারতা সেই একনিষ্ঠা মেয়ে অ্যানি হোমকে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই সেন্ট জেমস গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করলেন ডাঃ হান্টার।

বিয়ের পরদিন, রাজা তৃতীয় জর্জ এই প্রখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদের কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে, তাঁর হাতিশালের সর্ববৃহৎ ও বৃদ্ধ হাতিটি প্রাণত্যাগ করেছে। ইচ্ছে করলে ডাক্তার হাতিটির শব নিয়ে যেতে পারে।

ডাঃ জন হান্টার পড়লেন উভয় সংকটে। একদিকে লাবণ্যবতী সুন্দরী নব পরিণীতা বধূসহ হনিমুন, অপরদিকে মৃত হাতির দেহ-ব্যবচ্ছেদের তীব্র বাসনা। মৃত হাতিরই জয় হল। নববধূ অ্যানির হতাশার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বিদায় নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন লণ্ডনে। নিজ বাড়ির উদ্যানে বিশালকায় গর্ত করে হাতির শব এনে স্থাপন করলেন তাতে। অতঃপর ডজনখানেক ছাত্র নিয়ে মহাসমারোহে হাতিটার চামড়া ছাড়াতে লেগে গেলেন।

ডাঃ হান্টারের চারটি সন্তান হয়। দুটি শৈশবেই মারা যায়। আর দুটি বড় হবার পর তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ডাক্তারদের মতে হান্টার নিজে রোগমুক্ত হয়ে গেছে ভাবলেও ও রোগ তাঁর শরীরে গুপ্ত অবস্থায় ছিলই। সেই বীজাণু অ্যানিতে সংক্রামিত হয়ে এই মর্মান্তিক অনাসৃষ্টি ঘটিয়েছে।

উপরের ড্রইংরুমে অ্যানি যখন পার্টি দিয়ে লণ্ডনের প্রখ্যাত-সব গ্রন্থকার ও কবিদের স্বাগত জানাতো, নিচেকার ল্যাবরেটরিতে হান্টার তখন তাঁর অদ্ভুত ও লোমহর্ষক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন. দিনে ষোল ঘন্টার ওপর।

দোতলায় নাচগানের ফাঁকেও অভ্যাগত অতিথিরা মাঝে মাঝে কি এক উৎকট গন্ধে-চমকে উঠতো এবং একে একে সে বাড়ি পরিত্যাগ করে চলে যেত। অ্যানি আর কত মিথ্যা দিয়ে ঘটনা ঢাকবে!

নতুন নতুন শব চাই। অথচ শব পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এই চিন্তাই

হাণ্টারকে অস্থির করে তুললো। মর্গ বা পুয়োর হাউস কেউই ডাক্তারদের কাছে মৃত-দেহ বিক্রি করতে চায় না। ধর্মীয় সম্প্রদায় এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে পবিত্র মৃতদেহের উপর অস্ত্রাঘাত হেনে বিকৃতি করে দেবার বিরুদ্ধে। ফলে শব অপ্রতুল এবং দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। যা-ও দু'একটা পাওয়া যায় তা ব্যবহারের অযোগ্য। প্রায় পচনোন্মুখ শব।

অনুপায় হয়ে ডাক্তার তাঁর পুরানো বন্ধু বেন ক্রাউচকে ডেকে পাঠালেন। ক্রাউচ সাহায্য করতে রাজি হল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ রাত্রে, লণ্ডন ভ্রমণরত জার্মান ডিউক অফ কোবার্গ, ক্রফট স্কোয়ারে তাঁর ভাড়া বাড়িতে এক বিশাল নাচের পার্টি দিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ অভিজাতবৃন্দ, জমিদারবর্গ, রাজনৈতিক চাঁইয়েরা এবং কিছু সামরিক অফিসার। এর সঙ্গে কিছু উচ্চ পর্যায়ের অভিজাত ও সুন্দরী ললনাবৃন্দও আমন্ত্রিত হয়েছিল সেই পার্টিতে।

ডিউকের নাচের পার্টি থেকে রাত এগারটা নাগাদ হাঙ্গেরীর ডিপ্লোম্যাট কাউন্ট ফেলিক্স দ্য রোজিকার বাহুলগ্না হয়ে জনৈক অশ্বারোহী সেনার বিধবা পত্নী মিসেস প্যাট্রিক মিল্টন বাড়ির পথে একটি ঘোড়ার গাড়ি করে রওনা দেন।

না কাউন্ট, না মিসেস মিল্টন, কাউকেই আর সে রাতের পর দেখা যায়নি।

দশদিন বাদে লণ্ডন-পুলিশ কনস্টেবলরা বেন ক্রাউচকে গ্রেপ্তার করে। ল্যাভেণ্ডার বিক্রেতা জনৈকা বৃদ্ধা রমণী জানায় যে, সেই গাড়ির চালক ছিল প্রখ্যাত পকেটমার ও শব-অপহারক বেন ক্রাউচ স্বয়ং। প্রচণ্ড জেরা ও অত্যাচারের পর বেন ক্রাউচ সব স্বীকার করে। হ্যাঁ—ওয়াণ্ডহাম মিউজে তাদের নিয়ে গিয়ে, সে উক্ত ডিউক ও মিসেস মিল্টনের মাথা গুঁড়িয়ে থেতলে ফেলে। যাতে করে সে তার সুহৃদ ডাক্তার হাণ্টারকে তাজা দুটি শব সাপ্লাই করতে পারে। না-না, এ খুনের কথা হাণ্টার মোটেই জানে না। আমি তাকে বলেছি যে, নরনারী দু'জন গাড়ির চাকার তলায় পড়ে মারা যায়।

সায়েন্স ফিক্শনের ভিলেন সদৃশ ডাঃ হাণ্টার পুলিশদলকে তাঁর ল্যাবরেটারী ঘুরিয়ে দেখায়। অনুতপ্তভাবে প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নির ওপর একটি কড়াইয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তার মধ্যে তরতাজা কি যেন উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। সেই সেদ্ধরত চামড়ার গন্ধে নাড়ি উল্টে আসতে চায়। হাণ্টার নিষ্কম্প কণ্ঠে বলে, অফিসারগণ। উক্ত নিহত নর-নারীদের দেহগুলি বর্তমানে তরলীকৃত হয়ে কড়াটার মধ্যে রয়েছে। এ ব্যাপারের জন্য আমি গভীর দুঃখিত। বেন ক্রাউচটা সর্বনাশ করেছে। আমার কাজের জন্য আমি কখনোই কোন নরহত্যার প্ররোচনা দিইনি।

নরহত্যাপরাধে বেন ক্রাউচের মৃত্যুদণ্ড হল, বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি সহায় থাকায় ডাঃ হাণ্টার রেহাই পেলেন। যথারীতি টাইবার্ন বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল খুনের আসামী বেন ক্রাউচকে। মোষেটানা গাড়িটা নিয়ে

অভ্যাসমত ডাঃ হান্টার সেখানে উপস্থিত হলেন। ফাঁসি হয়ে গেলে, আসামী-লিখিত একটি উইলপত্র তিনি সেখানকার বেলিফদের হাতে দিয়ে বললেন, বেন ওর শবটি আমার হাতে অর্পণ করার কথা লিখে গেছে। লোকটা এমনিতে খারাপ ছিল না কিন্তু হ্যগচটা বেকুফ। যাইহোক আমি মৃতদেহটি নিতে এসেছি।

ফাঁসিতে ঝোলা বন্ধুর শব নিয়ে হান্টার কি করেছিলেন, ইতিহাস সে সম্পর্কে আমাদের কোন আলোকপাত করেনি। তবে হান্টার মৃত মানব দেহ ছেড়ে দেবার পাত্র মোটেই ছিলেন না। সমস্ত শব দেহকেই তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে স্বাগত জানাতেন। কেননা ওগুলোর মধ্যে সেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব নব উন্নতির নিয়ত প্রচেষ্টা করা হত। করেছেনও বহু। যেমন, তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মানুষের মৃত্যুর পরও তার পাকস্থলীর গ্যাসট্রিক রস পড়ে থাকা খাদ্যদ্রব্য এবং পরে স্বয়ং পাকস্থলীকেই ক্ষয় করতে থাকে। এই শক্তিশালী জারক-রসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনিই প্রথম লিখিত বিবরণ পেশ করেন। এর জন্যে রয়েল সোসাইটি তাঁকে 'ফেলো' করে নেয়।

সে সময় ব্রিটেনে অসংখ্য প্রদর্শনযোগ্য বস্তুর মধ্যে একটি ছিল, আজগুবি রকম দীর্ঘকায় এক যুবক। আইরিশ দৈত্য নামে পরিচিত তেইশ বছরের সেই তরুণের নাম ছিল চার্লস বাইন। লোকটার উচ্চতা ছিল ৮ ফুট ২ ইঞ্চি। খালি পায়েই এই উচ্চতা। দশ শিলিং দর্শনী দিয়ে ডাঃ হান্টার দিনের পর দিন গিয়ে ঐ দানবাকৃতি মানবটির পানে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন।

চেহারায় দানব এই আইরিশ যুবকটি ছিল বদ্ধ মাতাল, যাকে বলে অ্যালকোহলিক। এর ওপর লোকটার টিউবারকিউলেসিস রোগও ছিল। হারলপ্রোভ মিউজিয়ামে ডাঃ হান্টার একদা সেই আইরিশ দৈত্যকে মৃত্যুর পর তার মৃতদেহকে ডাক্তারের স্কুলে উইল করে দেবার অনুরোধ জানালেন। একথা শুনে দৈত্য সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল। মৃত্যুর চেয়েও মৃত্যুর পর তার দেহকে কাটাছেঁড়া করে জেরবার করবে এই কল্পনাতেই সে সমধিক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। না, কিছুতেই সে তার দেহকে ডাক্তারের খপ্পরে পড়তে দেবে না।

ভীত সন্ত্রস্ত বাইন নিজের জন্য আড়াই হাজার টাকা দিয়ে লোহায় তৈরী এক বিশালকায় কফিনের বাক্সের অর্ডার দিল। তার ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়ে রাখলে, তার শবভর্তি এই লৌহ-কফিনটিকে যেন টেমস্ নদীর মোহানায় নিয়ে গিয়ে সমুদ্রসমাধি দেওয়া হয়। এইভাবে সে ডাঃ হান্টার বা অপরাপর শব অপহরণকারীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইল।

—ঐ বজ্জাত ডাক্তারটা আমার মৃতদেহ এ জীবনে পাবে না, আইরিশ দৈত্য সরবেই দিকে দিকে প্রচার করতে লাগলো। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ ডাঃ হান্টারের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন।

এর চার মাস বাদেই দানব মানব বাইর্ন মারা গেল। স্বাভাবিকভাবেই খুব

দ্রুত তার মৃত্যু সংবাদ লণ্ডনময় ছড়িয়ে পড়লো। হাণ্টার তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ি নিয়ে মিউজিয়ামের বিপরীত দিকের এক পানশালায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে জনা ছয় গুণ্ডাপ্রকৃতির মানুষকে পেট ভরে মদ খাওয়ালেন নিজের পয়সায়। ঐ লোকগুলোকে দানবের শব পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

মত্তমাতাল শব প্রহরীদের মধ্যে ৫০০ গিনি বিতরণের পর, তারা দানবের শবদেহ ডাক্তারের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়ে গেল। প্রাণহীন চার্লি বাইর্নের বিপুল দেহটিকে ডাঃ জন হান্টারের গাড়িতে এনে তুলে দিতে ছয় ছয় জন মানুষ গলদঘর্ম হয়ে গেল।

সারারাত ধরে পাগলের মত কাজ করলেন হাণ্টার। বিপুল দেহটাকে অংশ অংশ টুকরো করে বিশাল এক কড়ায়ের মধ্যে জড়ো করলেন। হাড়গুলোকে আলাদা করে রেখে, পরে সন্দেহ দূর হলে, সে হাড়গুলো সাজিয়ে বিশাল এক স্কেলিটন প্রস্তুত করা হবে। তারপর সেটা রেখে দেবেন নিজস্ব কিউরিও মেডিক্যাল গ্যালারীতে।

ওদিকে কেউ জানলো না যে, ধাতু নির্মিত যে কফিনটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল সেটি ছিল আসলে ফাঁকা শবদেহহীন।

সিগমণ্ড ফ্রয়েডের দেড়শ বছর পূর্বে জন্মালেও ডাঃ হাণ্টার ছিলেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ। তার মতে সব ডাক্তারদেরই রোগীর বংশ, জীবনেতিহাস, পরিবারের অবস্থা, চিন্তাধারা, আনন্দ দুঃখ প্রভৃতি সব রকম অবস্থা বিবেচনা করে তবে রোগ নিরাময় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মনের প্রতিফলন দেহের উপর অবশ্যম্ভাবী। রোগের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ বিশেষ কার্যকরী। এইসব কথা তিনিই প্রথম বলেন। সাইকোমেটিক মেডিসিনের বুনিয়াদী আদর্শ আজও একই।

হাণ্টারের একজন পেশেণ্ট ছিলেন ষাট বছর বয়স্ক আর্ল অফ মার্চ। তিনি জীবনভর শুধু আকৃষ্ট হয়েছেন তরুণী যুবতী নারীতে। সপ্তমবার এক অষ্টাদশী বার মেইডকে তিনি বিবাহ করে বিষণ্ণ বোধ করতে থাকেন। ডাক্তার তাঁকে সাধ ও অক্ষমতার উপদেশ দিলেন, বললেন, বেশি সিরিয়াস হবেন না ও ব্যাপারে। নিরুদ্বিগ্ন শান্তভাব ধারণ করুন ব্যাপারটা কিছু নয় ভাবুন, মনের ভয় দূর করুন, দেখবেন যৌনজীবনে আপনি সফলকাম হবেন। ওটা কিছু নয়, ওটা মানসিক, দৈহিক অক্ষমতা মোটেই নয়।

সত্যি সত্যি তাই হল। উপদেশানুসারে কাজ করে "হিজ লর্ডশিপ" অভিষ্ট লাভ করলেন। আজকের যুগেও মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারেরা একই উপদেশ দিয়ে থাকেন।

শুধু মানুষের নয়, জন্তু জানোয়ারের যৌনজীবন নিয়েও তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

একদিন তিনি নিজস্ব চিড়িয়াখানার একটা জেব্রা দেখে তাঁর স্ত্রী-অ্যানিকে

বললেন, আচ্ছা জেব্রা আর গাধার সংমিশ্রণ হলে কেমন হয়? শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন স্ত্রী অ্যানি।

অতঃপর তিনি একটি মদ্দা জেব্রা ও একটি মাদী গাধাকে একসঙ্গে রেখে দিলেন। জেব্রাটি কিন্তু তেমনি উদাসীন হয়ে রইল, ফিরেও তাকালো না গাধীনির পানে। তখন এক বুদ্ধি খেললো ডাক্তারের মাথায়। তিনি কালো রঙ দিয়ে মাদী গাধার গায়ে জেব্রার মত লম্বা লম্বা দাগ কেটে দিলেন। আর আশ্চর্য, তখন দেখা গেল জেব্রাটি সাগ্রহে এগিয়ে আসছে মাদী গাধার পানে। এটিও একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, সেন্ট জর্জ হাসপাতালে বোর্ড মেম্বারদের মাসিক মিটিং হচ্ছিল। বৃদ্ধ ডাক্তার হান্টার বক্তৃতা করছিলেন। বুকে পিঠে তাঁর এক অসহ্য বেদনা শুরু হয়েছে। হাতটাও কনকন করছে সাংঘাতিক।

কে যেন বাধা দিল বক্তৃতায়। স্বভাবসুলভ বদ-রাগে সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। সগর্জনে বাধা দেওয়া লোকটিকে বলে উঠলেন, তুমি একটি আকাট মুর্খ। তোমার ডাক্তারীতে না এসে জুতো পালিশ করা উচিত ছিল।

সহসা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। প্রবল শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হল এবং মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বন্ধুরা তাঁকে ধরাধরি করে তাঁর বীভৎস ও রোমহর্ষক শয্যাগৃহে নিয়ে গেল। চারদিকে সব বিচিত্র বস্তু সামগ্রী। বিশালকায় একটি নর-কংকাল ঝুলছে, কোথাও আরকে ভেজানো মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোথাও খড়ভর্তি নানা জীবজন্তুর মূর্তি।

সন্ধ্যের দিকে বৃদ্ধ ডাক্তার দেহত্যাগ করলেন।

দু-হাজারের উপর রুগ্ন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যার অধিকাংশ নিজেই তিনি স্বহস্তে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে চারদিকে। এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে অর্ধোন্মাদ, বিজ্ঞানী ও প্রতিভাধর ডাক্তার জন হান্টার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি ইন্দ্রপতন হয়ে গেল।

রক্ত! জীবন সঞ্জীবনী তরল পদার্থ। এতকাল সে ছিল মূক, আজ বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতে সে হয়েছে মুখর। সে কথা কয়, যে কোন নরহত্যার মামলায় একবিন্দু রক্তের ফোঁটা সহস্র কণ্ঠে সাক্ষ্য দেয়।

যেমন ধরা যাক, এক তরুণ আসামীর কথা। তার ছিল অল্প-বিদ্যা-ভয়ংকরী। সে জানতো, তার নিজের রক্ত 'ও' টাইপের আর 'ও' টাইপই হল খুব চলতিগ্রুপ বেশিরভাগ মানুষের রক্তই এই টাইপের। এও জেনেছিল, যে কিশোরী মেয়েটির পেছনে সে লেগেছে, তারও রক্ত ঐ 'ও' টাইপেরই। কিন্তু একটি জিনিস বুঝি সে জানতো না নিজ রক্ত সম্বন্ধে। এবং সেই না জানার জন্যেই তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড পেতে হল।

বিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে এক নির্জন ঝোপের আড়ালে সে ঐ বালিকাটিকে হত্যা করে। মেয়েটির রক্তে তার পোষাক পরিচ্ছদ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য কেউ হলে ভয় ভীতি আশংকায় দ্রুত সেই রক্তাক্ত পোষাক পাল্টে ফেলতো। কিন্তু অল্পবিদ্যা বিশারদ সেই খুনী নির্দ্বিধায় সেই অবস্থায় অন্য এক আড্ডায় যায়—সেখানে গিয়ে কয়েক জনের সঙ্গে প্রচণ্ড মারপিট করে, রক্তাক্ত মারপিট। অতঃপর সোজা চলে যায় এক হাসপাতালে।

মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পরই অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সেই তরুণটিও গ্রেপ্তার হয়। তরুণটি ছিল মেয়েটির পড়শী, তায় আবার দাগী আসামী। সুতরাং প্রথম সন্দেহই হল তার উপরে।

পোষাক পরিচ্ছদের রক্তের দাগই ধরিয়ে দিল তাকে শেষ পর্যন্ত। তরুণটি কিন্তু অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করলো। বললে, দলীয় মারপিটে নাকি পোষাকে ঐ রক্ত লেগেছে। ঐ রক্তের দাগ নাকি ওর নিজ রক্তের। পুলিশ স্বীকার করলো ঐ রক্তের দাগের অধিকাংশই ওর নিজের, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সবটা কিন্তু-ওর নয়। বিরোধী ছেলেদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাদের রক্ত ভিন্ন টাইপের। হ্যাঁ—পোষাকে লাগা দুরকম দাগই 'ও' টাইপ রক্তের। তবে আসামীর রক্তে একটি মারাত্মক দোষ ছিল—যৌনরোগ। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল তরুণটিই বালিকার হত্যাকারী। মৃতুদণ্ড হয়ে গেল।

রক্ত! একবার মোক্ষণ হলে আর রক্ষা নেই, অপরাধী সন্ধানে সে হয়ে যায়

অব্যর্থ সূত্র। রক্তের-দাগ অপরাধ অনুসন্ধানকারীদের কাছে একটি অমূল্য সম্পদ-বিশেষ। ক্ষুদ্রতম বা বিন্দুমাত্র রক্তের দাগের সাহায্যে সমস্ত অজানিত তথ্য-কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে, অপরাধী সনাক্তিকরণে খুবই সুবিধে হয়। এমনই বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে 'সেরোলজি' বিজ্ঞানের।

একবার একটি তরুণী তার ফ্ল্যাট থেকে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যায়। ঘরে তার কিছু রক্ত পড়েছিল। তরুণীর সন্ধান পাওয়ার আগেই তদন্তকারী ডিটেকটিভরা কিন্তু সেই রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পেরেছিলেন যে, উক্ত তরুণীটিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? না কি সে স্বেচ্ছায় গেছে? সে বেঁচে রয়েছে কিনা এবং সংবাদ প্রাপ্তির কতক্ষণ পূর্বে সে নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যে সাংঘাতিক কিছু আহত হয়নি বা মরণাপন্ন হয়নি, তাও জানা গেছে রক্ত পরীক্ষার দ্বারা।

রক্তের পরিমাণ এবং দাগের আকার দিয়ে ঘটনার অনেক কিছুই ব্যক্ত হয়ে পড়ে। পাকা রক্ত-বিশারদ তদন্তকারী রক্তের দাগ দেখেই মোটামুটি ঘটনাটি বলে দিতে পারেন। দাগ যদি বৃত্তাকার হয় তো রক্তমোক্ষণকারী সে সময় এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল বোঝা যাবে। যদি একটু লম্বাভাবে দাগ পড়ে তো বোঝা যাবে আক্রান্ত বা আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি কোন দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। রক্তের দাগের রঙ দেখে সেরোলজিস্ট সরাসরি বলে দিতে পারেন শরীরের কোন স্থান থেকে সে রক্ত বেরিয়েছে আর মোক্ষণকারী কিরূপ পরিমাণ আহত হয়েছে। যদি পরিমাণে খুব বেশি এবং কড়া লাল রঙের রক্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে আহত ব্যক্তির কোন বড় আর্টারি (ধমনী) ছিন্ন হয়েছে। একটু কালো রঙের হলে বোঝা যাবে তা শিরা থেকে বেরিয়েছে।

একদা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে প্রবঞ্চনা করবার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল।

একজন জুয়েলারের ব্যবসা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে ইন্সিওর কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবার ফিকিরে এক ফন্দি আঁটলো। বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে সে ঘরে কিছু রক্তক্ষরণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পুলিশ এলে বলা হবে, বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা জুয়েলারকে আহত করে ধরে নিয়ে চলে গেছে, ভাবটা হবে যেন তাঁকে নিয়ে গিয়ে তারা হত্যা করেছে এবং দেহটা কোথাও ফেলে দিয়েছে। বছর সাতেক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেই কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে সে 'মৃত' বলে প্রমাণিত হবে। আর তখন তার স্ত্রী মোটা অঙ্কের ইন্সিওরের টাকা পেয়ে যাবে, এই ছিল প্ল্যান।

কিন্তু বছর খানেক বাদে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিটেকটিভরা টের পেল যে, জুয়েলার বেঁচে আছে। স্ত্রীর কাল্পনিক কাহিনী তারা বিশ্বাস করলো না। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, স্বামীর পেটে দুবার গুলি করে—একথা সেরোলজিস্টরা সরাসরি অপ্রমাণ করেছিল। তাদের মতে যে রক্তচিহ্ন পাওয়া গেছে—তাহল সামান্য বাহ্যিক আঘাতের রক্ত। আসলে তো ঘটনা ছিল তাই। জুয়েলার নিজে আঘাত

করে কিছু রক্তমোক্ষণ করে। আর কিছু রক্ত ছড়ায় নিজের বাহু সামান্য কেটে। জুয়েলারের ধারণাই ছিল না যে, গুলির আঘাতের রক্ত আর নাক এবং বাহু কাটা রক্তের আকাশ পাতাল তফাৎ হয়।

হত্যাকাণ্ডের স্থানে যদি রক্ত ছিটানো ছড়ানো থাকে তাহলে রক্ত বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারেন যে, আক্রমণকারীর দেহেতেও সে রক্ত অবশ্যই লেগেছে।

কেননা রক্ত সজোরে প্রবাহিত হয়, ফিনকি দিয়ে বেরোয়, ছিটকে পড়ে। অল্প-সংখ্যক আততায়ীই আক্রান্ত ব্যক্তির ছিটকানো রক্ত থেকে রেহাই পায়।

সাধারণত আততায়ী যখন কোন মানুষকে ছুরির দ্বারা, বা অন্য কোন ধরনের কোন তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা আঘাত করে, এমন কি খুব নিকট থেকে গুলি করে নিহত করে, তখন আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত আসামীর গায়ে অবশ্যই লাগবে।

এমন কি পেছন থেকে যদি আততায়ী লোকটির গলায় ছুরি মারে এবং বড় কোন ধমনী ছিন্ন করে ফেলে, তাহলেও অনিবার্যভাবে সে রক্তাক্ত হবে—কেননা ধমনী থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে আঠারো কুড়ি ইঞ্চি দূরে পর্যন্ত ছিটকে যায়।

পশু বলির সময় আমরা দেখতে পাই, অনেক সময় কয়েক ফিট পর্যন্ত রক্ত ছিটকে যায়। যেসব দেশে মুণ্ডচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যেমন ফরাসী দেশে 'গিলোটিন' মারফৎ—সেসব স্থানে উপস্থিত জনেরা রক্ত ছিটনোর ভয়ে উক্ত যন্ত্র থেকে অনেকটা দূরে দূরে থাকে।

পাকা খুনীরা রক্তের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। জনৈক বৃটিশ খুনী কুঠারের সাহায্যে নরহত্যা করতো। সেই কাজের সময় সে পরিপূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে নিত। পুলিশ এসে তাকে ধোওয়া-মোছা নির্দোষ মনে করতো। অবশ্য এত সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও একবার পুলিশ তার পায়ের ও হাতের নখের নিচে রক্তের চিহ্ন পেয়ে যায়, এবং সেই চিহ্নই তাকে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করতে সাহায্য করে।

কানাডার এক খুনী, হত্যাকালীন ওয়াটার প্রুফ পরে নিত। কার্যান্তে সেটা পুড়িয়ে ফেলতো। সেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেহাই পেল না। তার বুট-এর পেরেকের গর্ত থেকে রক্তের চিহ্ন নিয়ে ধরে ফেলা হয়।

দাগ যেসব সময়ে রক্তেরই হবে, তারও কোন ঠিক নেই। তবে শুকনো কোন দাগ প্রকৃত রক্তের কিনা তাও প্রমাণ করবার সহজ প্রক্রিয়া রয়েছে। বেঞ্জিডিন কম্পাউণ্ড হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলে রক্তের হেমোগ্লোবিন গাঢ় নীল রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যতদিনের পুরনো রক্তের দাগই হোক না কেন এই পরীক্ষাতে তা নীলবর্ণ ধারণ অবশ্যই করবে। পাঁচহাজার বছরের মমীর রক্তের দাগে এইভাবে পরীক্ষা করেও একই ফল পাওয়া গেছে। রক্তমাখা পোষাক পরিচ্ছদ যত ভালভাবেই ধোলাই করা যাক না কেন, বেঞ্জিডিন টেস্টে দাগ বেরিয়ে পড়বেই।

অনেক সময় পুলিশকে ধোকা দেবার জন্যে রক্তের সঙ্গে অপরাপর বস্তু মিশিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ফরাসী দেশের প্রখ্যাত ডিটেকটিভ বেলেস্ একবার একটি কেস-এর তদন্তে যান। ডাকাতরা বাড়ির এক জনকে খুন করে একটি মই-এর সাহায্যে দোতলা থেকে নেমে পালায়। ডিটেকটিভ উক্ত মই-এর প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ পরীক্ষা করেন। ডাকাতরা ধরা পড়ে যায়। তারা ডাকাতির কথা স্বীকার করে। কিন্তু খুনের ব্যাপারটি অস্বীকার করে। মই-এর ধাপগুলি ডাকাতদের জুতোর মাটির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। রক্তের কোন দাগ পাওয়া গেল না তাতে। তখন বেলেস ধাপের থেকে কিছু কাদা নিয়ে বেঞ্জিডিন টেস্ট করেন এবং দেখা যায় মাটি নীলবর্ণ হয়ে গেল। ডাকাতদের নরহত্যার অভিযোগ থেকে পরিত্রাণের আর পথ রইলো না।

খুনীরা অনেক সময় ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মানুষের রক্তের সঙ্গে জীবজন্তুর টাটকা রক্ত মিশিয়ে রেখে যায়।

কয় বছর আগে মার্কিন দেশে এক স্থানে একজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সে বাড়িরই জনৈকা স্ত্রীলোকের উপর পুলিশের সন্দেহ হয়, কারণ তার ঘরের মেঝেতে অনেকটা যায়গা জুড়ে রক্তের দাগ পাওয়া যায়। স্ত্রী লোকটি কিন্তু বলে, সে নাকি একটা ইঁদুর মেরেছিল, ঐ দাগ নাকি ইঁদুরের রক্তেরই, তার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করবার জন্যে নর্দমাতে সে একটা মরা রক্তাক্ত ইঁদুরও দেখায়। ডাঃ আলেকজাণ্ডার ওয়নার নামে জনৈক রক্ত বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করে দিলেন যে, ওখানে ইঁদুরের রক্ত ছিল ঠিকই, তবে তার নিচে নর রক্তের দাগ রয়েছে। "র‍্যাবিট টেষ্ট"-এর সহজতম পরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। যে রক্তটা কোন মানুষের কিনা, না কি অন্য কোন প্রাণীর।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার রক্তের মূলত চারটি গ্রুপ আবিষ্কার করেন এবং এই গবেষণামূলক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। সেই সময় থেকেই রক্তের দাগ অপরাধী সন্ধানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

রক্তের বিভাগগুলো হল : 'এ', 'বি', 'এবি এবং 'ও' রক্ত প্রধানত দুটি বস্তুর দ্বারা গঠিত। যার দ্বারা রক্তের রঙ লাল হয় তা হল রেড সেল্স আর রক্তের তরল পদার্থটির নাম সেরাম বা প্লাজমা। রেড সেলসের মধ্যে আবার দুটি পদার্থ রয়েছে, যাদের বলা হয়, আগলুটিনোজেন্স, 'এ' এবং, 'বি'। কোন ব্যক্তির রক্তে যদি আগলুটিনোজেন্স থাকে তো তার রক্তের গ্রুপ হবে 'এ'। এবং 'বি' থাকলে হবে 'বি'। আর যদি দুটিই থাকে তো হবে 'এবি'। এর কোন একটাও না থাকলে হবে গ্রুপ—'ও'

শতকরা চল্লিশ জন মানুষের থাকে গ্রুপ—'ও'। পঁয়ত্রিশ জনের থাকে গ্রুপ 'বি'। আর মোটামুটি পাঁচ শতাংশের থাকে গ্রুপ, 'এবি'। ডাঃ ল্যাণ্ডস্টেইনারের পর আরও কয়েকটি স্বাধীন টাইপের (রক্তের) আবিষ্কার হয়েছে। তাদের বলা

হয়, 'এস,' 'এন' এবং 'এম এন'। আরও শ্রেণী বিভাগ আছে যেমন, 'আর এইচ' (Rh) ফ্যাক্টর ইত্যাদি।

অনেক অপরাধীর এই ভুল ধারণা আছে যে, পুলিশ রক্ত নিয়ে মাত্র চারটি গ্রুপের সন্ধান পেতে পারে। কিন্তু তারা জানে না যে, উপযুক্ত অবস্থায় ডিটেকটিভরা রক্তের পাঁচ হাজার রকম শ্রেণী বিভাগে সমর্থ। বৈজ্ঞানিকগণ এও আবিষ্কার করেছেন যে, আঙুলের ছাপের মত বিভিন্ন মানুষের রক্ত বিভিন্ন প্রকার থাকে। এছাড়া ব্যক্তি বিশেষের রক্তাল্পতা রোগ, ম্যালেরিয়া বা কোন যৌন রোগের দ্বারা রক্তের পার্থক্য সহজেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

সেই ১৯00 খ্রীষ্টাব্দে যখন ডাঃ ল্যাণ্ডস্টেইনার বলেছিলেন যে, রক্তের গ্রুপিং-এর সাহায্যে অপরাধ বিষয়ক তদন্ত খুবই কার্যকরী হবে। তখন কিন্তু তাঁর কথায় বিশেষ আমল দেয়নি।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইতালীয় পুলিশ-কর্তৃপক্ষ রক্তের গ্রুপের সাহায্যে অপরাধী-নির্ধারণকার্য শুরু করে। তারপর সারা দুনিয়া আজ তাদের অনুসরণ করে চরম সাফল্য লাভ করে চলেছে।

একবার একটি ফ্ল্যাট বাড়ির পাশের মাঠে জনৈক মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়, মৃতদেহের অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে, উক্ত বাড়ির কোন জানালা থেকে তাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছে। পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে সেই বাড়ির একটি ঘরে রক্ত-মাখা একটা তোয়ালে পায়। ঘরের মালিক অবিবাহিত এক যুবক বলে যে, দাড়ি কামাতে গিয়ে সে গাল কেটে ফেলেছিল, সেই রক্তই লেগেছে তোয়ালেটাতে। পুলিশ তোয়ালের রক্ত এবং মৃত মহিলাটার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে দুটোই এক। দুইই —'বি'-গ্রুপের। যুবকটি তবু অস্বীকার করে বলে, আমারও 'বি' গ্রুপের রক্ত। তখন পুলিশ তাকে জানায় যে, শুধু 'বি' নয় তোয়ালের রক্ত তাতে মৃত মহিলার রক্তের গ্রুপের সব কিছুই পাওয়া গেছে যেমন 'এম.এন' টাইপ প্লাস আর এইচ-১ আর এইচ-২। অথচ এগুলো যুবকটির রক্তে আদৌ নেই। অনুপায় যুবক খুনের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

রক্ত বিশেষজ্ঞ ডিটেকটিভদের ক্ষরিত রক্তেরও প্রয়োজন হয় না অনেক সময়। তারা অন্য প্রক্রিয়াতেও অপরাধী ধরতে পারেন। যেমন হল সেবার কোটিপতির কন্যা প্যাট্রিসিয়া লোনারগ্যানের বেলা। মেয়েটিকে তাদের প্রাসাদোপম গৃহের এক প্রকোষ্ঠে লগুড়াঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

সেই ঘরে টেবিলের ওপর রাখা অ্যাস-ট্রে-তে চারটি দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেল। দুটিকে আলতোভাবে নেভানো হয়েছে। বোঝা গেল দু'জন লোক ধূমপান করেছে। সিগারেটের মুখে লাগা মুখের লালা পরীক্ষা করা হল। রক্তের গ্রুপিং-এর সঙ্গে লালার নাকি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আছে। উভয়ের শ্রেণী বিভাগ এভাবে হয়ে থাকে। মেয়েটির স্বামীকে ধরে আনা হল হত্যাপরাধে,

সে অভিযোগ অস্বীকার করলো। কিন্তু পুলিশ তার রক্ত ও সিগারেটে লাগা লালা পরীক্ষা করে দেখেছে—উভয়ই এক। বাধ্য হয়ে যুবকটি শেষ পর্যন্ত খুনের কথা স্বীকার করলো।

এর থেকে আরও জটিল ঘটনা ঘটেছিল মিসেস পার্সিকোর হত্যাকাণ্ডে, উক্ত মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেল নিউ ইয়র্কের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে। তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে। একজন রাত্রিকালীন প্রহরী তার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। সে নাকি একটি লোককে ঐ বাড়ির মধ্যে দ্রুত ঢুকে পুনরায় বেরিয়ে যেতে দেখেছে। লোকটি এক রেস্টুরেন্টের মালিক। সেই মালিক কিন্তু সব অস্বীকার করে জানালো যে, মহিলাটিকে আদৌ সে চেনে না। তাছাড়া তার নিজ ঘরে কোন মহিলাকে নেওয়ার কথাতো সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তার ঘর তল্লাসী করা হল। কিন্তু পুলিশ কিছু সন্দেহজনক পেল না। মেঝেতে বিন্দুসম একটা দাগ ছিল। বেঞ্জিডিন টেস্টে অবশ্য তা রক্ত বলে প্রমাণিত হল না।

দুটো রুমালের দ্বারা মহিলাটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে। সেই রুমাল দুটো গেঁটবাঁধা অবস্থায় তখনো তার গলায় ছিল। পাশেই তার জুতো জোড়া কোন পুরুষের শার্টের দ্বারা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। শার্টটি রেস্টুরেন্ট মালিকদের গায়ের সাইজের, কিন্তু তাতে তো কিছু প্রমাণ হয় না, শার্ট ও রুমাল দুটিকে আলট্রাভাওলেট রশ্মি ও ইনফ্রারেড রশ্মিতে পরীক্ষা করা হল। অতঃপর সেগুলো গেল রক্ত বিশেষজ্ঞের হাতে। মৃত মহিলার রক্ত 'এ' গ্রুপের। রেস্টুরেন্ট মালিকের রক্ত নেওয়া হল—তার গ্রুপ 'বি' রক্ত।

রুমালে নাক ঝাড়ার দাগ পাওয়া গেল। পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে, নাক ঝেড়েছে তার রক্ত 'বি' গ্রুপের। শার্ট পরীক্ষা হল। তাতে যে ঘাম লেগেছে তাহল 'বি' গ্রুপওয়ালা রক্তধারী কোন ব্যক্তির। অবশেষে ঘরের মেঝের সেই অজ্ঞাত বিন্দুমাত্র দাগ পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা এডেমা ফ্লুইড। যখন কোন লোককে শ্বাসরুদ্ধ-করা হয় তখন ঐ ফ্লুইড, আক্রান্ত-মানুষের ফুসফুস থেকে মুখে এসে পড়ে। যার ঐ এডেমা ফ্লুইড তারও রক্ত 'এ' গ্রুপের। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট মালিকই হত্যা করেছে। সুতরাং দেখা গেল রক্ত না বেরুলেও রক্তপরীক্ষার মাধ্যমেই অপরাধী সনাক্তকরণে কোন অসুবিধা হয় না।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সার্জেণ্ট ডান, সার্জেণ্ট ওয়াটার্সকে একই প্রক্রিয়ায় হত্যা করে। দুজনেই তখন পোস্টেড ছিল জার্মানীর ডুইস বার্গে। হাত দিয়ে ওয়াটার্সের গলায় প্রচণ্ড আঘাত করে হত্যা করে ডান। ওকে প্রথমে ভুলিয়ে গাড়িতে তুলে নেয়—তারপর ব্যারাক থেকে বহু দূরে গিয়ে তাকে কণ্ঠে আঘাত হেনে হত্যা করে। অবশেষে কম্বল চাপা দিয়ে গাড়ির পেছনে করে নিয়ে আসে ব্যারাকে। একটা খালি ঘরে কড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ওয়াটার্সের দেহটাকে ঝুলিয়ে দেয়, দেখে মনে হয় ওটা একটা আত্মহত্যার ঘটনা। কর্তৃপক্ষও তাই ভাবে। পনের মাস পরে ডান

ফিরে আসে ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডে দেখা হয় তার সঙ্গে পুরনো এক সঙ্গীর—সে আগে ওদের সঙ্গে জার্মানীতে ছিল। ডান-এর কথ বার্তায় ও হাবভাবে তার কি রকম সন্দেহ জাগে। উপরওয়ালাদের জানাতে তাদের মনেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাহলে কি ওয়াটার্সের মৃত্যু আত্মহত্যাজনিত নয়?

কবরখুঁড়ে মৃতদেহ বের করা হয় এবং পুনরায় ময়না তদন্ত করা হয়। গলার আঘাত দেখে বোঝবার উপায় নেই যে ওটা ফাঁসি থেকেই হয়েছে না অন্য কোন কারণে হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল যে, ওয়াটার্সের নিম্নাঙ্গে রক্তাধিক্য দেখা গেল না, যা প্রতিটি ফাঁসিতে ঝুলে মরা লোকের দেহেই দৃষ্ট হয়। প্রমাণ হল যে, ওয়াটার্সের মৃত্যু হয়েছে বসা অবস্থায়। কিন্তু বসা অবস্থায় একটা লোক ফাঁসি লটকায় কি করে? ফাঁসিতে ঝুললেই সমস্ত-রক্ত পায়ের দিকে নেমে আসে। কিন্তু ওয়াটার্সের ব্যাপারে তা হয়নি। ডাক্তাররা প্রমাণ পেলেন যে, মৃত্যুর পরেও ওয়াটার্সের দেহ বসা অবস্থায় প্রায় একঘণ্টা ছিল। পাপের বেতন মৃত্যু। ডান আইনের হাত থেকে রেহাই পেল না।

রক্ত পরীক্ষার দ্বারা আরেকটি বিষয়ও নিরূপিত হয়। যেমন বিশেষ একটি শিশু বিশেষ একটি লোকের সন্তান, কি নয়। রক্তের গ্রুপিং অবশ্য নির্দিষ্টভাবে শিশুর জন্মদাতাকে চিহ্নিত করতে পারে না। তবে পিতৃত্বের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে দিতে পারে যে, সে বিশেষ কোন সন্তানের পিতা নয়। শিশু পিতা-মাতার রক্তের গ্রুপই পেয়ে থাকে, তবে কতকগুলো বিশেষ সম্মিলন কখনোই ঘটে না। যখন বাপ মা দুই-ই 'ও' গ্রুপের, সন্তানও হবে 'ও' গ্রুপের। আবার মা 'এ' বাপ 'বি'-র সন্তান উক্ত যে কোন একটা গ্রুপের হতে পারে। কিন্তু পিতামাতার যে কোন একজনের যদি 'এ বি' গ্রুপের রক্ত হয় তো সন্তান কোন ক্ষেত্রেই 'ও' গ্রুপের হবে না। এর ওপর যদি আর-এইচ বা এইচ আর প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ধরা যায় তাহলে আরও বহু ব্যতিক্রম পাওয়া যেতে পারে।

বছর কুড়ি আগে এই পিতৃত্ব নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডে। একজন মহিলার জমজ পুত্র সন্তান হয়। দুটি অবশ্য এক চেহারার হয়নি। যখন ছেলে দুটির পাঁচ বছর বয়েস তখন একদিন তাদের বাবা একই শহরের এক পার্টিতে যোগদান করতে যান। সে বাড়ির পাঁচ বছরের ছেলেকে দেখে চমকে ওঠেন ভদ্রলোক। আরে! এযে তাদের জমজ সন্তানদের একজনের হুবহু প্রতিমূর্তি। এক চেহারা, এক রঙ, এক ধরনের চুল, হাসি চলন-বলন সবই এক। খোঁজ-খবর নিয়ে ভদ্রলোক জানতে পারলেন যে, এই ছেলেটিও একই দিনে একই হাসপাতালে তাঁর জমজদের সঙ্গে জন্মলাভ করে। তাঁর সন্দেহের কথা ছেলেটির বাপ মায়ের কাছে তিনি বলেন। তাহলে কি সন্তান বদল হয়েছে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক কারণেই কিন্তু অস্বীকার করলো, না বদল হওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়। উভয়

বাপ-মাই রক্ত পরীক্ষা করতে সম্মত হল। কোন ফল দর্শালো না তাতে, সবারই রক্তের গ্রুপ 'এ'।

অতঃপর শরণ নেওয়া হল রক্ত বিশেষজ্ঞের। প্রত্যেকের রক্তের নমুনা নিউ-ইয়র্কের ডাঃ ওয়েশরের কাছে পাঠানো হল পরীক্ষার জন্য। ডাঃ ওয়েশর পরীক্ষা করে একটি যমজ ও সেই পাঁচবছরের ছেলেটির একই পেলেন। যমজের একটির রক্তপাওয়া গেল 'এ'—'এম এন'—'আর এইচ-১', 'আর এইচ-২' কিন্তু অপর জমজের রক্তে পাওয়া গেল 'এ'—'এম এন'—'আর এইচ'। তৃতীয় ছেলেটির রক্তও দেখা গেল যমজের একটির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। যমজের মায়ের রক্ত পরীক্ষা করেও দেখা গেল তৃতীয় ছেলেটির সঙ্গে 'আর এইচ' ফ্যাক্টরে মিলে যাচ্ছে।

বোঝা গেল, হাসপাতালে অবশ্যই ছেলে বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিল। উভয় পিতামাতাই অশ্রুসজল হাসিতে যার যার সন্তান ফেরৎ পেল।

রক্তের সাহায্যে যে কত ভাবে অপরাধী ধরা পড়ে তা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

সেবার যে রকম ধরা পড়লো অগাস্টা ন্যাক নাম্নী এক যুবতী ও তার প্রেমিক মার্টিন থের্ন। তারা দু'জনে মিলে উইলি গুলডেনসুপে নামক এক যুবককে হত্যা করে। শেষোক্ত যুবকটি ছিল উক্ত মেয়েটির প্রতি আসক্ত। মেয়েটি কিন্তু ঘৃণা করত তাকে।

লং আইল্যাণ্ডে একটি ভাড়া করা বাড়িতে শেষোক্ত যুবকটিকে তারা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যায় এবং বাথ টাবের মধ্যে কেটে টুকরো টুকরো করে। তারপর সেই দেহাংশগুলো নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেয়।

টুকরো অংশ পেয়ে পুলিশ নিহত ব্যক্তি বা অপরাধীর কোন কিনারা করতে পারে না। আসামীরা বেশ নির্বিঘ্নেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধরা পড়বার কোন আশংকাই তাদের ছিল না।

কিন্তু ফ্যাসাদ বাঁধালো একটা ব্যাপার। উক্ত বাড়িটির পেছনে ছিল একটি পুকুর। বাথ টাবের রক্ত গিয়ে পড়লো তাতে।

তারপর জনৈক চাষী সবিস্ময়ে দেখলো যে, তার পোষা হাঁস দুটি যখন সন্ধ্যেবেলা সে পুকুরে চরে ফিরে এল, তাদের রঙ তখন টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। চাষী সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ পাশের সেই বাংলো তল্লাসী করে সেই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের হদিশ পায়।

বাড়িওয়ালার বিবৃতি মাফিক তারা অতঃপর খুনে যুবক-যুবতীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। সবই ঘটলো একজোড়া রক্তবর্ণ হাঁসের সৌজন্যে।

এ জন্যেই বলা হয়ে থাকে ঃ রক্ত কথা কয়।

ষাটের দশকে এক ডিসেম্বরে, জনৈক ক্রোড়পতি মার্কিন বিজনেসম্যান তার ৭১ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে 'সন্ধ্যা থেকে সকাল' অবধি চলা এক পার্টি দেন। উপস্থিত অতিথি বর্গ বিজনেসম্যান ভদ্রলোকের এই বয়সেও যুবকের মত আকৃতি এবং নিঃসীম জীবনী শক্তি দেখে তাজ্জব বনে যান। তাঁকে মনে হচ্ছিল বড় জোর ৫৫ বছর বয়সের মানুষ। সব রকম নাচে অংশগ্রহণ করছিলেন। যখন অপরাপর তাঁর আর্ধেক বয়সের পুরুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, ভদ্রলোকের দেহে বা হাবভাবে তখনও দুরন্ত এনার্জি চলকে উঠছিল, ক্লান্তি তো দূরের কথা।

—বড় বিস্ময়ের ব্যাপার দেখছি, উপস্থিত এক অতিথি অবাক মেনে বলে উঠলেন, দেখে শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক যেন সত্যিই ফাউন্টেন অফ ইউথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

—প্রায় তাইই, বিজনেসম্যান ভদ্রলোক জনৈক বন্ধু বলে ওঠেন, ইনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে, 'যৌবন ঝর্ণা' সত্যি সত্যিই বর্তমান—আর জেনেও গেছেন কে তার মালিক।

এই একাত্তর বছর বয়স্ক ক্রোড়পতি শুধু একা নন, আরও অজস্র মানুষজন ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে, সুইজারল্যাণ্ডের ডাক্তার পল্ নিয়েহান্সের হাই পোডার্মিক নিড্‌ল এবং সিরিঞ্জের মধ্যে প্রকৃতই রয়েছে ফাউন্টেন অফ ইউথ বা যৌবনদায়ী ঝর্ণা।

বিশ্বের প্রখ্যাত বাঘা বাঘা পৌঢ় ও বৃদ্ধ মানুষের ডাঃ নিয়েহান্সের কায়কল্প চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে যৌবনশক্তি দিয়ে পেয়েছেন।

উক্ত প্রখ্যাত ডাক্তারের পেশেণ্ট তালিকায় ছিল ঃ

পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলার কনরার্ড আদেনুর, ৮৮ বছর বয়সেও যার অদম্য জীবনী শক্তি এবং অকল্পনীয় মনোবল কিংবদন্তী স্বরূপ হয়ে গেছে। ফরাসী নৃত্য শিল্পী ৭১ বছর বয়সের শেভালীয়ার।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ডব্লু সমারসেট মম, যিনি ৯০ বছর বয়সেও ৬০-এর মত উদ্যম ও কর্মশক্তি দেখিয়ে গেছেন।

মার্কিন অর্থনীতির প্রবীন রাজনীতিক বার্নার্ড—বারুচ যিনি ৯৪ বছর বয়সেও যুবকদের মত চলাফেরা এবং কাজকর্ম করে গেছেন।

সাইলেন্ট যুগের প্রখ্যাত হলিউড অভিনেত্রী গ্লোরিয়া সোয়ানসন, যাকে প্রথম বারের মত কেউ দেখলে, তার মুখ, ফিগার ও এনার্জি দেখে কেউই বিশ্বাস করতে পারত না যে, তখন তাঁর বয়েস ৬৫। মনে হত মধ্য তিরিশের কোন পূর্ণাঙ্গ যুবতী।

স্যার উইনস্টন চার্চিল, চার্লি চ্যাপলীন, ডিউক অ্যাণ্ড ডাচেস অব্ উইণ্ডসর, মরক্কোর রাজা সৌদি আরবের রাজা, নোয়েল কাওয়ার্ড প্রভৃতি হলেন ডাক্তার নিয়েহ্যান্সের বিখ্যাত পেশেন্টদের মধ্যে-উল্লেখযোগ্য। এই সুইস যাদুকর ডাক্তারের চিকিৎসায় তাঁরা জীবন থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর ছেটে ফেলে যৌবন শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন।

মৃত দ্বাদশ পোপ পায়াসও এই ডাক্তারের চিকিৎসায় জীবনের আয়ু বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৬৩-তে ষষ্ঠ পোপ পল ডাঃ নিয়েহান্সকে রোমে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য।

দ্বাদশ পোপ পায়াস নিয়েহান্স-এর নাম জানতেন। ব্যাভেরিয়ান নার্স সিষ্টার প্যাসকোয়ালিনা লহেনব্যাট বহুবার মহামান্য পোপের কাছে এ ডাক্তারের উল্লেখ করেছিলেন, ফলে পোপও স্মরণে রেখেছিলেন ডাক্তারের নামটি। পোপ খুবই স্নেহ করতেন উক্ত নার্সটিকে। তাই নার্সের কথাবার্তা মনদিয়ে শুনতেন। প্রথম যখন এই প্রোটেস্টান্ট ডাক্তারকে পোপ সমীপে উপস্থিত করা হয় তার পেছনে অবশ্যই নার্সটির সম্মতি ছিল। ১৯৫৩-র ১৪-ই অক্টোবর ডাঃ নিয়েহ্যান্স সস্ত্রীক গিয়ে ভ্যাটিকানে উপস্থিত হন প্রাইভেট দর্শক হিসেবে ১৯৫৪-তে-ভ্যাটিকান থেকে একটি আতঙ্কিত ফোন কল আসে তাঁর কাছে। এক ঘন্টার মধ্যেই ডাক্তার গিয়ে উপস্থিত হন এয়ারপোর্টে, সন্ধ্যায় পৌঁছে যান ক্যাস্টেল গ্যাণ্ডেলফোতে যেখানে পোপ তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

ডাঃ নিয়েহ্যান্স দ্বিতীয় দিন থেকেই পোপের অঙ্গে সেলুলার ইনজেকসন দিতে থাকেন। নিরাপদে ইনজেকসন দেবার পর তিনি অপরাপর সহায়ক চিকিৎসাও করতে থাকেন। টানা দু'মাসের মত সেখানে থেকে তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যান মরণোন্মুখ পোপ-এর। বিস্ময়করভাবে পোপ আরোগ্য হয়ে ওঠেন। সারা পৃথিবীতে এই অবাক চিকিৎসা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। প্রতিটি সংবাদপত্রেই এই খবর প্রকাশিত হয়। ভ্যাটিকানও এ-সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে।

সুইজারল্যাণ্ডের যাবতীয় ডাক্তার নিয়েহ্যান্সের ভক্ত হয়ে পড়ে। তিনি এমন এক অবাক চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছেন যার ফলে মানুষ জরা বার্ধক্য থেকে মুক্ত হয়ে আয়ু বাড়াতে সক্ষম এবং দেহ মনে স্বাস্থ্যও উৎসাহে পুনরুজ্জীবিত হয়ে যায়। বয়েস যেন কমে যায় বিশ তিরিশ বছর।

ডাঃ নিয়েহ্যান্স ৮২ বছর বয়সেও নিজের উদ্ভাবিত চিকিৎসাগুণে হয়ে উঠেছিলেন

নিজ চিকিৎসা পদ্ধতির এক জলন্ত বিজ্ঞাপন। ৮২তে ৬০ বছরের মত দেখতে। গণ্ডদ্বয় রক্তাক্ত, মুখে স্বাস্থ্যের পরম জ্যোতি। হাতদুটি যুবকদের মত, মুষ্ঠি দিয়ে চেপে ধরলে ছাড়ানো মুস্কিল। পাকা চুল ঘন এবং শক্ত মূল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং মানবদেহের প্রধান অঙ্গের জীর্ণ পুরাতন সেলসমূহকে পাল্টে নবযৌবনলাভের আইডিয়া মাথায় আসে। তিনি চিন্তা করলেন বার্ধক্যে মানুষের প্রধান প্রধান অঙ্গে গ্ল্যাণ্ডসমূহ যা কিনা লক্ষ কোটি সেল-এর দ্বারা গঠিত, ক্রমশই নষ্টজীর্ণ কমজোরি হয়ে যায়। যদি সেই সেলগুলোকে নতুন করে কার্যকর করে তোলা যায় তাহলে অঙ্গসমূহকে পুনরায় যুবক-সদৃশ করে তোলা সম্ভব হবে।

হেড সার্জন ডাঃ নিয়েহ্যান্স অবসর সময়ে তাঁর এই থিওরী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৯৩১ এর এপ্রিল মাসে জনৈক তরুণ সার্জন জনৈকা মহিলার গলগণ্ড অপারেশন করতে গিয়ে মারাত্মক এক প্রমাদ ঘটিয়ে বসলো। সে অসতর্কতায় তার ছুরি কয়েক মিলিমিটার গভীরে চালিয়ে পেশেন্টের শুধু যে থাইরয়েড তুলে নিয়ে এল তাই নয়, প্যারাথাইরয়েডেরও কিছু অংশ কেটে ফেলে গুরুতর ক্ষতি-সাধিত করে দিল।

তৎক্ষণাৎ টেলিফোন যোগে ডাঃ নিয়েহ্যান্সকে এ বিপদের কথা জানানো হল। শুনে চমকে উঠলেন তিনি। এতে তো পেশেন্টের অবধারিত মৃত্যু হবে। তিনি এক বৈপ্লবিক চিকিৎসা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন মাহিলাটিকে বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টায়।

তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীর অধীন গোশালায় গিয়ে একটি গর্ভবতী গরুকে সিজারিয়ান অপারেশন করে গর্ভস্থ পুংভ্রূণের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বার করে নিলেন। অতঃপর তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে নিয়ে স্যালাইন সলিউসনের সঙ্গে মিশ্রিত করে দ্রুত চলে গেলেন সেই হাসপাতালে।

—আমি ঐ মিকচার সরাসরি মহিলাটির ক্ষতিগ্রস্ত গ্ল্যাণ্ডে ইনজেক্ট করে দিলাম, পরে ডাক্তার নিয়েহ্যান্স বলেছিলেন, মহিলাটি বেঁচে গেল। শুধু তাই নয় আজও সে বেঁচে বর্তে আছে ভালভাবেই, বর্তমানে তার বয়েস ৯২।

এবার, ডাক্তার মনে মনে ভেবে নিলেন, যে কোন অসুস্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত গ্ল্যাণ্ডের স্থানে স্বাস্থ্যবান প্রাণীর সেই সেই গ্ল্যাণ্ড কেটে নিয়ে এসে ইনজেকসন করলে রোগী পূর্বের স্বাস্থ্য অবশ্যই ফিরে পাবে।

এই ভাবেই "সেলুলার থেরাপীর" জন্ম হল। তিনি ভেবে নিলেন যে, যদি প্রাণীর গ্ল্যাণ্ড সেল-এর ইনজেকসন ক্ষতিগ্রস্ত মানব গ্ল্যাণ্ডকে সারিয়ে তুলতে পারে তাহলে যেসব গ্ল্যাণ্ড বয়সের ভারে বার্ধক্যে জরাজীর্ণ হয়ে যায় তাদেরও পুনর্যৌবন লাভ করানো সম্ভব।

তিনি তার থিয়োরীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অভিমত দিলেন এটা সত্যি সত্যিই কার্যকরী হচ্ছে। বার্ধক্যের জীর্ণতা এ চিকিৎসায় নবজীবনলাভ করছে। তিনি জানালেন, এ ব্যাপারে সদ্য মারা ভেড়ার গ্ল্যাণ্ড সেলসমূহই সর্বাধিক কার্যকরী। এই পদ্ধতি তিনি চালিয়ে গেলেন। গ্রন্থি বদল শুরু হয়ে গেল নিরবচ্ছিন্নভাবে। ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দিকবিদিকে। বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি এ চিকিৎসায় ফল পেয়ে চারদিকে বলে বেড়াতে থাকলো। হু হু করে প্রচুর ধনী বৃদ্ধরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হল।

লেক জিনিভার তীরে অবস্থিত 'ক্লিনিক দ্য লা প্রেইরী'তে ধনী রোগীদের নিরবচ্ছিন্ন মিছিল শুরু হয়ে গেল। সেসব বিশিষ্টদের মধ্যে ইয়েমেনের ইমাম, প্রখ্যাত অভিনেত্রী পলেট গডার্ড, এবং ভিভেতে সে সময় বসবাসকারী স্বয়ং চার্লি চ্যাপলিনও।

সেলুলার থেরাপীর পর তারা প্রত্যেকেই জানালো যে, বহুকাল বিগত যৌবন তারা পুনরায় ফিরে পেয়েছে। আশি বছরে চার্লি চ্যাপলিনের সন্তানের পিতা হওয়াই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেহ মন দুদিকেই তাদের যৌবন প্রাপ্তি হয়েছে। পুরুষত্বহীনতা সেরে গেছে। ডাক্তার নিয়েহ্যান্সের মতে কোন কোন রোগী খুবই দ্রুত চিকিৎসায় উপকৃত হয়। মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই। সাধারণ ক্ষেত্রে মাস তিনেক লাগে। চিকিৎসাকালীন ধূমপান বা মদ্যপান নিষিদ্ধ। বছর চল্লিশ বয়সের রোগীদের আর ক্লিনিকে ফিরে আসতে হয় না। অবশ্য বয়স্কদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার ফল খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বৃদ্ধরাই কিন্তু উপকৃত হয় বেশি। তাই বার বার চিকিৎসা করাতে ঘুরে ফিরে আসে তারা। প্রকৃত 'ইয়ং' থাকতে গেলে দুবছর অন্তর এসে তাদের সেলুলার থেরাপী নিয়ে যেতে হয়।

১৯৫২তে নিয়েহ্যান্স ডিহাইড্রেসনের এবং দ্রুত শৈত্যে জমিয়ে ফেলবার মাধ্যমে ড্রাই সেল তৈরির নিখুঁত এক পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেন। বর্তমানে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছে ইয়োরোপের ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশে। জাপানও এটা গ্রহণ করেছে। এটার নাম, সিক্কাসেল। এই বিশুষ্ক সেল-এর সুবিধে হল একে বহুকাল রক্ষণ করা চলে, রপ্তানীতে সুবিধে। তাজা সেল-এ সে সুবিধে আদৌ নেই। ডাঃ নিয়েহ্যান্সের মতে অবশ্য তাজা সেলই সর্বাধিক কার্যকারী এ চিকিৎসায়।

এবার দেখা যাক কিভাবে সেলুলার থেরাপী দেওয়া হয়।

ইনজেকসনের পর রোগীকে চারদিন প্রায় নড়নচড়নহীন অবস্থায় শয্যাগত থাকতে হয়। পঞ্চম দিনে স্বাভাবিক চলাফেরা করবে, তবে অত্যধিক শ্রমের কোন কার্য নয়, ক্লান্ত নয়। প্রথম চারদিন হালকা আহার। ভেজিটেবল সুপ, দুধ ও দুগ্ধদ্রব্য, ভেজিটেবল, ফলফলাদি। চতুর্থ দিনের আগে কোন মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ।

পরবর্তী পনের দিন মশলা দেওয়া বা স্টু-করা খাদ্য চলবে না। গরু, শূকর বা চিংড়ি জাতীয় খাদ্য বারণ। সাধারণ মাছ চলবে।

যে কোন আকারের অ্যালকোহল বা মদ কয়েক সপ্তাহের জন্য নৈব নৈবচ। মাসখানেক তো কোনপ্রকার ধূমপান বা তামাক জাতীয় নেশাদ্রব্য গ্রহণ চলবে না। এ সময় রোগীর মধ্যে ক্লান্তভাব ও দুর্বলতা লক্ষিত হয় মাসাবধিকাল। তবে তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। যত খুশি ভিটামিন খাওয়া চলবে, তা তাজা খাদ্য থেকেই হোক বা ট্যাবলেটেই হোক। তাজা খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী হল, ফল, সবুজ সবজি, কাঁচা দুধ, মাখন, ক্রীম, কডলিভার অয়েল প্রভৃতি।

আধঘন্টা আগে গর্ভবতী গরু বা ভেড়ার ভ্রূণ থেকে সংগৃীত ঔষধ দ্রুত ইনজেকসনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অতঃপর ঠিক সকাল নটার সময় পেশেন্টকে ইনজেসন দেওয়া হয়, তার কিছু আগে চা, শুকনো টোস্ট দিয়ে হাল্কা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেয় রোগীরা।

রোগীদের বলে দেওয়া হয় যার আরোগ্য হবার ইচ্ছা যত প্রবল তত দ্রুত ফল সে পেয়ে যাবে। Heaven helps those who help themselves…… .

ডাঃ নিয়েহ্যান্স শুধু পুনর্যৌবনলাভই নয় আরও অনেক ব্যাপারে নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন। যথা, হাঁপানী, হাড়ক্ষয়-জনিত রোগ, নার্ভাস সিসটেম, দাঁতের, অধিক ধূমপান বন্ধের চিকিৎসা, এমন কি স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব ও নিরাময় করেছেন?

কথা উঠেছিল ক্যানসার আক্রান্ত স্থানে নতুন সেল লাগালে কি তা নিরাময় হয়? ডাঃ নিয়েহ্যান্সের মত হল, দুর্বল অঙ্গকে সবল করা সম্ভব হলেও রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চাঙ্গা করে তোলা সেল-থেরাপীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সুদীর্ঘ ২৮ বছরের যন্ত্রণাদায়ক জীবনযাপনের পর যুবক চার্লস ম্যাকলিওড অবশেষে ১৯৫৪-তে মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে হল চার্লটি ম্যাকলিওড নাম্নী ২৯ বছরের ভরা যুবতী।

এই সেক্স-চেঞ্জ ওর জীবনে আকাঙ্ক্ষিত চিরসুখ বা সামাজিক স্বীকৃতি এনে দেবে কিনা সেটা অনাগত কালই একমাত্র বলতে পারে।

১৯৫৩-তে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনস্থ কোন একটি রান্নাঘরের টেবিলে এই অপরিপক্ক অপারেশনটি সংঘটিত হয়। নামকরা কোন ডাক্তার এই কেসটিকে হাতে নিতে রাজি হয়নি, কেননা ইতিপূর্বে এই ধরনের অপরাপর কেস-অপারেশনের বড় বেশি পাবলিসিটি হয়েছিল, দেশের সরকারের সেটা খুবই ছিল না-পছন্দ।

ম্যাকলিওডকে অপারেশন করে তার পুংসেক্স গ্ল্যাণ্ড-সমূহকে বের করে আনা হয়। পেশেন্ট মনে করেছিল যে এরফলে সে যে আমেরিকান সমাজে একজন মিস-ফিট এ মনোভাবের তার নিরসন হবে। এটি করার তার দৈহিক এবং মানসিক কতগুলো কারণ ছিল।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সে মার্কিন দেশে বাপমায়ের একমাত্র সন্তান হয়েই জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক ছেলে হয়েই জন্মেছিল সে। অবশ্য বাপ-মা তাকে দেড় বছর পর্যন্ত মেয়ের ড্রেস পরাতো, আর বেশ বড় বয়েস পর্যন্ত তাকে প্রায় বিব্রত করে "বেবি চার্লস" বলে ডাকা হত।

১২ বছর বয়সে নিমোনিয়া রোগে ভোগার পর – একের পর এক রোগে ভুগে চললো সে। ক্রনিক মাইগ্রেইন রোগটি বিচিত্র বিস্ময়করভাবে প্রতি আঠাশ দিন অন্তর এসে ওকে ভোগাতে লাগলো।

বয়ঃ সন্ধিকালে ওর দেহগঠনে কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার দৃষ্ট হল।

ছেলেদের কোন খেলাধুলায়ই তার উৎসাহ ছিল না। একবার স্কুলের বাইরে ক্যাম্প করতে গিয়ে বক্ষদ্বয়ের অস্বাভাবিক স্ফীতির জন্য সঙ্কোচে কিছুতেই সাঁতার কাটতে রাজি হল না।

১৬ বছর বয়সে ছেলের মেয়েলিভাব কাটিয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে ওর বাবা ওকে বহুদূরের মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে গিয়ে সে খুবই বিব্রত হয়ে পড়লো মার্চ করা এবং কায়িক ব্যায়াম করবার অক্ষমতায়।

২০ বছর বয়সে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল সে যখন নিজেকে 'পুরুষ রূপে প্রমাণিত' করবার জন্যে ৯০ দিনের এক মিলিটারী চাকুরীতে নিযুক্ত হল।

ততদিন তার জীবন মানসিক দিক থেকে এক পরম যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। দু-দুবার সে আত্মঘাতী হবার বিফল চেষ্টা করলো।

সে নিউ অর্লিয়েন্সের এক সমকামী কলোনীতে বসবাস করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে জীবনও তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠলো।

জনৈক সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে পরীক্ষা করে জানালো তার পক্ষে ওকে কোন প্রকার সাহায্য করা মোটেই সম্ভব নয়। পরম হতাশা নিয়ে সে চলে গেল ব্যক্তিগত-ভাবে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় নিজদেশ ডেনমার্কে। ততদিনে গলার স্বর তার এমন হয়েছে যে, ফোনে মনে হত কোন মেয়ে কথা বলছে।

ম্যাকলিওডের যখন ১৯ বছর বয়স তখন তার বাবা মার বিচ্ছেদ হয়ে যায় কয়েক বছরের পারিবারিক অশান্তির ফলে। ওকে চলে যেতে হয় এক দিদিমার সংসারে। তখনই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে পুরোপুরি মেয়েলি মেয়েলি ভাব। ২১ বছর বয়সে তার মুখাবয়বে দেখা দিয়েছে যুবতীসুলভ লাবণ্য।

অতঃপর ২৮ বছর বয়সে কায়িক মানসিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির আশায় সে চলে যায় নিজ পিতৃভূমি ডেনমার্কে। তারপর তো শল্যচিকিৎসান্তে মেয়েতে রূপান্তরিত হল।

নিজ জীবনের অতীতের কথা বলতে গিয়ে সে জানায়, যুবক থাকাকালীন সে কখনোই মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি বা কোন মেয়ের সঙ্গে ডেটও করেনি। সে রকম কোন ইচ্ছেও হয়নি কখনো। মেয়েদের সে বন্ধু বা ভাইয়ের মত ভাবতো যাদের কাছে নিজ মনের গোপন কথা বিশ্বাস করে বলা যায়।

এয়ার ফোর্সে ঢুকে যুদ্ধকালীন এক বড় বেস্-এ যখন ছিল তখন তার লাবণ্যময় চেহারা দেখে একাধিক সহকর্মী সুন্দর যুবকদের দ্বারা সে এত বিব্রত হয়েছে যে, সে কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। তারা ওকে মেয়ে ভেবে যেন কামজ কামনায় এগিয়ে এসেছিল।

নিজের পুরুষত্ব প্রমাণের জন্য সে গিয়ে আর্মিতে যোগ দেয়। অবশ্য অপর এক কারণে ৯০ দিনের সে চাকরী থেকে সসম্মানে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিডনীর সেই আকস্মিক গণ্ডগোলই তাকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেয় চরম তপ্তস্তত হওয়া থেকে।

অতঃপর সে নিজ শহরে ফিরে যায় এবং বাবার ইন্সিওরেন্স বিজনেসে লেগে পড়ে। কিন্তু সেখানেও সে নিজেকে মিসফিট অর্থাৎ অনুপযুক্ত হিসেবে অনুভব করে।

পিতার নির্দেশে সে মেমফিস শহরে গিয়ে এক ব্যাঙ্কে কাজ নেয়। এখানেই সে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দু'দুবার আত্মহত্যার নিষ্ফল চেষ্টা করে।

এরপর চলে যায় নিউ অর্লিয়েন্সে। হোমো সেক্সুয়েল কলোনীতে। অল্পদিন বাদেই সে বুঝতে পারে এই উদ্ভটকামী কলোনীবাসীদের সঙ্গে মানিয়ে চলা তো

দূরের কথা, ওদের সে সহ্যও করতে পারছে না। এদের আবহাওয়া আচার ব্যবহার জঘন্য, অসহনীয়।

অবশেষে যখন ডাক্তারেরা এবং সাইকিয়াট্রিস্টরা জানালো ওর ব্যাপারে কিছু সাহায্য করা তাদের পক্ষে অসাধ্য, তখনই সে একটা হেস্ত নেস্ত বেপরোয়া ভাব নিয়ে নিজের মুক্তি অভিলাষে ডেনমার্কগামী জাহাজে গিয়ে ওঠে।

সেখানে পৌঁছে সে বিপুল ডোজ-এর বেশ কিছু ফিমেল হরমন ইনজেকসন নিতে শুরু করে। আর ড্যানিস-পুলিশদের অনুমতিক্রমে মেয়েদের পোষাক পরতে আরম্ভ করে।

এ সময় জনৈক যশস্বী-ডাক্তার চার্লসের এই বিরক্তিকর অবস্থা দৃষ্টে করুণাপরবশ হয়ে ওর দেহে পর পর কয়েকটি সেকস-চেঞ্জ অপারেসন করতে সম্মত হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ই এপ্রিল চার্লস ম্যাকলিওড ফিরে যায় মার্কিন দেশে। সঙ্গে যে পাশপোর্ট ছিল তাতে নামের স্থানে লেখা ঃ চার্লটি ম্যাকলিওড। ওখানে পৌঁছে সে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেল তাতে সে যুগপৎ বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়ে গেল। সে একজন আজগুবী দর্শনীয় বস্তু সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি প্রেস তাকে অভ্যর্থনা জানালো অতিকর্কশ ও যাচ্ছেতাই ভাষায়। তবে পুরনো বন্ধুরা ওকে ভালভাবেই গ্রহণ করলো এবং ফটোসহ অজস্র সেক্স-চেঞ্জিং অপারেশন-এর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে বলে আন্তরিক সমবেদনা-ও জানালো। তার নিঃসীম মনোবলের প্রশংসাও করলো।

মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া তার বাবা, যে এক সময় ওর মেয়েলী স্বভারের জন্য কতই না ভৎ'সনা করেছে, সেও মেয়েতে রূপান্তরিত চার্লটি-কে আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করে নিল।

এখন নিঃসীম ভবিষৎ প্রমাণ দেবে আবাল্য প্রার্থীত এই মেয়ে রূপান্তর চার্লস বা চার্লটিকে তার সাধনোচিত শান্তিসুখ দেবে কিনা এবং সমাজের সর্বস্তরে সসম্মানে গৃহীত হবে কিনা।

১৫

॥ ভি. ডি. ট্র্যাকারের বিচিত্র কাহিনী ॥

ওদের দেহমিলনের পাঁচমিনিটের মধ্যেই ফোন বেজে উঠলো। ত্রস্তে দু'জনে আলাদা হয়ে গেল। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী। এক কালে কোরাস গার্লদের মতই দেহসৌষ্ঠব ছিল। বর্তমানে রিসেপসনিস্টের চাকুরে। ওকে বারেক দেখলে দ্বিতীয়বার চাইতেই হয়। রমণীমোহন যুবক স্টিভের 'মিস্ট্রেস' মেয়েটি।

—যাও ফোনটা ধরো গিয়ে, মেয়েটি বলে প্রেমিককে, হয়ত তোমার কোন পুরনো লাভার গার্ল ডাকছে।

স্টিভে ইয়ং মৃদু হাসলো। ছফুট দীর্ঘ ২৯ বছর বয়সের লেডিকীলার তরুণ। মেয়েরা ওর মধ্যে বুঝি চুম্বকের আকর্ষণ অনুভব করে। ডনজুয়ান, ক্যাসানোভা টাইপের ছেলে, বসবাস করে সাম্প্রতিক প্রেমিকারূপী মিস্ট্রেস লীন-এর ফ্ল্যাটে। অপরাপর মেয়েরা প্রয়োজনে ওকে এখানেই ফোন করে। বর্তমানের আজব দুনিয়ায় লেডিজম্যান হয়ে বিভিন্ন নারী সান্নিধ্যে এক বিচিত্র জীবনই যাপন করে চলেছে সে।

স্টিভে লিভিংরুমে গিয়ে ফোনটা তুললো। লং ডিসটেন্স কল ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে। ওয়াণ্ডা, মনে মনে ভাবলো সে, কি চায় আবার মেয়েটা?

—হ্যালো, স্টিভে?

—বলো হানি।

—তোমায় একটা জরুরী কথা বলবার আছে। ক্ষেপে যেওনা প্লিজ? তোমার এটা জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

—কি ব্যাপার বলো? গম্ভীর কণ্ঠে স্টিভে জিগ্যেস করে।

—আমার ডাক্তার বলেছে, 'ওয়াণ্ডা থেমে থেমে বলে যায়', মানে আমি যাদের সঙ্গে শুয়েছি তাদের সাবধান করে দিতে বলেছে। মানে হানি, ডাক্তার জানিয়েছে সিফিলিস আছে আমার। আমার ঐ ইডিয়ট স্বামীটার জন্যই···

শুনে অবশ হয়ে গেল স্টিভে। সে নিজ দেহেও কিছুটা টের পেয়েছে। তবে ঐ রোগটার কথা তার মনে হয়নি। ভেবেছে অত্যধিক নারী সঙ্গের ফলেই বুঝি···

ভীতকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এ ব্যাপারে সিওর?

—হ্যাঁ পরীক্ষায় পজিটিভ পাওয়া গেছে, অনুতপ্ত কণ্ঠে যুবতী বলে যায়, হানি, তুমি এক্ষুণি কোন ডাক্তার দেখাও।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা আর বলতে হবে না। গুডবাই।

স্টিভে ফিরে এল বেডরুমে। লীন এমন একটা নেগলিজি অঙ্গে পরেছে যাতে লজ্জা নিবারণের চেয়ে নগ্নতাই উৎকট হয়ে উঠেছে।

—কি, ডাক পড়েছেতো কোন ছুঁড়ির কাছ থেকে, কৌতুক হেনে লীন এক পেগ মদ্যপান করে বললে, বেশ আজ রাতে তোমায় ছুটি দিলাম মুখ পাল্টাতে।

স্টিভে নিজের জন্য এক পেগ ঢাললো। মনে মনে ভাবতে লাগলো একথাটা ওকে বলা ঠিক হবে কিনা। যদি ঐ রোগ তার ধরে থাকে তবে লীনও সংক্রামিত হয়েছে। না, আগে থেকে ভয় পাইয়ে লাভ কি। হয়ত এটা মিথ্যেও হতে পারে। লীন তার প্রেমিকাদের মধ্যে সেরা সেক্সি মেয়ে, ওকে হারাতে সে রাজি নয়।

পরদিন সকালেই শিকাগোর এক মিউনিসিপাল হাইজিন ক্লিনিকে গেল। পরীক্ষায় প্রমাণ হল সত্যিই সে প্রাইমারি সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বারো লক্ষ-ইউনিটের প্রকেইন পেনিসিলিন ইনজেকসন শুরু হয়ে গেল।

—ভয় পাবেন না, ডাক্তার অভয় দিয়ে বললে, সেরে যাবেন। তিনদিন বাদে দ্বিতীয় ইনজেকসনটা নিয়ে যাবেন। আর আমাদের হেলথ প্রগ্রাম রিপ্রেজেন-টেটিভের সঙ্গে একটু কথা বলে যান।

—কি সম্বন্ধে কথা ?

—এই রোগের এপিডেমিক চেইনে যারা যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের রোগ সন্ধান ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবার জন্যে। নয়ত তাদের দ্বারা রোগটা আরো ছড়িয়ে যেতে পারে।

স্টিভের মুখ মেঘাক্রান্ত হল,—ধরুণ, আমি যদি কারুর নাম প্রকাশে রাজি না থাকি ?

—আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে জোর জবরদস্তি করতে পারি না, তবে, এটা আপনার সেইসব রোগাক্রান্ত মানুষদের মঙ্গলের কথা ভেবেই বলা উচিত। সিফি-লিস চিকিৎসিত না হলে কালক্রমে রোগীর হার্ট, ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ডের নিদারুণ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। যদি তারা হার্ট অ্যাটাকে মারা নাও যায়, তাহলেও তারা খোঁড়া, অন্ধ, বিকৃতমস্তিষ্ক কিংবা আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দুঃসহ জীবন-যাপন করে যাবে আমৃত্যু। তাদের সাহায্য করা আপনার মহান কর্তব্য, নয় কি ?

ছোট্ট একটি ইনটারভিউ করে এরপর স্টিভে চার ঘন্টা ধরে কথা বলে গেল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাতাশ বছর বয়সের জ্যাক সুলিভ্যানের সঙ্গে। শিকাগো ভি. ডি ক্লিনিকে যুক্ত ফেডারেল প্রগ্রাম রিপ্রেজেনটেটিভ সে। এ কাজে অসীম ধৈর্য্যসহ ও চতুরতার প্রয়োজন। এই গুপ্ত রোগের রোগীরা লোকলজ্জায় মুখ খুলতে চায় না কিছুতেই, তাই বাক চাতুর্যে, এবং নম্র বিনয়ে সহানুভূতির সঙ্গে এবং মান-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে এই ভি ডি ইনভেস্টিগেটরদের কাজ করে যেতে হয়। দেশময় রোগটিকে নির্মূল করবার অভিযানে এরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বিভিন্ন বয়সের ও বিচিত্র স্বভাবের রোগাক্রান্তদের মুখোমুখি হতে হয় এদের। ভীত সন্ত্রস্ত

কিশোরী, তিক্ত স্বামী, ভয়ে উন্মাদ স্ত্রী, মুখ বন্ধ করা গণিকা, ক্রুদ্ধ অভিজাত শ্রেণী, ঠাণ্ডা শীতল সমকামী নরনারী, এদের একেক জনের সঙ্গে এক এক কৌশলে অগ্রসর হতে হয়। এ রোগ এমন সংক্রামক যে একটি অসনাক্ত রোগীর দ্বারাই এক ভয়াবহ মহামারী সৃষ্টি হতে পারে।

জ্যাক সুলিভ্যানের বেশি সময় লাগলো না বরফ গলাতে। স্টিভে এক সময় চাপা কথা খুলে বলতে শুরু করলো।

—বুঝলেন প্রায় অচেনা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে আমি বাধ্য হই। না না সে অন্তসত্বা হয়ে পড়েনি। মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাড় নষ্ট চরিত্রের মেয়ে ছিল সে। সুযোগ পেলে যে কোন লোকের সঙ্গেই বিছানায় উঠে পড়তো। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি বার-এ পরিচিত হওয়া এক যুবককে নিয়ে সে আমারই বিছানায় প্রেমলীলায় মত্ত।

—সেই থেকেই আপনি যথেচ্ছ জীবন-যাপন করে যাচ্ছেন, এই তো?

স্টিভে হেসে উঠলো, ঠিকই ধরেছেন। আমি এক একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করে চলেছি একের পর এক।

জ্যাক জানতে চায় গত তিন মাসে যে যে মেয়ের সঙ্গে স্টিভে সহবাস করেছে তাদের নামধাম। একটু চিন্তা করে সে চারজনের নাম ঠিকানা দিল, যারা সম্প্রতি পৌনপুনিকভাবে তার অঙ্কশায়িনী হয়ে চলেছে।

একজন হল ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে ফোন করা ওয়াণ্ডা, দ্বিতীয় হল লীন, তার বর্তমান মিসট্রেস, তৃতীয় হল, বইয়ের দোকানকর্মী সিলভিয়া। চতুর্থ হল দুই সন্তানের মা পঁচিশ বছরের যুবতী ক্যারল।

—আর কেউ আছে কি? জ্যাক প্রশ্ন করে।

—না, এইসব।

চতুর জ্যাকের মনে হল এই আধুনিক ক্যাসানোভা ঝেড়ে কাশলো না, অর্থাৎ কিছু কিছু অবশ্যই চেপে যাচ্ছে। তবু সে আর এ-বিষয়ে চাপ দিল না।

—ধন্যবাদ, জ্যাক বললে, আমি ওদের জন্য প্রয়োজনীয় টেস্ট এবং চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্য করব।

—শুনুন, সহসা স্টিভে বলে ওঠে, লীন-এর সঙ্গে দেখা করবেন না। আমিই ওকে বলে এখানে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসব। ভয় পাবেন না ও রোগ ছড়াচ্ছে না। কেননা আমিই ওর জীবনে একমাত্র পুরুষ।

স্টিভে বাইরে বেরিয়ে এসে ফোন বুথে ঢুকলো। ঠিক করলো এই দুঃসংবাদ সে নিজেই দেবে সব মেয়েদের। সিলভিয়াকে এবং ক্যারলকে ফোন করে বললে তারা যেন জ্যাক সুলিভ্যানের জন্য অপেক্ষা করে।

সিলভিয়া আর্তনাদ করে ওঠে, না—না। উঃ গড! কি সাংঘাতিক কথা বলছ তুমি?

ক্যারল গর্জন করে ওঠে, ছি ছি দানব, তোমায় আগাপাশতলা চাবকানো উচিত।

রাত্রে লীনকে সংবাদটি দেবে ঠিক করলো স্টিভে।

এদিকে জ্যাক সুলিভ্যান তার করে দিল ইণ্ডিয়ানা পোলিস ভি. ডি. ডিপার্টমেন্টকে ওয়াণ্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্ভাব্য আরও সংক্রামিত ব্যক্তির খোঁজ-খবর করতে।

সন্ধ্যে ছটায় জ্যাক গিয়ে উপস্থিত হল সিলভিয়ার বাড়িতে। বেল টিপতে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতী দরজা খুলে দিল।

— গুড ইভিনিং, আমি ডিপার্টমেণ্ট অফ হেলথ থেকে আসছি। আপনিই কি মিস সিলভিয়া ডোর ?

— ভেতরে আসুন। বেশি সময় দিতে পারব না। আমার রুমমেট যে কোন সময় এসে যেতে পারে, সঙ্কোচভরা কণ্ঠে সিলভিয়া বলে গেল স্টিভে আগেই ফোন করেছে ওকে।

—আমাদের বিশ্বাস করবার কারণ ঘটেছে যে, সম্ভবত আপনি একটি দারুণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, জ্যাক শান্ত গলায় শুরু করে, পরীক্ষার জন্য আমাদের ক্লিনিকে আসতে পারেন বা ইচ্ছে হলে আপনার গৃহ চিকিৎসককেও দেখাতে পারেন। যাই করুন তা অবিলম্বেই করতে হবে।

এরপর জ্যাক গেল ক্যারলের বাড়ি। স্লাম অধ্যুষিত মেয়েটির ঘর কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। রক্তকেশী এই যুবতীর স্বভাব খুব রাগী। ভি. ডি.র সংবাদ শুনে সে দারুণ ক্ষেপে গেছে। সে ক্লিনিকে যেতে রাজি হল তবে অনর্গল যাচ্ছেতাইভাবে গালমন্দ করে গেল স্টিভের উদ্দেশ্যে।

—শয়তানটা আমার চরম সর্বনাশ করেছে। পার্ট টাইম কাজ করে আমি পেট চালাই আর আমায় কিনা বদমাইসটা মিষ্টি কথায় ফুসলে আমার দেহে জঘন্য এক রোগ ঢুকিয়ে গেল। জীবনে আমি কখনো আর বিপথে যাইনি।

একথার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় বেল বেজে উঠলো। ঘরে এসে ঢুকলো মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক যাকে ক্যারল "একজন পুরণো পারিবারিক বন্ধু" বলে পরিচয় দিল। জ্যাকের বুঝতে বাকি রইল না কেন ঘরটি এত সুসজ্জিত।

পরদিন দ্বিতীয় ইনজেকসন নিতে এল স্টিভে। জ্যাক জিজ্ঞেস করলো, কি হল ? বলেছেন মিস লীন মার্শালকে। সে ডাক্তার দেখিয়েছে কি ?

স্টিভে মাথা নাড়লো, লীন সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে।

—আমি যদি ওর সঙ্গে কথা বলি আপনার আপত্তি আছে কি ?

স্টিভে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিল।

লীন বেশ ভালভাবেই ওকে অভ্যর্থনা করলো। কফি করে খাওয়ালো দীর্ঘাঙ্গী লাজুক লাজুক রূপবতী যুবতী। একথা সে কথার পর জ্যাক খুব সতর্কতার সঙ্গে

প্রশ্ন করে, কিছু যদি মনে না করেন, এমন আর কোন পুরুষ বা মেয়ে জানা আছে কি যাদের আমরা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে চিকিৎসা করতে পারি? অবশ্য তাদের কাছে আপনার নাম প্রকাশ করা হবে না কথা দিচ্ছি।

লীন সোজা চোখে তাকিয়ে বললে, মিঃ সুলিভ্যান যেহেতু আপনি জানেন আমার এবং স্টিভের ব্যাপার, তাই হয়ত আপনার মনে অন্য ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। তবে আমি সে টাইপের মেয়ে নই। আমার জীবনে এই প্লেবয় টাইপের স্টিভে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের আবির্ভাব হয়নি।

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। লীন ফোন তুলে প্রশ্ন করলো,— হ্যালো! কে? না সে এখানে নেই। তবে আপনি যেই হোন একটা কথা শুনুন। আমি জানিনা স্টিভের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি। একটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। হেলথ ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক এসে আমাকে জানালেন যে স্টিভে একটি ভয়াল যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছে। যদি এ ব্যাপারে আপনার··· মানে কিছু করবার থাকে তো······হ্যাঁ · হ্যাঁ, বুঝলাম। ভদ্রলোক আমার ঘরেই বসে আছেন। আপনি যদি চান তো এ ভদ্রলোক তাঁর ভি. ডি. ক্লিনিকে টেস্ট-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

বলে লীন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যাকের পানে তাকালো। জ্যাক সম্মতিতে মাথা নাড়লো।

—বেশ তাহলে ভদ্রলোককে বলে দিই কাল সকালে আপনার বাড়ি যেতে। কি বলছেন? আপনিই যাবেন ক্লিনিকে? বেশ তাই হবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে লীন বললে, মেয়েটা নতুন, স্টিভের নিউফাইণ্ড। নাম হল গ্লোরিয়া। পদবী বলতে রাজি নয় যেহেতু মেয়েটি বিবাহিতা। আর মেয়েটি বর্তমানে প্রেগনেন্টও। হয়ত···ঐ বাচ্চা স্টিভেরই। কে জানে। আপনি একবার মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন?

জ্যাক মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো, দেখুন মিস, আমাদের একমাত্র কাজ হল ভি.ডি অনুসন্ধান করে বের করা, তা নিরাময় করা এবং এটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে এধরনের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ শিশুটি যাতে সংক্রামিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অন্য কোন প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর!

বিদায় দেবার সময় দরজার কাছে-এসে যুবতী বললে, মিঃ সুলিভ্যান, আপনি খুবই সজ্জন মানুষ। কারুর নৈতিক বিচারের দিকে যান না, নয় কি?

— দেখুন মিস, টাইফয়েড, হাম ভি.ডি. এরা সবই এপিডেমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা হলাম স্রেফ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ুয়ে যোদ্ধা।

এলিভেটর থেকে নামবার মুখে স্টিভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললে, কি রিঅ্যাকসন হল?

তার জবাব না দিয়ে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা শীতল অনুযোগভরা কণ্ঠে জ্যাক বলে ওঠে,

গ্লোরিয়া মেয়েটির সম্বন্ধে আপনি চেপে গিয়েছিলেন কেন ?'

—ড্যাম্মিট ! আপনি কি করে আবার ওর নাম জানলেন ?

—দেখুন স্টিভে, নাম চেপে গিয়ে আপনি কিন্তু বাঁচানোর পরিবর্তে তাদের সাংঘাতিক বিপদে ফেলছেন।

স্টিভের মুখ কালো হয়ে উঠলো, ঠিকই বলেছেন। তবে কি চান আমি গ্লোরিয়ার স্বামীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিই। বিশেষ করে যখন ওর গর্ভে আমারই বাচ্চা রয়েছে।

—ভয় নেই। আমরা এমনভাবে কাজ করবো যাতে স্বামীর কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। আমরা মেডিক্যাল জব করি। সংসার ভাঙ্গা আমাদের কাজ নয়। আমি ওদের দু'জনেই যাতে পরীক্ষিত হয় সে ব্যবস্থাই করব।

—ওটার কি কোন প্রয়োজন আছে ? চিন্তিত কণ্ঠে স্টিভে বলে ওঠে, গ্লোরিয়ার ব্যাপারটা আপনি ভুলে যান।

—অজস্র-সঙ্গত কারণ রয়েছে, যে জন্যে আমার পক্ষে এটা ভোলা সম্ভব নয় স্টিভে। প্রথম হল যুবতীর গর্ভস্থ সন্তান, দ্বিতীয় হল স্বয়ং যুবতী আর তৃতীয় হল তার স্বামী। আর এরা চিকিৎসিত না হলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের দিক থেকে শত সহস্র সংক্রমণ হবার অনিবার্য আশংকা রয়েছে। এইভাবেই মহামারী ছড়ায়।

পরদিন সকালেই গ্লোরিয়া এল ক্লিনিকে। একুশ বছরের সুন্দরী যুবতী। পাঁচ মাস অন্তসত্বা।

—আমি একটা অতি নির্বোধ মেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে যুবতী বলে যায়, আমার স্বামী প্রায়শই বাইরে বাইরে থাকে। স্টিভে একদিন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বিক্রি করতে এল। আমি ওকে ভেতরে নিয়ে বসালাম। বুঝতেই পারছেন আমি তখন নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছি···আর স্টিভে একজন জোয়ান সুপুরুষ···তবে ঐ একবারই। আমি আর কখনো ওর মুখ দেখিনি।

তার ব্লাড টেস্ট পজিটিভ ছিল। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। জ্যাক এবার ভাবতে বসলো ওর স্বামীকে কি ভাবে ক্লিনিকে আনা যায়।

গ্লোরিয়ার মুখে শোনা গেল যে, তার স্বামীর হাই ব্লাড প্রেসার রয়েছে। তাকে পারিবারিক চিকিৎসা ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক চিকিৎসা করছেন। সূত্র পেয়ে গেল জ্যাক, বললে, আজ রাত্রে ডিনারের পর আপনি স্বামীকে বলবেন তার মুখাবয়ব যেন বড় বেশি রক্তাভ হয়ে উঠেছে এবং ডাক্তারের কাছে যেতে বলবেন তখুনি। এর মধ্যে আমি ডাঃ ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা করে প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলবো।

ঘন্টা খানেক বাদে গিয়ে জ্যাক ডাঃ ফ্র্যাঙ্ককে সব কথা খুলে বললে। ডাক্তার শুনে দারুণ রেগে উঠলেন, গ্লোরিয়াকে আমি ওর ছেলেবেলা থেকে জানি। অতি ভাল মেয়ে সে। কতবড় শয়তান ঐ ছোকরা। আমি ওকে জেলে দেব।

—আমরা কারুর নৈতিক বিচার করি না ডক্টর, জ্যাক শান্তকণ্ঠে বলে যায়, সেটা

আমাদের কাজও নয়। তবে ভদ্রলোকের রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগ ধরেছে কিনা, ধরলে চিকিৎসা করে সারাতে হবে। অবশ্য সবটাই করতে হবে যাতে ভদ্রলোক স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ না হন এইভাবে। ভদ্রলোক আজ রাত্রে আপনার কাছে আসবেন। ওর রক্তটা কায়দা করে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। যদি তা সিফিলিস যুক্ত হয়। তাহলে ওকে জানাবেন যে, ব্লাড কাউন্টের মুখে তাতে আপনি স্পাইরোচেটস্ আবিষ্কার করেছেন।

—তাতে কি ওর স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগবে না?

—না, আপনি যদি বলেন এটা খুবই মাইল্ড কেস্ এবং বহুকালের ইনফেকসন। গোপনে জিগ্যেস করবেন তাঁকে যে বাইরে বাইরে থাকবার সময় কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা।

—ধরুণ তিনি যদি প্রকৃতই চরিত্রবান হয়ে থাকেন?

—তাহলে বলবেন গ্লোরিয়াকে বিয়ের আগে অবশ্যই তিনি অপর কোন বাজে বা স্বল্প পরিচিতা মেয়ে সংসর্গ করে থাকবেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই অন্তত-পক্ষে এক আধটা এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

তবুও ডাঃ ফ্র্যাঙ্কের দুশ্চিন্তা গেল না।

—আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। ভদ্রলোক খুবই শান্ত মুখচোরা লাজুক স্বভাবের মানুষ। এমন হওয়া সম্ভব যে, গ্লোরিয়াকে বিয়ের আগে কোন নারীই তার জীবনে আসেনি।

—তাহলে বলবেন এটা একটা বিরলতম সংক্রমণ। অনেক সময় মুখে ঘা-ওয়ালা কোন মেয়েকে চুম্বন করলেও সংক্রামিত হয়। অবশ্য দশ হাজারে একটা মাত্র এ ধরনের হয়ে থাকে। তবে ভদ্রলোকের এত কথা জানবার নয়। শুধু তাঁকে বোঝান যে এটা একটা বহুকালের ইনফেকসন। আর প্রস্তাব দেবেন তিনি যেন গ্লোরিয়াকে একথা জানিয়ে রক্তপরীক্ষা করান সাবধানতার জন্য।

কৌশলটি সর্বাংশে খেটে গেল। স্বামী ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে, এ সংক্রমণ বোধকরি হয়েছে বিবাহ পূর্বে সতের বছর বয়সের সময় এক গণিকা গৃহে যাবার ফলে। এদের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গেই এদের দিক থেকে পুনঃসংক্রমণের আশংকা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেল। দু'জনের জীবনেই একজন করে মাত্র নর এবং নারী এসেছে।

টেস্ট করে দেখা গেল লীন এবং সিলভিয়ার সংক্রমণ হয়নি। কিন্তু ক্যারলের দেখা গেল সেকেণ্ডারী সিফিলিস চলছে।

জ্যাক গিয়ে উপস্থিত হল যুবতীর বাড়িতে। একটা স্বচ্ছ নেগলিজি পরা ক্যারল মোহময় হাসিতে ওকে অভ্যর্থনা জানালো।

—মিসেস জেনসেন আপনার রক্তে সিফিলিস পাওয়া গেছে। আপনার জানা এমন কোন মানুষের নাম করবেন কি যারা বা যে নিজেদের অজ্ঞাতেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে?

হাসি মিলিয়ে গিয়ে ক্যারলের মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। একটু কর্কশ-কণ্ঠেই সে বলে উঠলো, ঠিক আছে। নিন কাগজ কলম নিন। আমি বলে যাচ্ছি।

তার বর্ণনা মত দেখা গেল স্টিভে ছাড়া তার পূর্ব স্বামী সহ পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে তার ক্রমান্বয়ে সহবাস ঘটে গেছে।

জ্যাক কালক্ষয় না করে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করলো। দেখা গেল তাদের মধ্যে চারজনই ঐ রোগে আক্রান্ত হয়নি। পঞ্চম ব্যক্তি ম্যাক্স-এর ভি.ডি রয়েছে। এই ম্যাক্সই হল পূর্বে দেখা সেই "পুরনো পারিবারিক বন্ধু" বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ব্যক্তি। বিপত্নীক এই প্রৌঢ় তার কামলালসা চরিতার্থ করতে পনের দিন অন্তর ক্যারলের কাছে আসতো "ক্যাশ গিফটের" বিনিময়ে।

ম্যাক্স স্বীকার করলো গত মাসে সে আরেকটি মেয়ের সঙ্গেও সহবাস করেছে।

—তার নাম কি এবং কোথায় থাকে সে?

—তা তো বলতে পারবো না মিস্টার, ম্যাক্স মাথা নেড়ে বলে, 'বার' থেকে তাকে যখন পাকড়াও করি তখন আমি বদ্ধ মাতাল ছিলাম।

—এক কাজ করুণ আমার সঙ্গে চলুন। সেই বারের সামনে আমার গাড়িতে বসে থাকব। যদি সে মেয়ে বার-এ আসে আপনি নিশ্চয়ই সনাক্ত করতে পারবেন তাকে।

পাক্কা তিন ঘন্টা ধরে ওরা গাড়িতে বসে রইল উক্ত বার-টার সামনে। ঢোকা এবং বেরোনো প্রতিটি মেয়েকেই ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে গেল ম্যাক্স। অবশেষে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে ম্যাক্স বলে ওঠে, ঐ যে ঐ সেই মেয়েটা। ঐ যে চামড়ায় জ্যাকেট পরা তরুণী!

গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে জ্যাক মেয়েটির পেছন পেছন গিয়ে বার-এর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো।

আঙুল দিয়ে মেয়েটির পিঠে ট্যাপ করে জ্যাক নিম্নকণ্ঠে বললে, ক্ষমা করবেন মিস। আপনার সঙ্গে নিরালায় একটু কথা বলতে চাই। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী।

মেয়েটির সঙ্গে ষণ্ডাগুণ্ডা একটা লোক ছিল। সে বিকৃত কণ্ঠে মহাখাপ্পা হয়ে বলে ওঠে, কেটে পড় বাস্টার, বলে ঘুষি পাকিয়ে ওঠে।

—চুপ কর সুইটি, বলে মেয়েটি তার সঙ্গীটির হাত ধরে ফেলে। পরে জ্যাকের পানে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—হেলথ ডিপার্টমেন্ট। আমাদের দৃঢ় ধারনা হয়েছে যে,—

—ও. কে.! ও. কে.! বলে বার থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি, শুনুন, আমি সবই জানি। আমি একজন বেশ্যা, নিজেকে সব সময়েই সাবধান রাখি, সুস্থ রাখি। যাইহোক সরকারের ইচ্ছানুযায়ী আমি কাল সকালে ক্লিনিকে যেতে রাজি আছি।

মেয়েটি কথা রেখেছিল। তার টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্তমানে কোন রোগ নেই। নেগেটিভ।

আপনি খুব লাকি প্যাল, গণিকা মেয়েটি সহাস্যে বলে, নয়তো আপনাকে এখন শ'য়ে শ'য়ে লোক খুঁজতে হত। আপনাদের উচিত আমাদের পেশার মেয়েদের বিরক্ত না করা। অ্যামেচারদের দিকে বেশি নজর দিলেই ভাল হয়।

বলা যেতে পারে অনুসন্ধানের এখানেই শেষ। কেননা ওদিকে ইণ্ডিয়ানা পোলিস থেকে হেলথ ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে তারা ওয়াণ্ডা, তার স্বামী, এবং তার সংসর্গে আসা সবাইকে খুঁজে বার করে, পরীক্ষান্তে যথাযথ চিকিৎসা করে নিরাময় করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জ্যাকের মনে তখনো সন্দেহ রয়ে গেছে। তার ধারণা আরও কিছু কেস রয়ে গেছে এ অনুসন্ধান কার্যের মধ্যে। সে স্টিভের এতাবৎ বিবৃতিতে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। বিস্ময়করভাবে সফল এই ডনজুয়ান এর আগে গ্লোরিয়ার খবরটি তো চেপে গিয়েছিল। সম্ভবত আর কিছু নামও চেপে গিয়ে থাকবে।

জ্যাক ফের ওর সঙ্গে কথা বলে অনুরোধ জানালো আর কোন মেয়ের কথা মনে করতে পারেন কিনা! ভুলও তো হয় মানুষের। ভালভাবে ভেবে দেখুন তো?

প্রথমটা স্টিভে স্রেফ মাথা নেড়ে অস্বীকার করে গেল। কিন্তু জ্যাক নাছোড়-বান্দা। অবশেষে স্টিভেকে মুখ খুলতে হল।

—ও. কে.! ও. কে.। তাহলে শুনুন, ক্যাথরিন উইলি নামে আরেকজন মেয়ে আছে। কিন্তু ওর ব্যাপারে—খবরদার খুব সাবধান মশাই। ও আমার বস্-এর মেয়ে।

জ্যাক উঠে দরজার দিকে যেতে স্টিভে ওর একটা হাত খপ করে ধরে ফেলে বললে, হে—শুনুন। ঝামেলা হলে আমার চাকরী চলে যাবে। প্লিজ, এ ব্যাপার থেকে আমার নামটি উহ্য রাখবেন। উইলিকে যা খুশী বলতে পারেন, তবে ও যাতে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ না করতে পারে সেটুকু দেখবেন।

জ্যাক দেখা করলো ক্যাথরিনের সঙ্গে তাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে। পরদিন সকালে সে কথামতো এসে উপস্থিত হল ক্লিনিকে।

—এখন বুঝতে পারছি আমার হাতের চেটো আর পায়ের তলায় যেন লাল লাল ফুস্কুরির মত উঠেছে। আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার চর্মরোগ ভেবে নিয়ে চিকিৎসা করছিলেন। কি করে তিনি কল্পনায় আনবেন যে অভিজাত বংশের রিচার্ড মর্টন উইলির আদরের কন্যা সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছে।

তার বিবৃতি মত সে নাকি স্টিভের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত অনাঘ্রাতা কুমারীই ছিল। একটা ক্রীসমাস পার্টিতে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় স্টিভের।

—প্রকৃতির পরিহাসের মজা এই যে ইতিপূর্বে বোন ও বান্ধবীদের সঙ্গে সেক্স নিয়ে যত আলোচনা আমার হয়েছে, তাতে প্রত্যেকেই আমরা শুধুমাত্র অবৈধ প্রেগন্যাণ্ট হবার জন্যেই চিন্তিত হয়েছি সবিশেষ। কক্ষণো এই ঘৃণ্য ভি. ডি.-র

কথা মনেও হয়নি। তাই সেই পার্টির মধ্যে উত্তেজনার মুখে স্টিভের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যখন নিরালা একটি অফিস ঘরে গিয়েছি মিলনোদ্দেশে তখন শুধু গর্ভবতী হয়ে যাবার ভয়ই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল ক'দিন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ম্লান হেসে রূপসী সখেদে বলে যায়, কি অদৃষ্ট, জীবনে প্রথমবার এমন একটি পুরুষের কাছে দেহদান করলাম, যে আমাকে দান করে গেল ভয়াল এই সিফিলিস রোগ। ওঃ, হা ঈশ্বর! মিঃ সুলিভ্যান আমার বাবা যদি এ ভয়ংকর ঘটনা জানতে পারেন তাহলে আমি কব্জির শিরা কেটে আত্মহত্যা করবো। আর ঐ শয়তান স্টিভে ইয়ংকে—

বাধা দিয়ে জ্যাক বলে ওঠে, ওর প্রতি অতো উগ্র হবেন না। ওতো চুপ-চাপও থাকতে পারতো। কিন্তু তা না করে আপনি যাতে চিকিৎসান্তে আরোগ্য হন' সেই চেষ্টাই তো সে করেছে। এ জন্যে ওকে ধন্যবাদ দিতে হয়। নয় কি?

মাথা নিচু করে সম্মতি জানালো মেয়েটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জ্যাক বলে, আপনি বলছেন ষ্টিভে ছাড়া আর কোন পুরুষ আপনার জীবনে আসেনি। সত্যি তো?

—একশবার সত্যি। আমি মিথ্যেকে ঘৃণা করি।

জ্যাকের বর্তমান পর্যায়ের অনুসন্ধান কার্য এখানেই শেষ হয়ে গেল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যুবতীকে 'গুডবাই' করে বিদায় নিল।

সম্মোহন, বেদনা উপশম করতে পারে, 'মিরাকল কিওর'ও করতে সক্ষম। কিন্তু এটা নানাবিধ অসুখ বা পীড়া ঘটাতে পারে, এমন কি আত্মহত্যায়ও প্ররোচিত করে থাকে। ডাক্তাদের মত, কোন অ্যামেচার বা আনাড়ি যাদুকর নয়, শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই হাতে সম্মোহন করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

এবার কিছু কেস হিস্ট্রির খবর নেওয়া যাক।

একদা নিউজার্সিস্থ জনৈকা রমণী এক রহস্যজনক ও গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়। তাঁর বাঁ হাত অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়। স্বামী-পাগলের মত হয়, পারিবারিক চিকিৎসককে টেলিফোন করেন। কিন্তু ডাক্তার যখন আসেন তৎ-পূর্বেই ভদ্রমহিলা হাতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। দৈহিক কোন ত্রুটি না পেয়ে চিকিৎসক মশায় কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবার রেকমেণ্ড করেন। কিন্তু হাতটি ফের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় সেই ভদ্রমহিলা একজন অ্যামেচার হিপনোটিস্ট-এর শরণ নেয়।

হিপনোনিস্ট তাঁকে সম্মোহনে আবিষ্ট করে বলে, আপনার হাতে কোন কিছু গোলমাল নেই। যখন আপনি সম্বিৎ ফিরে জেগে উঠবেন, তখন দেখবেন আপনি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছেন।

ফল হল চমকপ্রদ। সম্বিৎ ফিরে জাগবার পর দেখা গেল সত্যি সত্যি ভদ্র-মহিলার হাত ঠিক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এ অবস্থা চললো প্রায় ছয় সপ্তাহ। বন্ধু-বান্ধবীদের মহিলাটি সাহ্লাদে জানায় যে, "সে খুবই ভাল আছে। হাত পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

এর পর এক সকালে সে জেগে দেখলো তার দুহাতই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে-গেছে। ফের হিপনোটিস্টকে ডাকা হল, সে এসে ফের বিস্ময়করভাবে মহিলাটিকে সারিয়ে দিল। একই প্রক্রিয়ায় পেশেন্টকে সে 'সাজেস্ট' করলো জেগে উঠেই সে ভাল হয়ে যাবে। দুটি বাহুই তার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু এর ৩৬ ঘণ্টা বাদেই দেখা গেল মহিলাটি একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। সেদিন বিকেলেই প্রায় বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় স্ট্রেচারে করে স্থানীয় একটি সাইকোপ্যাথিক ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল।

মনোবিজ্ঞানী ডাক্তাররা সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মহিলাটির রোগের আসল কারণ নির্ণয় করে ফেললেন। মহিলাটির বড় মেয়ে কালক্রমে অ্যালকো-হলিক (বদ্ধমাতাল) বনে গিয়েছিল। প্রতি গভীর রাত্রে কাজ থেকে ফিরে আসা

মেয়ের জন্য তিনি জানালার ধারে বসে পথ চেয়ে থাকতেন। ঠিক মত মেয়ে ফিরে আসবে তো? না কি সে পড়শীদের দৃষ্টির মধ্যে টলতে টলতে বাড়ি ফিরবে? এই ছিল তার নিত্যকার চরম দুর্ভাবনা।

"নিত্যকার তিক্ত সমস্যার কঠোর ও চরম প্রতিবাদ স্বরূপই মহিলাটির দেহে এসেছে পক্ষাঘাত এবং অন্ধত্ব।" মহিলাটির চিকিসারত জনৈক সাইকিয়াট্রিস্ট এ অভিমত প্রকাশ করলেন, "তাহলে সেই অ্যামেচার হিপ্‌নোটিস্ট করেছিল কি? সে তার উপসর্গগুলিকে মিউটিলেটেড (mutilated) করেছিল মাত্র। যেটা আমাদের কাজ সেই কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাপারে সে হাত ছোঁয়ায়নি, বা পারেনি বলাটাই সঠিক।"

উক্ত মহিলাটির ঘটনাই প্রমাণ করে যে, সম্মোহক হাতুড়েদের হাতে পড়ে রোগীর কি সর্বনাশ সাধন হতে পারে।

আজ একথা নিসঃন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্যানসারের সাময়িক অসহ্য যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব করতে পারে সম্মোহন। সন্তানের জন্ম বা দাঁত তোলাকে করতে পারে বেদনাহীন। আর পারে মনস্তত্ত্ববিদদের দ্বারা রোগীদের অবচেতন মনের উদ্ঘাটন। কিন্তু সম্মোহনের সাংঘাতিক বিপদ—সম্বন্ধে—জ্ঞান খুব অল্প লোকেরই আছে। হিপনোসিস যদি অনুপযুক্ত হাতে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহৃত হয় তো পেশেন্টের মানসিক ও নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে রোগীর দফা শেষ করে দিতে পারে। এর দ্বারা যে কোন ক্রাইমের পথে পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যথা, চেক জাল করা উইল জাল করা, আত্মহত্যা বা মার্ডারে প্রারোচিত করাও অসম্ভব নয়।

দুর্ভাগ্য ক্রমে এ বিদ্যার বিগত দুশো বছরের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই হিপ্‌নোসিস বিদ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে শুধুমাত্র আনাড়ি যাদুকর, মঞ্চের লোকরঞ্জনকারী ও যাযাবর শ্রেণীদের দ্বারা। অদ্যাপি কোন দেশে এই বিদ্যাটির কোনপ্রকার ট্রেনিং বা স্টাডির বিধিমত প্রতিষ্ঠান নেই। এ বিদ্যা যদি উপযুক্ত শিক্ষিত হাতে পড়ে তাহলে মানবসমাজের অশেষ উপকার ও কল্যাণসাধনে সক্ষম। অপর দিকে আনাড়িদের হাতে এর অপব্যবহারে বহু মানসিক রোগীর জন্ম হয় এবং পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য সরকার পক্ষ থেকে বহু দেশে এই হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়, খবরদার এটা যেন লোক দেখানো চমক বা মঞ্চের স্টাণ্টরূপে কদাপি ব্যবহৃত না হয়, তাহলেই সর্বনাশ। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিপনোটিজমের ব্যবহার খুবই সাংঘাতিক ও গুরুতর।

একবার যদি আনাড়ি সম্মোহন বিশারদের হাতে পড়ে, যেমন পড়েছিল নিউ জার্সির সেই ভদ্রমহিলা, তাহলে মৃত্যুরেব নঃ সংশয়। পাগল বা মৃত্যু হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

আরেকটি কেস-এ জানা যায়, একজন ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ বুকের দারুণ যন্ত্রণায়

কাতর হয়ে পড়েন। ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সে মহিলাটি যথারীতি একজন অ্যামেচার হিপনোটিস্টের কাছে প্রথমে যায়। তিনি মহিলাটির যন্ত্রণার লাঘব করেন বটে কিন্তু পরে প্রকাশ পায় মহিলাটি ক্যানসারে ভুগছে।

কিছু এক্সপার্ট মনে করেন যে, ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ মানুষদের হিপনোটাইজ করা সম্ভব। এর চার জনের এক জনকে গভীর সম্মোহনে (deep trance) এ আবিষ্ট করা যায়। এসব লোকেরা যদি পর পর হিপনোটিজমের খপ্পরে পড়ে তো তাদের এমন অভ্যেস হয়ে যায় যে, তারা সজাগ অবস্থায় যে কোন সময় ডিপ ট্রান্সে আক্রান্ত হয়ে যায়। নিউইয়র্কের এই ধরনের এক ভদ্রমহিলা পথে যেতে যেতে বিরাট এক পোস্টারের মধ্যে জনৈক হিপনোটিস্টের ছবি দেখেই ফুটপাথের উপরেই গভীর সম্মোহনে অবিষ্ট হয়ে পড়ে।

সম্মোহনের ভয়াবহ দিক হল পোস্ট হিপনোটিক 'সাজেস্‌সন'। এর অর্থ হল সম্মোহিত রোগীর মধ্যে ভবিষ্যতে তাকে কি করতে হবে সেটা তার মনে বপণ করে দেওয়া। জ্ঞান ফিরে এলে তাকে সঠিক কি করতে বলা হয়েছিল তা অবশ্য মনে করতে পারবে না, কিন্তু তার মনের মধ্যে দুর্দমনীয় একটি বাসনা পাক খেতে থাকবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কোন অপকর্ম করবার জন্য। সজাগ হবার অর্থাৎ চেতনা ফিরে আসবার কাঁটায় কাঁটায় পঞ্চাশ মিনিট পর যদি সে বিশেষ একটা কাজ করবার জন্য নির্দেশিত হয়, সে যতই সময় এগিয়ে আসবে সে কাজটা করবার জন্য সাংঘাতিক উতলা হয়ে উঠবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সম্মোহনের ঘোরে পেশেন্টকে এমন কোন কাজ করানো সম্ভব নয় যা তার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এ ধারণা অনেকক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। দেখা গেছে বহুবার সম্মোহিত মানুষ (সম্মোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে) নির্দেশিত হয়ে এমন সব কাজ করেছে যা স্বাভাবিক অবস্থায় সে কিছুতেই করতে চাইত না বা করতোই না।

ফরাসী দেশে এই ব্যাপারে চমকপ্রদ একটি এক্সপেরিমেন্টের ফলে জনৈকা যুবতী তথাকথিত লেবরেটারী "মার্ডারে" জড়িয়ে পড়েছিল। হিপনোটিস্ট যুবতীকে এই নির্দেশ দেয় যে, সে যখন সম্মোহন আবেশমুক্ত হবে তখন সে লেবরেটারীর জনৈক যুবক স্টাফকে বিষপ্রয়োগ করবে। শুনে মেয়েটি প্রতিবাদ করে ওঠে, না না তা কি করে হয়। সে তো আমার কোন ক্ষতি করেনি। আমি ক্রিমিনাল নয়।

হিপনোটিস্ট ছাড়ে না। সে যুবতীকে বার বার বোঝায় যে উক্ত যুবক স্টাফটি প্রকৃতই তার একজন চরম শত্রু। অবশেষে যুবতী রাজি হয়ে যায়। তখন তার হাতে এক গ্লাস নিরীহ বিষহীন তরল পদার্থ তুলে দিয়ে বলা হয় এটা সাংঘাতিক 'পয়জন'।

চেতনা ফিরে পেয়ে সেই যুবতী সেই স্টাফ যুবকটির কাছে গিয়ে বলে, আজ অসহ্য গরম; ছেলেটি নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত। এই বলে সে গ্লাসটি তার দিকে এগিয়ে ধরে

বলে, এটা খেয়ে নাও শান্তি পাবে। যুবকটি বলে, আমায় একটি চুমু দাও তবে খাব। যুবতী তখন তাকে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। এমন ভানও সে করে যে, ঐ গ্লাস থেকে সে এক চুমুক নিজে খাচ্ছে। অতঃপর যুবকটি যখন সেই "বিষাক্ত" পানীয় গলধঃকরণ করতে থাকে, সে নির্লিপ্ত নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখে।

এটা অবশ্য একটা এক্সপেরিমেন্ট মাত্র। বাস্তব জীবনে এ ধরনের কুকর্মের ঘটনা সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব? গবেষণালব্ধ বহু অভিজ্ঞতা বলে, এটা হওয়া সম্ভব।

শিকাগো, লণ্ডন ও প্যারিসে একাধিক কোর্ট কেস-এ প্রমাণিত হয়েছে যে, সম্মোহনের ঘোরে লোকেদের দ্বারা উইল ও চেক্ সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। শিকাগোর এক মামলায় দেখা গেছে এক মহিলাকে দিয়ে অসুবিধাজনক শর্তে ডাই-ভোর্সের নিষ্পত্তির ফর্ম সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে সম্মোহনের ঘোরে। একজন জার্মান মহিলা পোস্ট হিপনোটিক সাজেসসনের ফলে ৭০ হাজার টাকায় তার আসবাবপত্র ও মূল্যবান অলঙ্কারাদির বিক্রিনামায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। পরে স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করে পালিয়ে যান হল্যাণ্ডে তার প্রেমিক হিপনোটিস্টের সঙ্গে মিলিত হতে। অপর একটি জার্মান কোর্ট কেস-এ জনৈক ব্যক্তি সম্মোহনের ঘোরে সুইসাইড লেটার লিখে একটি ব্রীজ থেকে নদীতে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। আরেক ব্যক্তিকে একটি খেলনা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে প্ররোচিত করা হয় কিন্তু বন্দুকে আসল গুলিভরা ছিল, ফলে একটি লোক নিহত হয়ে যায়।

অপরাধকর্মে ব্যবহারের সমস্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল জার্মানীর হেইডেলবার্গে। ব্যাপারটা ঘটেছিল একজন সিটি অফিসিয়ালের পরিবারে। সেই অফিসারটি পুলিশের কাছে এই বলে নালিশ জানায় যে, তিনি তার স্ত্রীর সন্দেহজনক নার্ভাস ডিসঅর্ডারের জন্য চিকিৎসা ব্যাপারে প্রায় তিন হাজার মার্ক অর্থ ব্যয়ে বাধ্য হয়েছেন। যে লোকটি তাকে চিকিৎসা করছে সে নিজেকে একজন 'ডাক্তার' হিসেবে জাহির করেছে। কিন্তু সন্দিগ্ধ-স্বামী খোঁজ খবর নিয়ে এ রকম কোন 'ডাক্তার'-এর হদিশ পাননি।

হতচকিত পুলিশ অফিসাররা উক্ত সিটি অফিসিয়ালের স্ত্রীকে এক জন নাম করা জার্মান সাইকোলজিস্ট ডাঃ লুডউইগ মেয়ারের কাছে পাঠায়। ডাঃ মেয়ার শুনলেন যে, এই মহিলাটি উক্ত 'ফোনি' ডাক্তারের দ্বারা বার বার সম্মোহিত হয়েছে। তিনি নিজে মহিলাটিকে সম্মোহন দ্বারা তার মন পরীক্ষা করে দেখে চমকে গেছেন। তাঁর হৃদয় খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন হরর-এর দীর্ঘ এক তালিকা। যেসব সম্বন্ধে মহিলাটি নিজে আদৌ সচেতন ছিল না।

দেখা গেল যে, এই ভদ্রমহিলা ফ্রাশজ ওয়াল্টার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পুরো-পুরি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছেন। ওয়াল্টার মহিলাটির প্রেমিক বনে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় সম্মোহনের ঘোরে মেয়েটিকে অর্থের বিনিময়ে তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও

দেহ উপভোগের জন্য নিয়মিত পাঠাতো। আশ্চর্যের কথা যে মেয়েটি সজ্ঞানে এসব স্মরণ করতে পারতো না, কারণ উক্ত লোকটি সম্মোহন অবস্থায় তাকে বুঝিয়েছিল যে, সম্বিৎ ফিরে পেলে সে কোন কিছুই স্মরণ করতে পারবে না।

ওয়াল্টার মেয়েটিকে এমন প্ররোচনাও দিয়েছিল যে, স্বামীর নিদ্রিত অবস্থায় স্বামীরই বন্দুক নিয়ে তাকে সে গুলি করে মারবে। পরে সেই বন্দুকটি স্বামীর হাতে ধরিয়ে দেবে যাতে প্রমাণ হয় এটা স্বামীর একটা আত্মহত্যার ঘটনা।

—পরদিন রাত্রে আমি জেগে উঠলাম, মেয়েটি মনস্তত্ত্ববিদকে বলে যায়, আমি বন্দুক নিয়ে ঘুমন্ত স্বামীর মাথার উপর নলটা ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিই। কিন্তু বন্দুকে গুলি ছিল না তাই অঘটন কিছু ঘটেনি।

সব মিলে ওয়াল্টার মেয়েটিকে ছয় ছয় বার প্ররোচিত করে তার স্বামীকে হত্যা করতে পাঠায়। প্রতিবারই অবশ্য বিফলকাম হয়। অতঃপর ওয়াল্টার তাকে আত্মহত্যা করতে রাজি করায়। মেয়েটি লোকটার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে রাইন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সন্দেহপরবশ হয়ে ওদের বাড়িওয়ালা ওর পিছু নেয় এবং শেষ সময়ে মেয়েটিকে জল থেকে জীবন্ত অবস্থায়ই উদ্ধার করে।

দুবছরের অনুসন্ধানের পর (যার বেশির ভাগ সূত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল উক্ত মেয়েটিকে সম্মোহন আবিষ্ট করে জেরার মাধ্যমে) অবশেষে ওয়াল্টারকে গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতের বিচারে তার দশ বছর কারাদণ্ড হয়ে যায়।

জার্মান এক্সপার্টরা সবদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মহিলাটি আদৌ অস্বাভাবিক চরিত্রের ছিল না। কিন্তু উক্ত দুষ্কৃতকারী তাঁকে অসংখ্যবার সম্মোহনের মাধ্যমে তার মনের গভীর অবচেতনে স্থায়ী বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

মার্কিন দেশের বহু স্থানে যথা, শিকাগো, লস এঞ্জেলেস, মিয়ামি ও মিনেয়াপোলিস এ ক্রিমিনাল কেস্ সল্ভ করার সাহায্যের জন্য হিপনোটিজমকে ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে সম্মোহনের ঘোরে সাক্ষীরা এমন সব সুক্ষ্মও বিশদ ব্যাপার স্মরণ করতে পারে যেগুলোর ব্যাপারে সজ্ঞানে তারা কিছুই বলতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পালিয়ে যাওয়া মোটর গাড়ির নাম্বার প্লেট ইত্যাদি। অবশ্য পুলিশি কাজে এর ব্যবহারের বিপদও কম নয়।

একদা শিকাগোতে জনৈকা সুন্দরী এয়ারলাইন স্টুয়ার্ডেসকে কিডন্যাপ করার অভিযোগে একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা চলাকালীন জানা যায় যে, স্টুয়ার্ডেস মেয়েটি দু-দুবার আসামীকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। পরে জনৈক পুলিশ অফিসারের দ্বারা হিপনোটাইজড্ হয়ে মেয়েটি উক্ত যুককটিকে সনাক্ত করে। তখন প্রশ্ন ওঠে : যদি স্টুয়ার্ডেসটি প্রকৃতই আসামীকে চিনে থাকে, তাহলে প্রথম দুবার সে সনাক্ত করতে অক্ষম হল কেন? তাহলে কি তার শেষবারের সনাক্তকরণ সম্মোহনকারী পুলিশটির 'সাজেস্‌সন'-এর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে?

জজ পুলিশের এই ধরনের প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহকে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেন না। জুরীরা আসামীকে নিরপরাধ রায় দিয়ে খালাস করে দিল।

দুনিয়ার বহু দেশেই বহু ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, সাইকোলজিস্টরা হিপনোসিসকে তাঁদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজে লাগান। এর সঙ্গে কিছু আনাড়ি মানুষ, যাদু পেশায় নিযুক্ত লোকেরা যথেচ্ছভাবে এর ব্যবহার করে থাকেন। যার ফল বহু ক্ষেত্রেই ভাল হয় না। এটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যথাযথ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান খুবই বিরল হওয়ায় এবং এটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, এর কুফল রোখবার আইনসঙ্গত কোন রাস্তা নেই।

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েসনের হিপনোসিস কমিটির অধ্যক্ষ ডাঃ হেরল্ড রোজেন একদা বলেছিলেন, যে কোন ডাক্তার ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে সম্মোহন করা শিখে নিতে পারেন। কিন্তু উক্ত সব চিকিৎসকদের যদি সাইকোডাইনামিকস্ (Psychodynamics) সম্বন্ধে উপযুক্ত ট্রেনিং পূর্বাহ্নে নেওয়া না থাকে তাহলে পেশেন্টদের চরম বিপদ হতে পারে ডাক্তারের অজ্ঞাতসারেই। তিনি শেষ কথা বলেছিলেন, No one, intact, should ever treat patients on hypnotic levels with techniques byond the range of his usual Professional competence with unhyptonziged patients······We are otherwise playing with dynamite.

পাশ্চাত্যের বহুদেশে অসাধু কিছু মানুষ বিজ্ঞাপন মারফৎ লোকজনকে আকর্ষণ করে বেশ কিছু পয়সা উপার্জন করে যাচ্ছে। তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা দৃষ্টে মনে হয় 'সম্মোহন' সর্বরোগহর। অনেক ক্ষেত্রে পত্রযোগে কয়েকশো টাকার বিনিময়ে দশটি সহজ লেসন-এ হিপনোটিজম শিক্ষা দেবার বিজ্ঞাপনও অহরহ বের হয় ওসব দেশে।

দৈনিক পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনের নমুনা নিম্নরূপ :

"No woman is ever too old to benefit by gland re-activation. Gain weight—fill out your form. Skin blemishes often disappear. Insomnia, headaches often vanish. Divorce is not the answer. Let hypnosis help you to become glamorous—amorous."

অযোগ্য লোকের হাতে সম্মোহন ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। কুচক্রীর হাতে তো সর্বনাশ। বিশেষজ্ঞদের মত, সাধারণ মানুষ যতদিন না এ ব্যাপারে এর কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে ততদিন এর কোন সুরাহা হবে না।

ডাঃ শেনেখ্ এ ব্যাপারে বলেছিলেন, The public must be made to understand that hypnosis is not Just an exciting game.

ভুলে যান 'ফাউন্টেন অফ ইউথে'র কথা। যারা দর্শনডালিতে বয়স কমাতে চান, অর্থাৎ যুবজনোচিত আকৃতি চান, তাদের পক্ষে আজ 'হিরো' হল প্লাস্টিক সার্জন। আর তাঁর কাছেই রয়েছে সার্জিকাল ট্রিকস্ ভর্তি এমন একটি নতুন ব্যাগ যা কি পুরুষ কি নারী সবাইকে সুগঠিত ও লোক আকর্ষণীয় আকৃতিতে রূপান্তরীত করতে সক্ষম। মানুষের দৈহিক অসংগতি ও কদাকারত্ব মোচনে প্লাস্টিক সার্জনগণ এগিয়ে এসেছেন। যারা একদা সহজাত দৈহিক অসংগতি অপসারণের উদ্দেশ্যে ছুরি ধরতেন আজ তাঁরা আরও অগ্রসর হয়ে অনন্ত যৌবন বা সুন্দর আকৃতি অভিলাষীদের কাছে প্রায় দেবদূত রূপে দেখা দিয়েছেন। ইংরেজিতে বলতে গেলে His passion is to make beauty out of the beast.

মেয়েরাই বেশি প্লাস্টিক সার্জনদের শরণাপন্ন হয়। তবে প্রয়োজনে অবশ্য পুরুষরাও এদিকে ক্রমে ক্রমে অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নেই। এই সার্জিকাল ওয়াণ্ডারের সাহায্য কে না চায়!

মেয়েদের স্তনের আকৃতি পাল্টানো আজ সহজ হয়ে গেছে। শুষ্ক স্তনকে ভরাট বা বৃহদাকারকে সুসম কিংবা ঝুলন্তকে সুউচ্চ, সব কিছু করাই সম্ভব প্লাস্টিক সার্জারী মারফৎ।

ধরুণ মাঝবয়সী জনৈকা গৃহিণী, সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। সে পুনরায় তার বিশ বছর আগেকার ব্যবসা-জগতে ফিরে যেতে আগ্রহী। স্বামী-হারা অবস্থায় সে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে আর সবার ওপরে তার চেহারা বড় বেশী বয়স ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

একজন বিজনেস এক্‌জিকিউটিভ ৪৫ বছর বয়সে কাজের চাপে বয়সের অনুপাতে বড় বেশি রকম বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। চোখের কোলের চামড়া ঝুলে পড়েছে। ফলে, যে কোন প্রমোসন পাবে যুবজনোচিত আকৃতির অফিসাররা।

একটি মেয়ে, কলেজে বর্তমানে জুনিয়ার, সে ফিজিকাল এডুকেশন শিক্ষা দিতে আগ্রহী কিন্তু তার বৃহদাকার স্তনদ্বয়ই হয়েছে যে কোন এথেলেটিক খেলায় যোগদানের অন্তরায়।

একজন মহিলা তার স্থূলত্ব কমিয়ে মহা বিপদে পড়েছে। তার চিবুক ও হাতের চামড়া ঝুলে পড়ে তাকে কদাকার করে তুলেছে।

এদের কেউই কম বয়স্ক দেখাবার জন্যে আগ্রহী নয়। তারা শুধু নিজেদের

বয়েস অনুযায়ী নিজেদের দেহের অনাবশ্যক ত্রুটি সারিয়ে সুসম দেহের অধিকারী হতে চায়। কিছুকাল পূর্বেও এসব নর-নারীরা 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' গোছের মনোবৃত্তি নিয়ে আক্ষেপ করেই জীবন কাটাতো।

কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারীর উন্নতির কল্যাণে আজ তারা তাদের দেহের ত্রুটি অপসারণে প্লাস্টিক সার্জনদের দ্বারস্থ হচ্ছে একের পর এক! উক্ত সার্জেনরা 'ফাউন্টেন অফ ইউথে'র মত মিরাকল কিছু করতে সমর্থ না হলেও তারা উক্ত ত্রুটিসমূহ অনায়াসে 'রিপেয়ার' করে দিতে পারেন।

প্রকৃত প্ল্যাস্টিক সার্জন একজন ভাল ডাক্তার সন্দেহ নেই। তার ওপর তাকে হতে হবে কল্পনাপ্রবণ এবং আর্টিস্টিক। দেশ বিভেদে এইসব সার্জনদের কম বেশি ছয় বছরের একস্ট্রা ট্রেনিং নিতে হয়। প্রধানত এঁরা দৈহিক প্রতিবন্ধী, দুর্ঘটনা-জনিত মানুষের দেহ বা সহজাত কোন দৈহিক ত্রুটি সংশোধনেই নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেন। পুড়ে যাওয়া দেহ বিকৃতিকেও এঁরা 'রিপেয়ার' করে সুন্দর ও স্বাভাবিক করবার চেষ্টায় ব্রতী হন।

ধনী বা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেহপট পাল্টে অনন্ত যৌবন পাবার প্রচেষ্টায় এঁদের কাছে এলেও, সাধারণ মানুষ এদের কাছে যায় দেখতে ভাল বা কিছুটা অল্পবয়স্ক আকৃতিতে পরিবর্তিত হবার মানসেই। দেহের চামড়ায় বলীরেখা বা ঝুলন্ত থলথলে চামড়ার হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশায়ই।

নিতম্বকে উচ্চ ও সুসম এবং আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে জনৈক হলিউডের ডাক্তার পারদর্শীতা দেখিয়েছেন প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে। নিজেকে তিনি রসিকতা করে hindsight (পশ্চাৎদর্শী) বলে অভিহিত করেছিলেন। বক্ষে সিলিকোন সংস্থাপনের পরেই এ অপারেশনের প্রতি আগ্রহী বেশি নারীরা। এসব পেশেন্টরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে থিয়েটারের অভিনেত্রী মডেল গার্ল। অধুনা কিছু বাড়ির গৃহিণী আর মিনি স্কার্টপরা স্কুল টিচাররা এ ধরনের সার্জারীতে অনুরক্ত হয়েছে।

তবে মুখ নিয়েই মানুষের দুশ্চিন্তা। ঝুলে পড়া, কুঁচকে যাওয়া বা বলীরেখা পড়া মুখকে পুনরায় যৌবনোজ্জ্বল টান টান করবার কার না ইচ্ছে হয়। পাশ্চাত্যে এধরনের নর-নারী লাইন দিয়ে এসব ত্রুটি সংশোধন করিয়ে নেয়। এ ধরনের রূপান্তরের ফলে শুধু দর্শনডালিই নয় মানসিক পরিবর্তন হয়ে মানুষের জীবন-ধারাই পাল্টে দেয়।

প্রখ্যাত ও প্রয়াত হলিউড অভিনেত্রী মেরিলীন মনরো তখন হপ্তায় মাত্র ৭৫ ডলারের সাধারণ শিল্পী। একদা এক বড় রোল-এ অর্থাৎ নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবার সর্বপ্রথম সুযোগ আসে তার জীবনে। কিন্তু হায়, অডিসন টেস্ট শেষে উক্ত ছবির ঠোঁট কাটা প্রডিউসার, মনরোর তদানিন্তন প্রায় চিবুক-হীনতার তীব্র মন্তব্য করে বলেওঠে, She would be delightful, if we needed a chinless wonder.

এই নিষ্ঠুর আঘাতের ধাক্কায় চোখে জল এসে গেল মনরোর। সর্বনাশ! কি দুর্দৈব। যা'ও জীবনে একটা পরম সুযোগ এল, তাও কিনা চিবুকেয় ত্রুটির জন্য বানচাল হতে বসেছে! এখন উপায়? উপায়রূপে দেখা দিল ওরই এক ফটোগ্রাফার বন্ধু। সে ওকে জনৈক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে নিয়ে গেল। কাল বিলম্ব না করে ডাক্তার লোকাল অ্যানেসথিটিক প্রয়োগ করে মেরিলীনের চিবুকের মধ্যে ছোট্ট একটি হাড় সংযোজন করে দিল। মাত্র বিশ মিনিটের অপারেশন। ফি ২৫০ ডলার। অপারেশনের নগণ্য একটি দাগ ছাড়া মনরোর মুখাবয়ব হয়ে উঠলো নয়নলোভন।

মানুষ প্ল্যাস্টিক সার্জনের কাছে ছোটে কেন? এ প্রশ্নের জবাবে উদ্দেশ্য হিসেবে চারভাগে ভাগ করেছেন নিউইয়র্কের এজিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ডাঃ এডওয়ার্ড হেণ্ডারসন: ১. অল্প বয়স্ক দেখাতে, ২. আরও সুন্দর হতে, ৩. সেক্সুয়াল হবার মানসে, ৪. দৈহিক ত্রুটি বা মানসিক অক্ষমতা সারাতে।

এ যুগের মানুষ এতটা গুরুতরভাবে বয়স-সচেতন হয়ে পড়েছে যে তারা ৩৯-এর পর আর বয়েস স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হয়!

ডাক্তারদের অভিমত: These reasons stem for society's dispropcrtionate demand—on the social, employment, sexualy and even political level— that we never grow "older and wiser" but rather stay "young, beautiful, and powerful."

ঝুঁকি কমাবার জন্য সার্জনরা তাদের কাছে আগত পেশেন্টদের শতকরা ৫০ জনকে ফিরিয়ে দেন "পুয়োর সাইকোলজিক্যাল" গ্রাউণ্ডে।

এর কারণ হল, রোগীদের অধিকাংশের অলীক ধারণা। তারা মনে করে রাতারাতি প্ল্যাস্টিক সার্জনরা তাদের অল্পবয়স্ক, সুন্দরাকৃতি করে দিতে পারে। কিংবা তাকে ম্যাটিনী আইডলরূপে বা তারক্যারিয়ারের সর্বোচ্চধাপে পৌঁছে দিতে পারে। এটাই সর্বাধিক রিস্কের ব্যাপার হয় সার্জনদের। কিছু কিছু মানসিক দুর্বল রোগী তাদের অলীক মনোবাসনা পূর্ণ হল না দেখে অনেক সময় মামলা ঠুকে দেয়। কিংবা শারীরিক আক্রমণও করে বসে উপকারী ডাক্তারকে।

অবশ্য যাঁরা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবিধ ত্রুটি সংশোধনের জন্য আসে তারা এ পর্যায়ে পড়ে না।

ঝুঁকি যে কি সাংঘাতিক তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, চুল পুনঃস্থাপনের জনৈক হতাশাগ্রস্থ উন্মাদ রোগী একদা তার প্লাস্টিক সার্জনকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করে বসে। সে একটি ছুরি নিয়ে ডাক্তারকে তার মুখে পঁচিশবার আঘাত করে তাকে ভয়াবহ বিকৃত ও প্রাণসংশয়ী করে তোলে। বহু চেষ্টায় অপরাপর ডাক্তাররা সেই প্ল্যাস্টিক সার্জনকে বিকৃত দর্শন থেকে বাঁচায়।

আরেকটি ভুল ধারণা পোষণ করে পেশেন্টরা যে প্ল্যাস্টিক সার্জারী বুঝি

'পরিপূর্ণ বেদনাহীন' অর্থাৎ 'পেইনলেস-সার্জারী'। এর কারণ হল এ-বিষয়ে কিছু আনাড়ি লোকের এই অপারেশনকে 'পেইন-লেস' বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ায়। প্রায়শঃই দৈনিকপত্রে এ ধরনের বিজ্ঞাপন বেরিয়ে ভবিষ্যৎ রোগীদের ভুল ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এ অপারেশনে তথাকথিত পেইন-লেস অবস্থা থাকে শুধুমাত্র রোগীরা যখন অ্যানেসথেটিকের ঘোরে থাকে। তাও বলা যায় দৈহিক বেদনাহীনতা মাত্র। তার মানসিক কষ্ট বা বেদনা বা দুশ্চিন্তা কিন্তু আগাগোড়াই পেশেণ্টদের মধ্যে বর্তমান থাকে।

অবশ্য এ অপারেশনের বেদনা পরিণতি বা ফলাফলের দিক থেকে ভাবলে অসার্থক নয়। এবার দেখা যাক কোন্ ধরনের প্লাস্টিক সার্জারীতে কতটা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

ভুঁড়ি কমানোর অপারেশনে পেশেণ্টের বহুদিন এমন কি বহু সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁচি, কাশি, হাসি, পাশফেরা, খেলা চলে না। এমন কি সাধারণভাবে যে আরামে ঘুমনো তাও সম্ভব হয় না সে সময়টা।

এ সার্জারীতে 'মাইনর' শব্দটা প্রয়োগ করা কোনমতেই চলে না। কেননা অপারেশনের মাঝে বা পরে কোথায় যে বিপদ লুকিয়ে থাকে পূর্বাহ্নে তা কল্পনাও করা যায় না। যদিও এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল, তবু একথা সত্যি যে কোন প্রকার অ্যালার্জির দরুণ পেশেণ্ট নির্দিষ্ট কোন ধরনের অ্যানেসথেটিকে মারাও পড়তে পারে। ডাক্তার তো রক্তমাংসেরই মানুষ, কোন ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এসব ঝুঁকির কথা স্মরণে রেখেই রোগীকে যেতে হবে সার্জনের কাছে।

ফেস্ লিফট্ অপারেশনও খুবই বেদনাদায়ক। এ অপারেশন করতে তিন থেকে পাঁচঘণ্টা সময় লাগে। নাকের রূপান্তর বা নারীদের বক্ষের রূপান্তরেও সময় লাগে প্রচুর। পরবর্তী কয়েকদিন কষ্টও সহ্য করতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। অতএব একে পেইনলেস সার্জারীরূপে অভিহিত করলে মস্ত ভুল করা হবে। তবে কষ্ট না পেলে যেমন কেষ্ট মেলা ভার, আমাদের এই কিংবদন্তীর মত সুন্দর ও সুসম হতে হলে, কষ্টের মধ্য দিয়েই তা হতে হয়। তাই ঐ দুঃখ কষ্ট পরিণামে প্রকৃতই সার্থকতা লাভ করে!

এবারে দেখা যাক, মার্কিন অ্যাকাডেমি অফ ফেসিয়াল প্ল্যাস্টিক অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারী এবং আমেরিকান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক প্রদত্ত কসমেটিক ও সংশোধনী রূপান্তরের দৃষ্টান্ত :

নাকের রূপান্তর যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় রাইনো-প্ল্যাস্টি (Rhino-plasty). সাধারণত এসব কেস-এ ছোট নাক, সংকীর্ণ নাক, বা মোটা থ্যাবড়া নাক কিংবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধাযুক্ত নাকের অপারেশন করে ঠিক করে দেওয়া হয়।

আগে এসব রূপান্তর করা হত বাইরে থেকে অপারেশন করে। তাতে দাগ থাকবার ভয় থাকতো। বর্তমানে নাকের ভেতর দিক থেকে অস্ত্রোপচার করে সুসম নাক তৈরী করা হয়ে থাকে। ভেতরের চামড়া সরিয়ে নাকের হাড় কমিয়ে বা বাড়িয়ে সুন্দর আকারের নাক তৈরী করে দেওয়া হয়। ভেতর দিক থেকে অপারেশন করার পুরোধা হলেন ডাঃ মিল্টন রেডার নামক জনৈক নাক কান ও কণ্ঠ বিশেষজ্ঞ (otolaryngologist) আমরা যাকে বলি ই. এন. টি. স্পেশালিস্ট। নাক রূপান্তরের কাজে ডাক্তারকে হতে হবে একজন প্রকৃত আর্টিষ্ট ও ভাস্কর। তাঁর কল্পনা শক্তি ও দক্ষতার উপরেই নির্ভর করে সুন্দর নয়নমনোহর নাকের সৃষ্টি। এ অস্ত্রোপচার লোকাল অ্যানেস্থিয়ার দ্বারা করা হয়। সময় লাগে ঘন্টা দেড়েক। তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হয়।

জ্ঞান ফিরলে পেশেন্ট আয়নায় এক বীভৎস আকৃতির মুখ দর্শন করে। আক্রমণকারী ভয়ংকর এক গরিলা সদৃশ মুখাবয়ব হয়ে যায় তার। মুখ কালো ও নীলচে হয়ে বিকটভাবে ফুলে থাকে। দশ দিন চলে এ অবস্থা। নাকটির আকৃতি যথাযথ হতে কয়েক মাসও সময় লেগে যায়। নিরাময় হবার মুখে রোগীকে ভীড় এড়িয়ে চলতে হয়। কেননা নাসিকার কোনপ্রকার সংক্রমণ তার কষ্টসহ দামী অস্ত্রোপচারের দফা রফা করে দিতে পারে। সবই পণ্ডশ্রম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঝুলন্ত চোখের পাতা বা চোখের তলায় অস্বাভাবিক ফোলা সংশোধনের ব্যবস্থাও আছে। চোখের পাতা বেশি ঝুলে গেলে দৃষ্টিশক্তিও ব্যহত হয়। বাড়তি চামড়া কেটে এটা ঠিক করা হয়। চামড়া অদৃশ্যভাবে সেলাই করে দেওয়া হয়। ঘন্টা দুই সময় লাগে। দুদিন/তিনদিন হাসপাতালে থাকতে হয়।

সমস্ত মুখাবয়বকে উঁচু করা বা বয়েস কমিয়ে টান টান করা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'টোটাল ফেস লিফট্' (Rhytidoplasty) চড়া মেক আপ ও খারাপ খাদ্যাভ্যাসের ফলে যুবতী নারীদের অধিকাংশের বয়স অপেক্ষা দেখতে অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে সম্প্রতি। তাদের সমস্ত মুখ পরিবর্তনের জন্য অস্ত্রোপচার করতে হয়। সার্জন মুখের চামড়া তুলে তার বলীরেখা বা কুঞ্চনকে সটান করে দিয়ে বাড়তি চামড়াকে কেটে ফেলে। অতঃপর সে চামড়া যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। তৎপূর্বে ঝুলে যাতে না যেতে পারে তাই নিম্নস্থ চামড়ার টিস্যুগুলোকে শেলাই করে দেন। এ অস্ত্রোপচারের ফলাফল লোক বিশেষে ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কণ্ঠ বা গলার কোঁচকানো চামড়াও টান টান করে দেওয়া সম্ভব। এসব অস্ত্রোপচারে সময় লাগে কম বেশি চার থেকে পাঁচ ঘন্টা। সপ্তাহ খানেক থাকতে হয় হাসপাতালে। ক্ষেত্র বিশেষে ছ'মাসও লাগে মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হতে। সাধারণত পেশেন্টের মুখ মাসখানেক পর্যন্ত কালো ও নীলচে বর্ণ এবং বেশ ফোলা অবস্থায় থাকবে।

বক্ষ ছোট বা বড় করা কিংবা উত্তোলিত করা (Mammillaplasty বা

Mastoplasty). বক্ষ-অস্ত্রোপচার করা হয় শুধুমাত্র ২০ বৎসরোর্ধ নারীদের। তবু এটা কোন বয়সের পক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। গড়পড়তা এ ধরনের রোগীরা হল তিরিশ বছর বয়স্কা এবং বিবাহিতা। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্তন নিয়ে তারা অসন্তুষ্ট। এ ব্যাপারে প্রথম বিচার্য হল তাদের এ অপারেশনের উদ্দেশ্য কি? সৌন্দর্য বৃদ্ধি? না কি স্বামী বা বয় ফ্রেণ্ডদের ধরে রাখবার অস্ত্র বিশেষ? তাদের পূর্বাহ্নেই হুঁশিয়ারী করে দেওয়া হয় এটা কিন্তু 'যাদু' নয়। অপারেশনের পরেও তাদের সমস্যা পুরোমাত্রায়ই থেকে যেতে পারে। আবার যেসব নারীরা ক্ষুদ্র স্তনের দরুণ প্যাডেড-ব্র্যা পরতে অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে দর্শনডালির হেরফের-এর ইতর বিশেষ কিছুই হয় না। সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।

স্তনের সুগঠন আসতে সিলিকোন জেল সংস্থাপন করে দেওয়া হয়। এগুলো নিরাপদ। পূর্বেকার তরল সিলিকোন ইনজেকসন শুধু বিপজ্জনকই নয় বেআইনিও বটে।

অত্যধিক স্থূল স্তন খুবই বেদনাদায়ক। বিশেষ করে ব্র্যা-র স্ট্রাপসে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

ক্ষুদ্র বা স্থূল উভয় স্তন অপারেশনের পর কমপক্ষে দু' সপ্তাহের পূর্বে রোগিণীরা দু' হাত লম্বা করে বাড়াতে পারে না। দেড় মাসের পূর্বে সাঁতার কাটা সম্ভব হয় না। টেনিস, গল্‌ফ বা অপরাপর স্পোর্টস-এ যোগদান করাও অকল্পনীয়।

যৌবন সন্ধিক্ষণে বক্ষ অপারেশন করা হয় না। তবে নাকের, কানের, বা জন্ম দাগ বা অপরাপর দাগ অপসারণের ক্ষেত্রে বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। প্রথম যৌবনে প্লাস্টিক বা কসমেটিক সার্জারীর মূল্য অপরিসীম। বিপরীত সেক্স-এর কাছে ছেলেমেয়েরা যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে, এর মূল্য অপরিসীম। কেননা এর দ্বারা তাদের জীবনের ধারাই পাল্টে যায়। মানুষের নিয়মই হল সে যদি আয়নায় নিজেকে কুৎসিৎ দেখে তাহলে সে মনে মনেও নিজেকে কুৎসিৎ অনুভব করে। সেই দৈহিক পরিবর্তনে তার মনেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। কসমেটিক সার্জারী অনেক সময় লোকের নজরেও পড়ে না। কিন্তু রোগীর মনোবল ও কর্ম-ক্ষমতা এতদ্বারা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। নিজের প্রতি আস্থার উদয় হয়।

কথায় আছে—Beauty is skin deep. কিন্তু শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ মানুষের কাছে that's deep enough for them.

উপরোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক একটি কাহিনী বলা যাক্। লিগাল-মেডিক্যাল হিস্টরিয়ান কালিফোর্ণিয়ার মার্সাল হাউটস বলেছেন কি ভাবে প্লাস্টিক সার্জারী নাটকীয়ভাবে 'ক্রিমিনালদের' মনের পরিবর্তন সাধিত করে।

ইলিনয়িস স্টেট-এর জেলসমূহের প্রধান প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ জন. এফ. পিক, ব্যক্তিগতভাবে বিগত ২৫ বছর ধরে জেল বন্দী ৪০০০ কয়েদীর ওপর অপারেশন করেছেন। তিনি দেখেছেন, এর ফলে বন্দীদের আচার ব্যবহারেরই শুধু পরিবর্তন

হয় না, এর দ্বারা তাদের পুনরায় অপরাধের পথে ফিরে যাওয়াও কমে যায় ৭।৮ ভাগের মত।

মার্শাল হাউটস দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন ধর্ষণকারী অপরাধীর দৃষ্টান্ত দেন। অপরাধীর চেহারাও আকৃতি এমনই কদর্য ছিল যে, সে কোন মেয়েকেই একমাত্র পশুবল ছাড়া জয় করতে সমর্থ হয়নি। পেরোল বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে ডাঃ ইভান্স মার্কার্স কয়েদীটির মনুষ্যজনোচিত একটি নাক গঠন করবার মত একটি সাংঘাতিক সুকঠিন অপারেশনে ব্রতী হন।

জঙ্ঘা থেকে চামড়া তুলে নিয়ে, আর একটি পাঁজর থেকে হাড় নিয়ে তিনি কয়েদীটির নতুন এক নাক তৈরী করতে অস্ত্রোপচারে লেগেযান। এর চার মাস বাদে সেই দুর্দমনীয় 'রেপিস্ট' ক্রিমিনালটি জেলের একজন ট্রাস্টি হয়ে যায়। পরে ইলেট্রনিকের করেসপণ্ডেন্স কোর্সে সসম্মানে পাশ করে। প্যারোল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সুস্থ জীবন শুরু করে। পরে বিবাহ করে একটি সন্তানের জনক হয়।

এবারে ফের বক্ষের প্লাস্টিক সার্জারীতে ফিরে আসা যাক। ঝুলন্ত-স্তনকে সুসম করতে নির্দয়ভাবে বাড়তি মাংস ও বুকের টিসু কেটে বাদ দিতে হয়। এর ঝামেলাও আছে। চুচুককে যথা স্থানে স্থাপন করতে তাকে উচ্চস্থানে নিয়ে আসতে হয়। এ অপারেশনে লাগে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময়। কমপক্ষে দিন দশ থাকতে হয় হাসপাতালে। স্তন উত্তোলনও একইভাবে হয়।

বক্ষ অস্ত্রোপচারের পর রোগীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। জনৈকা রোগিণীর অভিমত, This is the fist time I have really felt like a real woman and wanted to be touched. বিভিন্ন সাইজের মধ্যে স্তনের সর্বজনপ্রিয় হল বি. কাপ।

তরল সিলিকোন ইনজেকসনের দ্বারা বক্ষোন্নতি মার্কিন দেশে ১৯৬৪-তে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আইন মোতাবেক, দেখা গেছে যে, তরল সিলিকোন যথা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না। সেটা স্থানান্তরে সরে গিয়ে ব্লাড ক্লটের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে টিউমার হয়ে ভয়াবহ পরিণতির দিকে চলে যায়। অর্থাৎ ক্যানসার হওয়াও অসম্ভব নয়।

অনেকে নিতম্ব কিংবা জঙ্ঘার বাড়তি অস্বাভাবিক মাংস কমাবার জন্যে সার্জনদের দ্বারস্থ হয়। কারুর বাহুর থলথলে ঝুলে পড়া চামড়া, তাও নিরাময় হয়ে যায় প্লাস্টিক সার্জারীতে।

ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগীদের তল পেটের ও জঙ্ঘার এমন কি ৪৫ পাউণ্ড চর্বিও কমিয়ে দিয়েছেন। বিশালকায় স্থূল এক ব্যাক্তির সারাদেহের ওজন ৩৭০ পাউণ্ড থেকে রাতারাতি কমিয়ে ১৮০ পাউণ্ডে নামিয়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে মেডিকাল হিস্ট্রিতে।

প্ল্যাস্টিক সার্জারীর দুঃসাধ্য বুঝি কিছু নেই।

গালে বা চিবুকে টোল পড়ানোও সম্ভব এর মাধ্যমে। গরুর মত ড্যাবডেপে চোখকে হরিণ নয়নাও করে দেন এই সব সার্জনরা।

এরপর আসে কানের বিকৃতি সংশোধন। হাতির মত কান। ঝুলে পড়া বা বিদসৃশ কানও সুন্দর কর্ণযুগলে রূপান্তরীত হয়ে যায় প্লাস্টিক সার্জারীর সৌজন্যে।

বিদঘুটে বা কদর্য কানের ব্যাপারে শিশুরাই এ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সবচেয়ে লাভবান হয়। কুৎসিৎ অস্বাভাবিক কর্ণ নিয়ে শিশুরা স্কুলে গেলে সহপাঠিদের দ্বারা বিদ্রূপবানে আক্রান্ত হয়ে মানসিক সাংঘাতিকভাবে দমে যায়। সে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র প্ল্যাস্টিক সার্জারী। শিশুর ভবিষ্যৎকে অন্ধকার ও দুর্বিসহ থেকে আলোকের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র প্ল্যাস্টিক সার্জারী।

প্লাস্টিক সার্জন শুধুমাত্র ডাক্তাররূপে বিবেচিত নয়। তিনি একজন ভাগ্য বিধাতা, দেবতা স্বরূপ। বিশ্বকর্মার মত তার নিপুণ হাতে ও পরম দক্ষতায় তিনি খোদার ওপর খোদকারী করে মানুষের চরম উপকার সাধনে সক্ষম।

মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম জে মেয়ো বলেছেন, every human being has the devine right to look human. প্লাস্টিক সার্জনরা পীড়িত মানবকে সুখী-সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করে চলেছেন। তাঁরা সত্যি সত্যিই নররূপী বিশ্বকর্মা। আমাদের এই সমস্যাকন্টকিতজটিল ও অভাবিত পূর্ব জগতে এটা প্রকৃতই আশীর্বাদ স্বরূপ।

After all, who says that mother nature always knows what she is doing.

এসব তো গেল বিদেশ বিভূঁয়ের কথা।

আমাদের দেশে, পশ্চিম বাংলায় একাধিক প্লাস্টিক সার্জন রয়েছেন যাঁরা আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য দক্ষতায় প্লাস্টিক সার্জারী করে যাচ্ছেন। যাঁদের কাজ দেখলে আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তাঁরা আমাদের পরম গর্বের মানুষ। তাঁদের দেব-দুর্লভ কাজের জন্যে দুস্থ নিপীড়িত, ত্রুটিপূর্ণ আকৃতির শত শত রোগীরা আজ নতুন জীবন, নতুন আশা ফিরে পেয়েছেন তাদের একদা চরম হতাশাগ্রস্ত জীবনে।

জর্জিয়ার মিলেডগেভাইল রেল স্টেশনে দশজন হিংস্র গুণ্ডাকৃতির যুবক সদ্য ট্রেন থেকে নামা ক্ষীণ অথচ শক্তিশালীদেহী গোল্ড বার্জারকে কুটিল দৃষ্টিসহ প্রায় ঘিরে ধরলোই বলা চলে। ডাক্তারের হাতে একটি ছোট্ট ব্যাগ। বাদামী চুলের মানুষটি মানুষের পরম শত্রু এক রোগকে নির্মূল করবার মানসে উৎসর্গীত প্রাণ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি ওখানে থাকা রুগ্ন ও দুর্গন্ধ ছড়ানো একটি কুকুরের পানে তাকালেন। জর্জিয়ার লোকেরা এ রোগটীর নাম দিয়েছে "ব্ল্যাক-টাঙ" (কালো জিহ্বা)। ডাক্তারের পকেটে রয়েছে একটি চিঠি যা সে গত রাত্রে অ্যাটলান্টা হোটেলে পেয়েছে।

তাতে লেখা ঃ

"ডাক্তার, তোমার এখন জর্জিয়ায় থাকা বিপজ্জনক। স্বদেশ উত্তরাঞ্চলে ফিরে যাও, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও। অবাঞ্ছিত নাকগলানো লোকদের এখানে স্থান নেই। এটাই তোমার প্রতি শেষ সাবধানবাণী।"

অক্ষম গ্রাম্য হস্তাক্ষরের চিঠির তলায় সই রয়েছে—জর্জিয়া ক্ল্যাভার্ণ, কিউ—ক্ল্যাক্স ক্ল্যান।

পোষাকের মধ্যে ডাক্তারের শরীর শক্ত হয়ে এল রাগে। তিনি দক্ষিণ দেশের এই শহরে এসেছেন এমন একটি বিচিত্র অনুসন্ধানকার্যে যা ইতিপূর্বে কোন মেডিকাল মানুষ সে পথে অগ্রসর হয়নি।

[এখানে কিউ-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই নামের দলটি গঠিত হয় মার্কিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ কিছু উগ্রপন্থীদের দ্বারা। এরা রহিত ক্রীতদাস প্রথার গোঁড়া সমর্থক এবং কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোবিদ্বেষী। এদের পোষাক মাথা ঢাকা শ্বেত শুভ্র বস্ত্রে। শুধু নিগ্রো নয়, ক্যাথলিক এবং ইহুদীদেরও এরা নিদারুণ ঘৃণা করতো। এরাই ভয়াল লিঞ্চিং প্রথার প্রবর্তন করে। এদের কাছে অপরাধী বিবেচিত নিগ্রোদের এরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারতো। এরা ক্রীতদাসদের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল অজ্ঞানতা, আতঙ্ক সৃষ্টি এবং কুসংস্কার নিয়ে। এদের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড অদ্ভুত। এরা কঠোর মৃত্যু শপথে বিশ্বাসী। নরহত্যা এদের কাছে জল-ভাত।]

উক্ত হিংস্র দলের ২৫ বছর বয়স্ক দৈত্যকায় এক ছোকরা সামনে এগিয়ে এল মারমুখী ভাবে। কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, হে-ই। তুমিই কি সেই ডাক্তার, যে ওয়াশিংটন থেকে এখানে এসেছ আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাতে?

এই দানবাকৃতি পেশীবহুল চরম শক্তিধর হিংস্র যুবক তার কুখ্যাত ক্রিয়াকর্মের জন্য এ অঞ্চলে "আয়রণ জিম" (লৌহ জিম) নামে পরিচিত।

—হ্যাঁ, আমিই ডাঃ গোল্ড বার্জার, প্রায় অকুতোভয়েই চিকিৎসক তরুণ জবাব দেয়, না, আমি এখানে অন্যায় আগ্রহে নাক ঢোকাতে বা উঁকি মারতে আসিনি। প্রতি বছর যে ভয়াল রোগটি হাজারে হাজারে মানুষ মেরে ফেলছে সেই রোগের সম্বন্ধে কিছু জানতে এসেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই।

এমন সময় একটি করুণ মনুষ্যাকৃতি কংকালসার লোক প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে ডাক্তারের পায়ের কাছেই মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। ডাক্তার এ জীবনে রেল দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতিতে নিহত আহত অজস্র বীভৎস মানুষ দেখেছেন, তবু এখনকার এই হাড়সর্বস্ব, বিকৃত আকৃতির রুগ্ন লোকটিকে দর্শন করে সর্বপ্রথম দুঃখে আতঙ্কে তিনি অপাঙ্গে শিউরে উঠলেন। একি মানুষ না মানুষের প্রেতাত্মা! এই ভয়াল প্রাণীটি একজন পুরুষ মানুষ। বয়েস বোঝবার আর উপায় নেই এখন। ২০ থেকে ৫০-এর মধ্যে যে কোন একটা হবে। চামড়া তার জীবন্ত কোন মমীর মত। কোঁচকানো, শুকনো, শুষ্ক। কোথাও কালো দাগ, কোথাও লাল দাগে ভর্তি সর্বাঙ্গ। মরে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত সে চর্মাবরণের প্রতি চাওয়া যায় না বেশিক্ষণ। হাত পা দেহ হাড় সর্বস্ব। চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে, শূণ্য মৃত দৃষ্টি। এই মানব-সজ্ঞী বিশেষ প্রাণীটির সারা দেহে বিভিন্ন স্থানে ঘা হয়ে আকৃতি আরও কদাকার হয়ে গেছে। মনে হয় কোন ম্যাগনেটাইজড সূর্য বা কসমিক বিস্ফোরণ-এর অঙ্গকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে চরম দগ্ধ করে ছেড়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নড়ে চড়ে উঠলো। অতঃপর অসম্ভব ফোলা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বাকে বহু কষ্টে নাড়িয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করলো। বোধ্য কোন শব্দের পরিবর্তে জান্তব এক গোঙানি বেরিয়ে এল কণ্ঠ থেকে।

ভীড়ের মধ্য থেকে একটা লোক হাতে ছোরা নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এসে বলে উঠলো, ডাক্তার তোমার সঙ্গে এই ক্রেজি অ্যালফ্ বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। ডাক্তার, ও কিন্তু তোমায় আমার মতই পাগল ভাবছে। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের ডাক্তার এখানে এসে ওর এই জঘন্য রোগ বাঁধাতে চায়? ডাক্তার এবার ক্রেজি অ্যালফের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করো। হাজার টাকা দিলেও আমি বেচারাকে স্পর্শ করতে রাজি নয়।

জোসেফ গোল্ড বার্জার হাতের ব্যাগটা মাটিতে রেখে ক্রেজি অ্যালফের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো। ভয়াবহ ঘা দাগ ও রোগের কোন পরোয়াই করলো না সে।

—একে আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। বেচারা দীর্ঘদিন হল পেলাগ্রা (Pellagra) রোগে আক্রান্ত হয়েছে। অবশ্য ওকে যদি আমি স্টাডি করতে পারি তো অপরাপর মানুষদের আমি হেলফ্ করতে পারব।

বিশাল থাবাসদৃশ একটি হাত এসে ডাক্তারের কলার ধরে তাকে নিষ্ঠুরভাবে

পাক খাইয়ে দিল। সবিস্ময়ে ডাক্তার দেখলো তার দিকে রক্ত চক্ষু করে ঝুঁকে রয়েছে দানবাকৃতি "আয়রণ জিম"। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠলো, ড্যাম ইউ সো অ্যাণ্ড সো। তোমায় আমি খুন করে ফেলব। ক্রেজি অ্যালফ্ হল আমার ভাই। উত্তর দেশ থেকে আসা কোন ফরেনারকে এখানে এসে আমাদের নিয়ে মজা করতে কক্ষনো দেব না। বরদাস্ত করব না কিছুতেই।

—বন্ধু, আমি 'পেলাগ্রা' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্যেই এঅঞ্চলে এসেছি। তুমি বুঝছ না যে—

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের একটি আর্দ্র দিনটির বাতাসে বাতাসে যেন নীল ঘৃণা জমে এল অকস্মাৎ। উপস্থিত দলটি রণহুঙ্কার দিয়ে উঠলো। ছুরিকাবাহী লোকটির হাতের অস্ত্র ঝলকে উঠলো, একটা লোক পকেট থেকে দীর্ঘ একটা ক্ষুর বের করে ফেললো। তারা উসকে দিল 'আয়রণ জিমকে' ঃ

—মেরে ফেল ব্যাষ্টার্ডকে।

—তোমার সঙ্গে আমরা আছি জিম। বিদেশীটাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দাও।

—মেরে তক্তা করে দাও শয়তান ডাক্তারটাকে।

আয়রণ জিমের বুটপরা বিশালকায় একটা পা সজোরে লাথিরূপে এগিয়ে গেল ডাক্তারের চিবুক লক্ষ্য করে।

নিউইয়র্কের যে অঞ্চলে তার বাস, সেখানকার মারদাঙ্গা দলের মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে আশৈশব। মারপিটের মুকাবিলা বা আত্মরক্ষার মারপ্যাঁচ তারও কম বুট তাঁর চিবুক স্পর্শ করবার পূর্বেই তিনি একপাশে হেলে গেলেন চোখের পলকে এবং পরমুহূর্ত সাপের ছোবলের মত দ্রুততায় জিম-এর আক্রমণকারী বুটসহ পায়ের গোড়ালী বজ্রচাপে চেপে ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরদিকে একটি ভীম টান দিতেই লৌহ-জিম প্রবল শব্দে চিৎপটাং হয়ে পপাত ধরণীতলে হয়ে গেল। ভারী দেহ পতনে গুরুতর আঘাত পেয়ে, শক খাওয়া মানুষের মত জিম সেখানেই পড়ে রইল। দৃষ্টিতে তার ফুটে উঠলো পরম বিস্ময়, কিছুটা বা ডাক্তারের প্রতি সপ্রশংসভাব।

নিজের ক্ষমতার ব্যবহারে নিজের পজিসন এখন তাঁরই অনুকূলে। সে এই মুহূর্তে বিজয়ী। কালবিলম্ব না করে, ঘিরে থাকা দলটির প্রতি তাকিয়ে ডাক্তার বলে উঠলো, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হয়ো না তোমরা। আমি তোমাদের শত্রু নয়, আমি মিত্র। তোমাদের আসল শত্রু ঐ 'পেলাগ্রা'কে ঘৃণা করতে শেখ, ভয় পেতে শেখ, কি করে ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পার সে চেষ্টায় থাক এবং সে প্রচেষ্টায় যারা ব্রতী তাদের সাহায্য করো। এই দক্ষিণাঞ্চলে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে চলেছে। মানুষের পর মানুষ অপঘাতের মত মারা পড়ছে। চেয়ে দেখ এই অ্যালফ্-এর পানে। আমি নিশ্চিত যে, ওর এ রোগ আটকানো যেত যদি আমরা

এ রোগের কারণ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অবহিত হতাম। আমি সবে এমন একটি অনাথ আশ্রম দেখে এসেছি যেখানকার ১২০ জন শিশুর মধ্যে ৬৭ জন আক্রান্ত হয়েছে পেলাগ্রা-তে। গত দু'মাসে ফুটফুটে ১৬টি শিশু ভয়ংকরভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

আমি আরও কিছু কেস্ দেখতে চাই। অ্যাটলান্টা থেকে আমি শুনে এসেছি সে মিলেডজেভাইলের পাগলাগারদে ২০০ রোগী পেলাগ্রা'তে আক্রান্ত হয়ে ভুগছে। এখানে এমন কেউ আছে কি, যে আমায় বলে দেবে কি ভাবে ঐ অ্যাসাইলমে আমি যেতে পারি?

সহসা অস্বাভাবিক নিরবতা নেমে এল দলটির মধ্যে। মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে গেল ডাক্তার। ভেবে দেখলে এদের এক এক জনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে সে সক্ষম্, কিন্তু দলবেঁধে যদি আক্রমণ করে বসে তাহলেই বিপদ। ঐ মারাত্মক ছুরি দিয়েই খতম করে ফেলবে। মনে পড়লো মৃত্যুভয় দেখানো পকেটে থাকা চিঠিটার কথা। এরা কি ক্লু ক্লাক্স ক্ল্যানের সদস্য? তারাইকি পাঠিয়েছে ওকে তাড়াতে, চাবকাতে বা একেবারে খতম করতে? সে অবশ্য পেলাগ্রা রোগের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণাঞ্চলের গভীরে অনেক শহর নগরেই ভ্রমণ করেছে ইতিমধ্যে। জনগণের মধ্যে ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যানদের সম্বন্ধে চরম ভীতিভাব সে প্রত্যক্ষ করেছে সব যায়গাতেই।

ডাঃ গোল্ড বার্জার সরাসরি তাকালো ছুরি হাতে হিংস্র দৃষ্টির লোকটার পানে। ঠিক দশদিন পূর্বে ডাক্তার জর্জিয়ার ভালডোস্টা নামক স্থানে এক কৃষ্ণাঙ্গের ক্ষত-বিক্ষত দেহ দড়ি ঝোলানো অবস্থায় গাছে ঝুলতে দেখেছে...মশা পোকা অধ্যুষিত সে ভয়ার্ত শবটার কথা স্মরণ করে ডাক্তার এখন সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো।...ঐ দশা কি তারও ঘটবে? এই খুনে দলটির মধ্যে তার প্রতি কি সহানুভূতি সম্পন্ন একটি মানুষও নেই?

একজন গাট্টা গোট্টা পোড়-খাওয়া লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিল ইউ এস পাবলিক সার্ভিসের এই ডাক্তার বার্জারের দিকে। এবার সে এগিয়ে এসে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো, এস আমার সঙ্গে বিদেশী। আমি তোমায় নিয়ে যাব সে এসাইলমে। সেখানে রয়েছে আমার স্ত্রী, ভাই এবং এক ভাইপো। তাদের পেলাগ্রা হয়েছে। তাদের চেহারা এই ক্রেজি অ্যালফের চেয়েও অনেক বীভৎস আকার ধারণ করেছে।

মেডিকাল কলেজে পড়তে পড়তেই ডাঃ বার্জার পেলাগ্রার কথা প্রথম শোনে। সে ঐ রোগাক্রান্ত মানুষ জনের বহু ফটোগ্রাফ দেখেছে, সাদাকালো এবং রঙিন। কি বীভৎস সেসব দৃশ্য। সারামুখ ভয়াবহভাবে ফোলা, তাতে একাধিক গর্ত। চামড়ার স্ফীতি ও ঘা দেখে ভয়াল কুষ্ঠরোগের কথা স্মরণে আসে। সারাদেহের চামড়া অজস্র কালো দাগে আকীর্ণ।

ডাক্তার জানতো প্রাচীন স্পেনীয় চিকিৎসকেরা একে ম্যাল ডি লা রোজা

(Mal de la Rosa) নামে অভিহিত করেছে। তারা এ রোগকে কুষ্ঠের সঙ্গেই তুলনা করতো। তিনশত বৎসর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী প্রতিটি বিজ্ঞানী এ রোগকে স্টাডি করে কোন কিছুর সঠিকভাবে হদিশ পায়নি। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর চিকিৎসক ফ্র্যাপোলি একে "ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের প্রতি প্রদত্ত অন্যতম হিংস্রতম ব্যায়াম" (One of the cruelest diseases God ever inflicted on man) হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১৯১৩-র বসন্তকালে ওয়াশিংটনে গুরুতর সব সংবাদ আসতে লাগলো এই বলে যে, দেশের দক্ষিণাংশে এ রোগ শহর বন্দর গ্রাম ও ফ্যাক্টরী ওয়ার্কারদের মধ্যে দাবাগ্নির মত হু হু করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। টেকসটাইল শিল্পে তখন খুব মন্দা যাচ্ছিল। কর্মহীন বেকার, অর্থনৈতিক ব্যাপারে চরম দুর্দশাগ্রস্ত দুস্থদরিদ্র মানুষেরাই সর্বাধিক আক্রান্ত হচ্ছিল এই কালান্তক ব্যাধিতে। এ রোগ ক্রমান্বয়ে বিকলাঙ্গ অক্ষম ও উন্মাদগ্রস্ত করে শেষঅবধি মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিচ্ছে রোগীদের।

লোম্বাডিতে জনৈক ঐতিহাসিক লিখলেন, This terrible infliction is hurrying whole papulations to the grave.

দক্ষিণাঞ্চলের ডাক্তারগণ দেখে শুনে হতচকিত, বিহ্বল ও ভীত হয়ে পড়লো। সীমাহীন ত্রাস ছড়িয়ে গেল চারদিকে। পুরো ৪০০০ শিশু ও বালক পেলাগ্রা ক্রান্ত হল মিসিসিপিতে। সাত আট বছরের শিশুরাও ভুল ও প্রলাপ বকা দিয়ে শুরু করে শেষপর্যন্ত গিয়ে ভর্তি হল মানসিক এসাইলমে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। সেখানে তাদের লোক চক্ষুর অন্তরালে জনসংযোগহীনভাবে আবদ্ধ করে রাখা হল।

ডাডেভাইলের গডক্রে পরিবারের পুরো ৪৫ জনই এ মহামারীতে একযোগে আক্রান্ত হল। এই চরম দারিদ্র প্রপীড়িত পরিবারের ১৮ জন মারা গেল। ১১ জন শেষ পরিণতির জন্য গিয়ে ভর্তি হল পাগলা গারদে। বাদ বাকিরা পথে পথে বাড়ি বাড়ি খাদ্য ভীক্ষা করবার মানসে, ঘুরতে থাকলো। কিন্তু বেচারাদের মুখের সামনে ভীত সন্ত্রস্ত গৃহস্থরা দরজা বন্ধ করে দিতে লাগলো। অনেকেই হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিল কিংবা জানালা ফাঁকে গুলি চালালো।

সারা গাঁ ছেয়ে গেল রোগীতে। মিসিসিপি, অ্যালবামা জর্জিয়ার কিছু কিছুস্থানে রাস্তায় বা রেল স্টেশনে আর্ম গার্ড বসানো হল ভীত সন্ত্রস্ত নাগরীকদের দ্বারা।

—দেখামাত্র গুলি করবে যদি পেলাগ্রাক্রান্ত কোন নরনারী আমাদের এ শহরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে, এটাই ছিল স্থানীয় মেয়র, শেরিফ বা সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ।

কিন্তু বুলেট বা সাবধানবাণী এই ভয়াল রোগাক্রমণকে রুখতে পারল না। মানুষের যাবতীয় সতর্কতাকে ভেদ করে পেলাগ্রা তার বিধ্বংসী আক্রমণে এগিয়ে চললো।

চিকিৎসকরা এ-বিষয়ে একমত হল যে, পেলাগ্রা একটি সংক্রামক রোগ। কিন্তু কোন পথে কিভাবে এর সংক্রমণ ঘটে? পোকামাকড়ের মাধ্যমে? দূষিত জলের দ্বারা? বাতাসে সঞ্চরণশীল বীজাণুর সাহায্যে? এ ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত নন। শুধুমাত্র অনুমান। এক এক জনের এক এক প্রকার অভিমত।

এ প্রসঙ্গে পাবলিক হেলথ সার্ভিসে রিসার্চ প্রভৃতিতে উৎসর্গীকৃত ডাঃ বার্জারকে ডেকে পাঠালেন ওয়াশিংটনের সার্জন-জেনারেল ডাঃ ব্লু। তিনি জানতেন এই রহস্যজনক রোগের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় এই তরুণ ডাক্তারটিই যথার্থ উপযুক্ত। এর ধৈর্য সহ্য দক্ষতা ও সীমাহীন উদ্যমের তুলনা নেই।

বছর দুই পূর্বে ফিলাডেলফিয়ার হাজার হাজার নাবিক, গা ভরা বেদনাদায়ক চুলকানিও অদ্ভুত 'র‍্যাশ' (rash) নিয়ে এসে উপস্থিত হল। কারুর কারুর দেহে দশ-হাজার সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তক্ষরণকারী ফুস্কুরি দেখা দিল।

এই অদ্ভুত রোগের তদন্তের ভার পড়লো ডাঃ বার্জারের ওপর। সে গিয়ে ঠিক করলো নিজেও নাবিকদের মত জীবন-যাপন করে দেখবে। শুরু হল তার সখের নাবিক জীবন-যাপন। নাবিকদের সস্তা-কাফেতে খেতে লাগলো, তাদের নোংরা বাসস্থানে খড়ের বিছানায় শুতে শুরু করলো। এইভাবে তার চামড়ায়ও দেখা দিল সেই রোগ। গোল্ড বার্জার পরীক্ষার জন্য খড়ের ওপর তার বাহুদ্বয় রেখে, খালি চোখে অদৃশ্য সব ক্ষুদ্র পোকাসমূহের সাংঘাতিক কামড় গ্রহণ করলেন নিজদেহে।

পেডিকিউলইডস ভেন্ট্রিকোসিস (*Pediculoides Ventricosis*) নামক অতিক্ষুদ্র কীট-এর দ্বারা, কামড় ডাঃ বার্জার ঘোষণা করলেন। ঘরের যাবতীয় তোষক পরিশোধন (Sterilize) কর এবং তাহলেই মহামারী থেমে যাবে। এ উপদেশ মেনে চলবার পর দেখা গেল বন্দর থেকে নাবিকদের উক্ত রোগ অন্তর্হৃত হয়েছে।

ডঃ ব্লু ওকে এবার নতুন নির্দেশ দিলেন, এখুনি তোমাকে অ্যাটলান্টা চলে যেতে হবে। ঐ নগরীকে সদর দপ্তর করে – যে যে শহরে পেলাগ্রা দেখা দিয়েছে তার প্রতিটিতে সরেজমিন তদন্ত করবে।...সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে...জানবে কি ভাবে তারা জীবন-যাপন করে। জনগণের আস্থাভাজন হবে... কিসের দ্বারা এ রোগের উৎপত্তি যে কোন উপায়েই তা আবিষ্কার করতে হবে। যদি কারুর পক্ষে এটার উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়, সে একমাত্র তুমিই।

ডাঃ বার্জার বড় বড় নগরীতে বিশেষ রইল না। সে গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহরে তার অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে যেতে থাকলো। দুটো বিচিত্র ব্যাপার তার মনে গভীরভাবে উঁকি দিল এই রহস্যময় পেলাগ্রারোগ সম্বন্ধে।

১. এ রোগের প্রাদুর্ভাব প্রধানত দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চল এবং মিল ফ্যাক্টরী-ওয়ালা শহরে।

২ সাধারণত দুস্থ গরীব ফার্মকর্মী, ভাগচাষী এবং ফ্যাক্টরী কর্মীরাই এ রোগ

সংক্রমণে পড়ে।

মডেল টি ফোর্ড এবং ঘোড়ায় টানা গাড়ি ভাড়া করে দুর্গম গ্রাম্য পথে মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করতে লাগলো ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো এই বিজ্ঞানী শার্লক হোমস ডাঃ গোল্ড বার্জার।

এক স্থান থেকে আরেকস্থানে পরিদর্শনে যাবার ফাঁকে ডাক্তারের মনে নানা চিন্তার উদয় হয়ঃ

বহু ইরোপীয় রিসার্চারদের অভিমত মত তাহলে এ রোগ কি সত্যি সত্যি স্যাণ্ডফ্লাইর দ্বারাই হয়? হতে পারে, হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা এই দক্ষিণাঞ্চলের গরীব নরনারীদের দুঃস্থ ও অপরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন, নোংরা বস্তি ও তদোধিক নোংরা পোষাক, বাড়ির উঠোনে স্তুপীকৃত সারমেয় পুরীষ। দীর্ঘদিন নোংরা পোষাক না ধোওয়া, আর যেখানে সেখানে অকথ্য জঞ্জাল বিষাক্ত সব মাছিদের অনুকূল পরিবেশই বটে।...

কিন্তু...একটা খটকা আছে। এ রোগ যদি সংক্রামক হয়, তাহলে এ রোগ অধ্যুষিত হাসপাতালের চিকিৎসারত ডাক্তার নার্সরা আক্রান্ত হয় না কেন? তারা গুরুতর পেলাগ্রা রোগীদের নাড়াচাড়া করে, বিষাক্ত দুষিত চর্ম ধুইয়ে পরিষ্কার করে। তাদের সঙ্গে রোগীদের দৈহিক সংযোগ অহরহ ঘটে থাকে। ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ করা ও রক্তপুঁজ সমন্বিত ব্যাণ্ডেজ খোলার মাধ্যমে।.. তাহলে?

জলন্ত সূর্যের পানে তিনি চোখ কুঁচকে বারেক তাকান। তার মনে চট করে এক নতুন সিদ্ধান্তের জন্ম হয়। এ ব্যাপারে সূর্য কি দোষী? কেননা দেখা গেছে এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ফুটে ওঠে দেহের সেইসব অংশে, যা কিনা প্রায়শই সূর্য কিরণে উন্মুক্ত থাকে? বসন্ত ও গ্রীষ্মকালই এ অঞ্চলে ভয়াবহ সময়, পেলাগ্রা রোগ ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বরেই প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানে এখানে।

নিজ মনেই ফের হেসে ওঠে ডাক্তার, I am a fool! আমি ভুলে যাচ্ছি যে, যারা খুব কমই সূর্য কিরণে উন্মুক্ত থাকে এমন বহু লোকও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাহলে? There must be some other answer ..

একদা তার ঘোড়ার গাড়ি যখন একটা পথে বাঁক নিল সহসা পাশের ঝোপের আড়াল থেকে দু'জন পাথরের মত মুখওয়ালা মানুষ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো, দুজনের যে বড়, বছর ৪৫ বয়সের লোকটা হাতের উইনচেস্টার রাইফেলটাকে চাপড়াতে চাপড়াতে হিংস্র দৃষ্টিসহ কাছে এসে বললে, তুমিই সেই নতুন ডাক্তার যে এসব অঞ্চলে নাক ঢুকিয়ে ঝামেলা করে বেড়াচ্ছ? শান্ত ছেলের মত চলে এসেছ। এত কাছ থেকে গুলি করে তোমার ঘিলু বের করতে ঘৃণা বোধ করছি।

ডাঃ বার্জার অপাঙ্গে চমকিত হল। সে জানে অপরিচিত বিশেষ করে ফেডারেল-এর লোকেদের এতঅঞ্চলের কেউই পচ্ছন্দ করে না। তবে এ কথাও ঠিক ডাক্তার

এসব ভয়ভীতির প্রদর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদৌ রাজি নয়।

লোকটা কি চায়? বার্জারের মুখের ওপর অনেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, শিশু ও বালকেরা ঢিল ও লাঠি ছুঁড়েছে তার প্রতি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করবার মুখে, ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা আর এই মহামারীর ত্রাসাক্রান্ত মানুষজন দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, সে এসেছে এদের উপকার করবার মানসে, কিন্তু এরা শুধু প্রদর্শন করে চলেছে আকণ্ঠ ঘৃণা, চরম শত্রুতা এবং যৎপরনাস্তি না পছন্দ।

এখন এই লোকগুলো কি তাকে গুলি করে মেরে খালে বিলে বা জঙ্গলে মৃত দেহটা ফেলে দিতে অভিলাষী?

ডাঃ বার্জার কম বয়স্ক লোকটার মুখের পানে তাকিয়ে চমকে উঠলো লোকটা পেলাগ্রীন (পেলাগ্রা রোগগ্রস্থ)। তার মুখের ঘা দিয়ে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। হাত পা ও গলার চামড়া অস্বাভাবিক পুরু হয়ে উঠেছে। লোকটার হাবভাব জড়-বুদ্ধিসম্পন্নদের মত। কারণ এ রোগের বাড়াবাড়ির মুখে ব্রেন অ্যাটাক হয়। স্বাভাবিক সুস্থ্য সমর্থ নর-নারী-শিশুকে এ রোগ অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তনে বীভৎস করে তোলে।

ডাঃ গোল্ড বার্জার মরতে চায় না, বেঁচে থাকার প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ। তীব্র ত্রাসে মনে পড়ে যায় ওয়াশিংটনে থাকা তার স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের কথা। আর কি সে তাদের দেখতে পাবে?

ঘোড়ায় চড়া রাইফেলধারী ও তার পুত্র গাড়ির সামনে কিছুটা এগিয়ে যেতেই ডাঃ গোল্ড বার্জার গাড়ি থেকে এক লাফে নেমে নিকটবর্তী বৃক্ষ অন্তরালে চলে গেল এই উন্মাদ আক্রমণকারীর হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে। গভীর জঙ্গলে পালাবার মুখে হোঁচট খেয়ে পড়ে হাঁটুর ছাল-চামড়া রক্তাক্ত হল। অতঃপর একটা নালার মধ্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণকারী সেই বয়স্ক লোকটা রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়লো। গুলিটা ডাক্তারের কান থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরের একটা গাছে গিয়ে বিদ্ধ হল।

কাছাকাছি ঝোপের কাছ থেকে আক্রমণকারী কণ্ঠধ্বনীত হল, পালাবার আর চেষ্টা করো না হে মিস্টার। আমার নাম অলিভ-উইলসন। এ অঞ্চলে গুলি করায় সবচেয়ে এক্সপার্ট আমি। দ্বিতীয়বার কিন্তু আমি তোমায় প্রাণে মেরে ফেলব।

গোল্ড বার্জার আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, উইলসন তুমি কি উন্মাদ? আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছ? এ জীবনে আমাদের আর কখনো দেখা সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয়নি। আমি তোমার কোন ক্ষতি চাইনি।

এবার উইলসন একেবারে কাছে এগিয়ে এল। হাতে রাইফেল তাগ করা। হেল। ডাক্তার আমি তোমার সাহায্য চাইতেই এসেছি। আমার বাচ্চা মেয়ে

কাশি ও গলার ঘায়ে রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তাকে সুস্থ করে দাও ডাক্তার, তারপর তুমি তোমার কাজে চলে যাও, আমাদের এ অঞ্চলে কোন ডাক্তার নেই। আমি নজর রাখছিলাম যাতে তুমি পালিয়ে না যেতে পার।

দু'বছরের মেয়েকে অশুধপত্র দিয়ে ভাল করে দিল ডাক্তার। উইলসনের ২ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক পাঁচটি সন্তান। ওদের কেবিনের ধুলো ও নোংরা অবস্থা দেখে চমকে গেল ডাক্তার। ঘরে আবার সারা দেহে মাছি ও পোকাভরা দুটি কুকুরও বাস করছে। কুকুর দুট ব্ল্যাক টাঙ্গএ আক্রান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে। লেজ নাড়বার বা অপরিচিত দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠবার শক্তিও বুঝি তাদের অবশিষ্ট নেই।

গুড গড্, ডাঃ বার্জার সভয়ে স্বগতোক্তি করে ওঠে, এদের পরিবারের সবাই পেলাগ্রা রোগে আক্রান্ত হয়েছে যে, ২ বছরের বালকটির দেহেও চক্র চক্র দাগ দেখা দিয়েছে, বাড়ির ৩৫ বছরের গিন্নীকে মনে হচ্ছে লোলচর্ম ও হলদে ঘা আকৃত ৬০ বছরের এক বীভৎস বুড়ি। বৃদ্ধ পিতা ক্লাইভ হাড় কংকাল সার হয়ে আধভাঙ্গা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। প্রায় চলচ্ছক্তিহীন এ রোগ মানুষের শক্তি-সামর্থ ও জীবনীশক্তি একেবারে নিংড়ে নেয়।

—ডাক্তার, বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমাদের সঙ্গে তোমাকে সাপার খাবার আমন্ত্রণ জানাছি, উইলসন খুশী খুশী মুখে বললে।

একটা জীর্ণ কাঠের স্টোভের ওপরে অনেকগুলো পাত্রে কি সব রান্না হয়েছে। ডাঃ বার্জার বললে, ধন্যবাদ। আমি সানন্দে এই আমান্ত্রণ গ্রহণ করলাম···আচ্ছা দয়া করে বলবেন কি সাধারণত আপনারা কি প্রকার খাদ্য খেয়ে থাকেন? অন্য কিছু নয়, আমি পেলাগ্রা রোগের সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কারের জন্যই এ প্রশ্ন করছি।

মিসেস উইলসন বলে ওঠে, আমরা গরীব মানুষ। তবু ভাল খাবারই খেয়ে থাকি, আমরা বিস্কিট, মাশ (mush) গ্রিটস (grits) সিরাপ, পার কর্ণ রুটি খেয়ে থাকি। এটা অবশ্য এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নয়, তবু এতে আমাদের পেট ভালভাবেই ভরে।

—কিন্তু মাংস? মাছ? ডিম? ছোটদের জন্য দুধ? ডাক্তার জিগ্যেস করে।

তিক্তভাবে হেসে ওঠে বৃদ্ধ ক্লাইভ উইলসন, ওসব হল শহুরে পয়সাওয়ালা লোকের বিলাসিতা। ডাক্তার, জানেন কি ভাগচাষ করে আমরা কি উপার্জন করি? আমার এই টাকায় সংসার চালানো কি যে দুঃসম্ভব··· সাতটি পেট চালাতে হয় আমাকে। বছরে দু খণ্ড শুয়োরের মাংস পেলেই নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি।

—এই খাদ্যেই আপনারা দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছেন, মিঃ উইলসন?

—উহুঁ, কখনো কখনো শুধুমাত্র গ্রিটস, মাশ ও সামান্য সিরাপ। তবে সব

সময়ই আমাদের কর্ণ রুটি থাকে। উইলসন পরিবারের কাউকেই উপবাসে থাকতে হয় না।

ডাক্তার মনে মনে এ সংবাদটি টুকে রাখলেন। এই রকমের একঘেয়ে অসম খাদ্যই কি ভয়াবহ পেলগ্রো রোগের কারণ? এ কর্ণ ব্রেড কি দূষিত? দেখা যাক, অপরাপর পেলাগ্রিনদের জিগ্যেস করতে হবে তাদের দৈনিক আহারের তালিকা কি।......

দমবন্ধ হওয়া প্রচণ্ড গরম সেদিন। অ্যাটলান্টা হোটেলের ক্ষুদ্র ঘরে ছটফট করছে ডাক্তার! ঘুমনো অসম্ভব......যাও তন্দ্রা আসছে তাও চরম দুঃস্বপ্নে ভরা। উইলসন পরিবারের রোগাক্রান্ত বীভৎস আকৃতির মানুষগুলোর ছবি মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে ডাক্তারকে শিহরিত ভীত করে তুলছে।

আগামীকাল মিলেডগেভাইল গামী ট্রেনে উঠে জর্জিয়া স্টেটের পাগলা গারদে পৌঁছতে হবে। স্থানটা নাকি এমন জঘন্য যে দান্তের, ইনফার্ণোর মূর্তিমান বাস্তব স্বরূপ সেটা। তিনঘন্টা পূ.র্ব গুরুতর সংবাদবাহী একটি টেলিগ্রাম পেয়েছে সে।

ঃ টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র মিলেভগেভাইলের স্টেট হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দাও। সেখানকার ২০০ পেশেন্টের মধ্যে পেলাগ্রা দেখা দিয়েছে।

ডাঃ ব্লু। সার্জন জেনারেল। ইউ. এস. এ.।

রাত দুটোর সময় অকস্মাৎ হোটেলের ঘরের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে একটা পাথরের ঢিল এসে ঢুকলো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। বিছানা ভর্তি হয়ে গেল কাঁচের টুকরোয়। ডাক্তার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো খাটে এবং পরে বিপদাশঙ্কায় মেঝেতে শুয়ে পড়লো। কয়েক মিনিট বাদে সতর্কভাবে মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকালো। না, রাস্তায় কোন জনমনিষ্যি দেখা গেল না। পরে মেঝে থেকে ঢিলটা তুলে নিয়ে দেখলো তাতে একটুকরো কাগজ সূতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে ডাক্তার কাগজে লেখা নোটটা পড়ে গেল। রাগে সমস্ত শরীর আগুন হয়ে গেল তার।

—ফুলস! তিক্তস্বরে স্বগতোক্তি করলো ডাক্তার, দ্য স্টুপিড, ভিসিয়াস্...... ক্লাক্স ক্ল্যান...... জর্জিয়ায় থাকলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে!

"Get-back up north wh re you belong if you want to stay alive" লেখা ছিল নোটটিতে।

—ওয়াশিংটনেই আমার ফিরে যাওয়া উচিত। এ অঞ্চলের মানুষ সাহায্যের উপযুক্ত নয়। These people don't deserve to be helped.

ডাক্তারের মনে পড়লো কাটবার্ট নামক গ্রামে একটি পরিবারকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার ঘটনা, যা সে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিল। বালিশের খোলের মত মুখোশধারী, জনা তিরিশেক বয়স্ক মানুষ অদ্ভুত ইউনিফর্ম পরা, ঘোড়ায় চড়ে

রণহুঙ্কার দিতে দিতে জনৈক ভাগচাষীর কুটির আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করে। ভাগচাষী নাকি পরস্ত্রী গমনের অপরাধে অপরাধী……

ডাক্তার স্থানীয় হেলথ অফিসার ডাঃ পার্সি টলিভারকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ কি অমানুষিক ব্যাপার! আইন এসব মুখোশধারী হিংস্র লোকগুলোকে সায়েস্তা করে না কেন?

ডাঃ টলিভারের জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত, "ডাঃ বার্জার আপনি জানেন না…… এ অঞ্চলে 'ক্ল্যান'ই হল আইন। The Klan is the land in these parts.

ডাক্তারের মন কঠোর হয়ে উঠলো সহসা। ভয় দেখানো নোটটাকে মুঠোয় মুচড়ে পকেটে রেখে মনস্থির করে ফেললো। না, অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার কিছুতেই নয়। আমি থাকবই এখানে। কে. কে. কে.-র নিকুচি করেছে। কালই আমি মিলেডগেভাইল রওনা হব।

কতগুলো অতি পুরণো ও জীর্ণ বাড়ি নিয়ে এই এসাইলম। ঢুকতেই কানে এল আর্তনাদ, কর্কশ চিৎকার, বিদঘুটে অট্টহাসি, এবং পেশেন্টদের হৃদয়-বিদারী কান্না-কাটি বন্ধ জানালার ফাঁকে প্রেতের মত কংকালসার ও কদর্য আকৃতির স্ত্রী-পুরুষ-শিশু তাকিয়েছিল ডাক্তারের পানে। শেষ অবস্থার পেলাগ্রা রোগের হতভাগ্য বলি এরা।

অ্যাসাইলমে যে নিয়ে এসেছে সেই জন সিমস বললে, চলুন ডাক্তার আপনাকে এবার দেখাই আমাদের লোকদের। তাদের পানে চাওয়া যায় না। তবু আশা করব এদের দেখে ভবিষ্যতে আপনি এমন কিছু করতে পারবেন যাতে আর কোন মানুষ এ রোগে ভুগে এ ভাবে অকালে ভয়ংকর ভাবে প্রাণে মারা পড়বে না?

ভায়োলেন্ট উদ্দাম হওয়ায় একটা খাঁচার মত অন্ধকার ঘরে জন সিমসের ২৪ বছরের ভাইকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মেঝেতে সে মড়ার মত পড়েছিল। গার্ড বললে সে নাকি কোন খাবার-দাবারই খাচ্ছে না।

—দেখি কি খাদ্য দেওয়া হয় এদের?

ডাঃ গোল্ড বার্জার ব্যথিত চিত্তে পাশে রাখা খাবারের প্লেটটা দেখলো। চর্বিমাখা একখণ্ড কর্ণ ব্রেড, গ্রিটস্, সামান্য সিরাপ আর ফ্রায়েড মাশ। একই খাদ্য যা ডাক্তার দেখে এসেছে মিসিসিপিতে ক্লাইভ উইলসনের পরিবারে।

অকস্মাৎ সিমসের ভাই ভয়াল চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠে প্রলাপ বকতে শুরু করলো: আমি জেগোভা, স্বয়ং ঈশ্বর …আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, ডাক্তার! তুমি একজন নিদারুণ পাপী। শোন স্বর্গীয় সঙ্গীত। কি সুমধুর কণ্ঠ। ওরা আমাকে আদেশ করছে, তোমাকে হত্যা করবার জন্য …. হাঃ হাঃ হাঃ……

অকস্মাৎ সেই উন্মাদ যুবক একলাফে এসে ডাক্তারের গলা টিপে ধরলো বজ্র-শক্তিতে। আচমকা আক্রমণে ও তীব্রতায় চোখে সর্ষে ফুল ও দম বন্ধ হয়ে মরবার

উপক্রম হল তাঁর। হাত-পা অবশ, মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে...... প্রায় মরেই যেত যদি না সহসা সে উন্মাদ পেশেন্টের মাথায় একটি জুডোর প্যাঁচের আঘাত হানতো, সে আঘাতে উন্মাদ ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

দেহে মনে বিহ্বল ডাক্তার এবার গেল এসাইলামের ডাইনিং রুমে। সেই একই নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে ডিস-এ ডিস-এ। বিস্কুট, মাশ, গ্রিটস, সিরাপ, ভাত, আর মিস্টি আলু।

—এখানে কজন ডাক্তার, নার্স, ও অ্যাটেণ্ডান্ট আছে? ডাক্তার প্রশ্নকরে সুপারিনটেণ্ডেন্টকে।

—গত মাসে পে-রোল-এ ছিল ৬০ থেকে ৭০ জন। একথা জিগ্যেস করছেন কেন?

—এদের কারুর পেলাগ্রা সংক্রমণ হয়েছে কি?

—না, এদের ও রোগ হয়নি। ভাবলে অদ্ভুত লাগে ঠিকই। এক হয় আমরা লাকি, নয়ত এদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে থাকার জন্য আমাদের দেহে, ইমিউনিটি গড়ে উঠেছে।

ডাঃ বার্জার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সুপারইনটেণ্ডেন্ট-এর খাদ্যভরা প্লেটের দিকে। গ্রিটস ও মাশ আছে ঠিকই, তবে উপরন্ত সেখানে আছে দুটুকরো বীফ, এবং একগ্লাস দুধ।

ডাক্তার বেরিয়ে এলো বাইরে। মনে মনে চিন্তা প্রবাহ। রোগী ও ডাক্তারদের খাদ্য সম্পূর্ণ আলাদা। দু'জন নার্সকে ডিম সেদ্ধ খেতেও দেখেছে সে।

কিন্তু পেশেন্টদের খাদ্য তালিকায় ডিম নেই, মাংস নেই, দুধও নেই।

—পেশেন্টদের কেন ডিম দুধ মাংস দেওয়া হয় না? এতে তো একঘেয়েমি থেকে মুখ পাল্টানোও হয়!

সুপার জবাব দেয়, ঐ খাবার খেতেই ওরা ভালবাসে। সারা জীবন ঐ খাবার খেয়ে ওরা অভ্যস্ত। তা ছাড়া আমাদের সরকারী বাজেট এতই সীমিত যে ষ্টাফ ছাড়া দুধ ডিম ইত্যাদি পেশেন্টদের জন্য বরাদ্দ করা সম্ভব নয়।

ডাঃ গোল্ড বার্জারের মনে একটি সিদ্ধান্তের কথা পাক খেতে শুরু করলো। এতাবৎ মেডিকাল থিয়োরী সমূহ সবই মনে হয় অলীক। এটা সংক্রামক ব্যাধি আদৌ নয়, যেমন বহু ডাক্তার ইতিপূর্বে ভেবে এসেছে। দূষিত নদীর জলকেও দোষারোপ করা হয়েছে এ ব্যাপারে। স্যাণ্ড-ফ্লাই, মশা, দূষিত শস্য ইত্যাদিকেও এর উৎস হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছে। সবই অনুমান। অন্ধকারে হাতড়ানো।

কিন্তু এর উৎস নিহিত রয়েছে বাজে খাদ্যের মধ্যে অর্থাৎ প্রোটিনহীনতাই এ রোগের কারণ যদি ভাবি তাহলে হবে কি? এতদঞ্চলের নিম্নমানের একঘেয়ে খাদ্যাভ্যাসই কি এইসব দরিদ্র-জনসাধারণকে পেলাগ্রা কবলিত করেনি? আমার মনে হয় নিশ্চয়ই করেছে। নয়তো দুধ ডিম মাংস খাওয়া ডাক্তার নার্সরা এ রোগ

থেকে নিষ্কৃতি পেল কি করে।

ডাক্তার গেল একাধিক অনাথ আশ্রমে, ওল্ড-পিপল্স হোমে, জেল-এ এবং অপরাপর পাগলা গারদে।

আলাপআচারিতে নিম্নোক্ত সংলাপই শুনতে হল সব স্থানে :

—ডাক্তার…রাত্রিবেলা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন এসে হানা দেয়…দেখছ তো হাড় সর্বস্ব হয়ে গেছি…পোষাক ঝুলে পড়েছে·· প্লিজ হেলপ মি·· মাঝে মাঝে মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব।

—ডাক্তার আমার স্ত্রীকে তোমায় ভাল করে দিতেই হবে। সব সময় সে অর্থহীন প্রলাপ বকে যাচ্ছে…দেখো কি রকম স্তুপের মত বিছানায় পড়ে রয়েছে ও… একবছর ধরে শয্যাগত, জিভটা ওর রক্তলাল হয়ে উঠেছে, ঘায়ে ভর্তি হয়ে গেছে তা… ওর ওজন ৫০ পাউণ্ড কমে গেছে…

শিশুরা অকথ্য পেটের যন্ত্রণায় কাতর, চোখ বসে গেছে কাঁদবারও বুঝি শক্তি নেই। তপ্ত লাভার মত অসহনীয় বেদনা কামড়ে খাচ্ছে কোমর ও নাভিপ্রদেশ। নিরবচ্ছিন্ন ডাইয়ারিয়া… ছোট বড় সবারই পেচ্ছাপ পায়খানা ধারণ করবার ক্ষমতা নেই। চামড়া সর্বক্ষেত্রেই পুরু হয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে স্থানে স্থানে, হলদে মুখে চোখ দুটি কোটরগত…জীবনীশক্তি পলে পলে ক্ষয়ে যাচ্ছে…।

মিসিসিপিতে ফিরে এসে ডাক্তার গোল্ড বার্জার উক্তরাজ্যের গভর্নরের কাছে এক জরুরী চিঠি দিল।

তাতে সে বিশদভাবে জানালো এটা তার দৃঢ় অভিমত যে পেলাগ্রা রোগের কারণ উপযুক্ত সুসম খাদ্যের অভাব। এর প্রতিকার করা সম্ভব প্রোটিন খাদ্য অর্থাৎ মাংস দুধ ডিম খাদ্য তালিকায় যুক্ত করে। যে খাদ্য এইসব দুঃস্থ মানুষেরা কোন কালেই খেত না। গভর্নর, ডাক্তারেরা আমাকে এ ব্যাপারে বিদ্রূপ ও পরিহাসে জর্জর করছে। তাদের মতে পেলাগ্রা সংক্রামক ব্যাধি। নোংরা আবর্জনা, বা পোকা প্রাণীরাই এই ব্যাক্টেরিয়া সক্রমণ করে উক্ত রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি তাদের প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়ে দেব যে, তাদের ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। দেখিয়ে দেব যে, সুসম প্রোটিন খাদ্যের মধ্যেই রয়েছে এই কদর্যরোগের প্রতিষেধক। এ ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি, গভর্নর।

ডেকে পাঠালো ওকে গভর্নর। বেশ আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনি কি চান বলুন ডাক্তার গোল্ড বার্জার ?

—আপনার র‍্যাঙ্কিন প্রিজন ফার্ম (জেল) থেকে কিছু-সংখ্যক ভলান্টিয়ার কয়েদী আমি ধার চাই। ওখানে এখন পর্যন্ত পেলাগ্রা রোগ প্রবেশ করেনি। আমার মতে তার কারণ হল জেলের খাদ্য তালিকায় যথেষ্ট প্রোটিন ফুড রয়েছে। তাই পেলাগ্রা-রোগ উৎপন্ন করবার পক্ষে উক্ত জেলের কয়েদীরাই আদর্শ মানুষ। এর দ্বারাই আমি প্রমাণ করব যে, প্রোটিনের অভাবেই এরোগের সৃষ্টি হয় শুনে শক্ড হয়ে গেল

গভর্নর। বললে, বলছেন কি, পেলাগ্রার-রোগাক্রমণের জন্য আমাদের কয়েদীদের দিতে হবে। কিন্তু তারা যদি শেষ পর্যন্ত নিরাময় না হয়? ব্লু ক্লাক্স ক্লানরা তাহলে তোমাকে লিঞ্চ (জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা) করবে, এবং আমাকেও। এটা সাংঘাতিক রিস্কি, দারুণ ঝুঁকির কাজ।

—আমি কথা দিচ্ছি কয়েদীরা নিশ্চিত সেরে উঠবে, স্যার, ডাং বার্জার সুদৃঢ় আস্থার স্বরে বলে ওঠে, আমি ওদের সঙ্গে একই খাবার খাব, কর্ণমিল, ময়দা, গ্রিটস্, কর্ণ ব্রেড, আখের সিরাপ, যা ওরা জেলে ঢোকবার পূর্বে চিরকাল খেয়ে এসেছে। ওদের যদি পেলাগ্রা হয়, আমার নিজেরও তা হবে।

জেলের মেস হলে ২০০ জন সমবেত কয়েদীকে উদ্দেশ্য করে ডাঃ গোল্ড বার্জার তার একসপেরিমেন্টের প্রাথমিক কথার পর বলে—সেই কারণে আমি আপনাদের মধ্য থেকে কজন ভলান্টিয়ার চাই। আমি অবশ্য জোর করে বলতে পারি না যে, এ ব্যাপারে কোন বিপদাশঙ্কা নেই। তবে বিশ্বাস করুন পেলাগ্রা হলে আমি অবশ্যই সারিয়ে তুলতে সক্ষম। এবং তা খুব দ্রুতই হবে আমি আপনাদের সঙ্গে থেকে একই খাদ্যদ্রব্য খেয়ে যাব রোগ ধরবার জন্য কোন কিছু জিগ্যেস করবার আছে আপনাদের?

একজন জালিয়াত কয়েদী চিৎকার করে বলে ওঠে, এ কাজের জন্যে তুমি কি পুরস্কার পাবে বাবা! একটা মেডেল? সমবেত কয়েদীরা অনেকেই মজা পেয়ে হেসে উঠলো। নানাধরনের জীবজন্তুর ডাক, কর্ণভেদী শীস্।

—আমাদের এই ছয়মাসের একসপেরিমেন্ট শেষ হলেই তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে, খালাস পেয়ে যাবে জেল থেকে। যেসব কয়েদী ভলান্টিয়ার হিসেবে আমার কাজে যোগ দেবে, গভর্নর তাদের পুরোপুরি ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নিস্তব্ধতা। পুনরায় অট্টহাসি ধ্বনী। অতঃপর মাঝ বয়সী একটি লোক যে স্ত্রীকে মারাত্মক প্রহারের দায়ে দণ্ডিত হয়েছিল, সে আমতা আমতা করে বলে উঠলো, আমি ভলান্টিয়ার করতে রাজি ডাক্তার।

টিম মিচেল নামক একজন চোর সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, আমিও আছি দলে। আমি আরও পাঁচ বছর ধরে পাথর ভাঙ্গতে চাই না

১২ জন ভলান্টিয়ার কয়েদি নিয়ে শুরু হল ছয় মাসের বিচিত্র ও আজব রিসার্চ জেলের মধ্যে প্রহরাধীন একটি ছোট বাড়িতে উঠে গেল ওরা। যেখানে নেই কোন পোকামাকড়, উকুন বা ছারপোকার উৎপাত। ডাঃ বার্জারের পরিচালনাধীনে নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকায় আহার চলতে লাগলো। খাদ্য তালিকায় রইল শুধুমাত্র বাঁধাকপি, আখের রস, কর্ণ ব্রেড, গ্রিটস্, মাশ।

সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে টিম মিচেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্লে, ডাক্তার, আই ফিল টেরিবল্। ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছি, সারা শরীরে বিশ্রি অস্বস্তিভাব, দেখুন শরীর

কেমন কাঁপছে, ঘুমতে পাচ্ছি না এক ফোঁটাও। শরীরের মাংসপেশীগুলো যেন বিষজর্জর।

পরীক্ষা করে ডাক্তার পেল কয়েদীটির দেহে পেলাগ্রা রোগের প্রাথমিক উপসর্গ। তিনদিন বাদে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত স্যাম হুইপ্‌ল নামক অপর কয়েদীকে দেখা গেল মেঝেতে জড়সড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। তার জিভে ঘা দেখা দিয়েছে, আর হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত লাল। পেটটা যেন প্রবলভাবে খিমচে ধরেছে।

অপরাপর কয়েদীরাও ক্রমশ ক্ষীণ, দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে উঠছে। ডাঃ বার্জারের নিজের জিভেতেও ঘায়ের লক্ষণ অনুভব করলো, ঠোঁটের কোণে বেদনাদায়ক ফাটা ঘা,···সে নিজেও পেলাগ্রা সংক্রামণিত হয়ে গেছে।

আরও কর্ণ ব্রেড। আরও গ্রিটস মাশ সিরাপ, ক্যাবেজেস্‌ ও তিক্ত কফি। মাসের পর মাস কেটে গেল। সাতজন কয়েদী সাংঘাতিকভাবে ভুগছে। ডাক্তারের নিজের অবস্থাও গুরুতর এবং করুণ, অনেকেরই দেহের বিভিন্ন অংশে চুলকুনি ও ঘা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারেরও। রক্তবর্ণ ছোপ ছাপ দাগ গোপনাঙ্গে।

কাঁটা তারের ওপারে ডাক্তার সবসময়ে লক্ষ্য করলো জেলের অপরাপর কয়েদী-দের। তারা শ্রান্ত ক্লান্ত হলেও তাদের একজনকেও পেলাগ্রা স্পর্শ করতে পারেনি, তারা নিয়মিত খেয়ে যাচ্ছে টাটকা মাংস, টাটকা দুধ, যদিও স্বল্প পরিমাণে তবু ওরই ফলে পেলাগ্রা থেকে তারা মুক্ত হয়ে আছে।

আরও কমাস কাটলো। গোপনে এক গ্লাস করে দৈনিক দুধ খেলে ডাক্তারের বেদনাদায়ক রোগের নিশ্চয়ই কিছুটা উপশম হত। সারা দেহমন একটি ডিম, এক-টুকরো মাংসের জন্য আকুলি বিকুলি করছে। তবু—না। সে বঞ্চনা করতে পারবে না সঙ্গী রোগাক্রান্ত কয়েদীদের, তার গবেষণার সঙ্গীদের।

এক্সপেরিমেণ্টকে আরও ছয় সপ্তাহ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে নিজেও এ রিসার্চে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। যত প্রলোভনই আসুক এ দুরূহ পণ চালিয়ে যেতে হবেই।

ডাঃ গোল্ড বার্জারের মাথা নিদারুণভাবে দপ দপ যন্ত্রণায় কাতর। তিরিশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে তার। একজন কয়েদীর মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে··কারুর চোখ অস্বাভাবিক রকম গর্তে ঢুকে গেছে···কেউ দেহের চুমটিপরা ঘা বীভৎসভাবে চুলকে চলেছে। প্রত্যেকেরই চামড়ার আকৃতি ভীতি-প্রদ।

এখুনি রিসার্চ খতম করে দিই···কারুর মৃত্যুর পূর্বেই এটা করা বিশেষ প্রয়োজন ···এক সময় এ সংকল্প এল ডাক্তারের মনে · তারও মাথাঠিক থাকছে না·· কেমন দুঃস্বপ্ন···কেমন এলোমেলো চিন্তা · দৃষ্টিশক্তিতে ভাঙন ধরেছে। একদা তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন বহুকাল পূর্বে মৃত সব বন্ধুবান্ধবদের কথাবার্তা·· বুঝলেন তারাও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে চলেছে ··কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টের আর নয় দিন মাত্র বাকি···

পুরো ছয় মাসের কড়ারে তিনি নেমেছেন।

প্রবল কষ্ট ও অনাহার সঙ্গে দাগ দিয়ে চলেছে ডাক্তার দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে···ছয় দিন বাকি···পাঁচ···

—ডাক্তার আমায় বাঁচান···আমার সারা শরীরে আগুন লেগেছে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আর পারছি না।

···চার দিন··

—ঐ দেখুন শয়তানের অজস্র দল সিলিং-এ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এক ইঞ্চি মাপের লক্ষ লক্ষ শয়তানের ছা ঐ যে।

···তিন দিন···দু দিন···

—ডাক্তার ভয়াবহ চেহারা হয়ে গেছে আপনার। এবারে ক্ষ্যামা দিন · নয়ত মরবেন···, জেল ওয়ার্ডেন বললে।

—না! ডাক্তারের কঠোর সংকল্প প্রকাশ পায় একটি শব্দে।

অবশেষে শেষ দিন এল। সুদীর্ঘ অসহনীয় ছয়মাস অতিক্রান্ত হল। হাড় সর্বস্ব কংকালাকৃতির ডাক্তার অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো। এবারে আমাদের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম নিয়ে আসুন। আমায় ও আমার মহান সঙ্গীদের খেতে দিন।

প্রোটিন ভরা উচ্চাঙ্গের খাদ্যসহ ট্রেসমূহ চলে এল ঝটিতি। ওরা সবই গোগ্রাসে সেসর খাবার খেতে লাগলো। মুহূর্তে দুধ মাংস ডিমের ট্রের পর ট্রে শেষ হয়ে গেল।

সাতদিনের মধ্যেই ডাক্তার বুঝে গেলেন মিরাকল ঘটতে শুরু করেছে। সাতজন পেলাগ্রাক্রান্ত কয়েদী ক্রমে ক্রমে পূর্বেকার শক্তি সামর্থে ফিরে আসছে। ওজন বাড়ছে। গায়ের ঘা চুলকানি ও চামড়ার কঠোরত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এক সময় তা মিলিয়েও গেল। মন ফের সুস্থ, চিন্তাশক্তি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রতিদিন একটি করে ডিম, এক টুকরো বীফ, এক গ্লাস দুধ ···· ব্যস এই প্রোটিন খাদ্যই পেলাগ্রারূপী শয়তানকে চাবকে বিতাড়িত করেছে।

এই মহান চিকিৎসক অসামান্য কৃতিত্ব ও জয়ের গর্বে যারপরনাই উৎফুল্লিত হয়ে গেল। শিক্ষিত বিদগ্ধ জনসমাজ ধন্য ধন্য করতে লাগলো। ইয়োরোপ আমেরিকার নানা স্থান থেকে কনগ্রাচুলেসন জানিয়ে তারবার্তা আসতে লাগলো ডাঃ গোল্ড বার্জারের কাছে।

কিন্তু মজা এই দক্ষিণাঞ্চলের বহু লোক ডাক্তারের কার্যাবলীতে সন্দেহ প্রকাশ করে গেল। তারা কিছুতেই তাকে তার আবিষ্কারের স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাদের এখনো ধারণা যে, এ রোগ অবশ্যই মাইক্রোবের দ্বারা হয়। এ যেন 'যাদের জন্য করি চুরি তারাই বলে চোর' গোছের বৃত্তান্ত। এমন কি কাগজে কাগজেও বিরুদ্ধ সমালোচনা বেরুতে লাগলো।

ডাঃ বার্জার বললে, শুনুন, সাভানার ডাঃ ফ্রান্সিস ৭৪টি বাঁদরের উপর প্রয়োগ

করেছেন ইনজেকসন মারফৎ পেলাগ্রা রুগীদের রক্ত কিন্তু একটি বার বাঁদর ও উক্ত রোগাক্রান্ত হয়নি। আমি বলছি মাইক্রোভ-ফাইক্রোভ কিছু নয় এটা স্রেফ প্রোটিনহীন খাদ্যের জন্যেই হয়ে থাকে।

—মানুষরা মশাই বাঁদর নয়। হয়তো কোন কারণে বাঁদররা সংক্রামিত হয়নি। আমরা ডাক্তাররা জোরের সঙ্গেই বলছি এ রোগ মাইক্রোবের দ্বারাই হয়ে থাকে।

এর মধ্যে ফের ব্লু ক্লাক্স ক্লানের এক সাবধানবাণীও পেল ডাক্তার প্রাণসংশয়ের ভয় দেখিয়ে। ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দিল সে নোট। 'এ এক ভয় দেখানো খেলা পেয়েছে মূর্খরা!' ডাক্তার সরোষে বলে ওঠে।

ডাক্তার এবার কুকুর নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। তাদেরও দিল সেই প্রোটিনহীন খাদ্য। কুকুরদের দেহে ও চামড়ায় দেখা দিল অবধারিত পেলাগ্রা রোগ তাদের জিভ হয়ে উঠলো কালো ও ক্ষতে ভরা।

—দেখুন মানুষের মতই কুকুরদের দেহে উক্ত বাজে খাদ্য দিয়ে রোগাক্রমণ হয়েছে। কিন্তু যখনই আমি ওদের মাংস খেতে দিলাম ফের ওরা সুস্থ হয়ে উঠলো। বিশ্বাস করুন, এ রোগ হয় স্রেফ প্রোটিন বিহীন বাজে খাদ্য গ্রহণের ফলে।

—তুমি ভ্রান্ত। এ রোগের কারণ হল ব্যাকটেরিয়া, দক্ষিণাঞ্চলের একগুঁয়ে ডাক্তাররা তাদের সংকল্পে অটল রইল।

দু'বছর পার হয়ে গেল। এবার ডাঃ গোল্ড বার্জার দক্ষিণাঞ্চলের চিকিৎসকদের প্রতি ক্রোধবশে এক নতুন ও ভয়াল এক্সপেরিমেন্টের কথা ঘোষণা করলো।

—শুনুন ডাক্তার মহোদয়গণ, আমি, আমার স্ত্রী এবং আরও চৌদ্দজন ভলান্টিয়ার নিজেদের দেহে পেলাগ্রা রোগীর রক্ত ও মলমূত্র ইজেকসন করবো। যদি মাইক্রোব থিয়োরী সত্য হয় তো আমাদের কেউ না কেউ উক্ত রোগাক্রান্ত হবই।

ওর বন্ধুরা পর্যন্ত বললো, একি পাগলামী করছ বার্জার। এটা বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে নাকি? খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা? বেশ! করলে। কিন্তু পেলাগ্রা রোগীর রক্ত ইত্যাদি নিজেদের দেহে প্রবেশ করানো, এটা কিন্তু খুবই ভয়াবহ, জীবন সংশয়ও হতে পারে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের বর্ষণমুখর এক দিন, স্পার্টান বুর্গ স্টেট হাসপাতালের ৫০ বছর বয়স্ক এক গুরুতর অবস্থার পেলাগ্রা রোগীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল ডাক্তার।

—এখনো ভেবে দেখুন, এ ভয়ংকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত হবে কিনা, ডাক্তারের জনৈক সহকারী সভয়ে প্রশ্ন করে।

ডাক্তার ফ্যাকাশে চেহারার স্ত্রী মেরীর পানে তাকালো। স্ত্রীকেও দেওয়া হবে একই ইনজেকসন। পরমুহূর্তে অকম্পিত কণ্ঠে বললে, আমায় উক্ত রোগীর

রক্তে তৈরী ইনজেকসন দিয়ে দিন। উপস্থিত রিপোর্টার এবং জনতার ভীতিপ্রদ দৃষ্টির সামনে হুইলার নামক অ্যাসিসস্টেন্টটি সিক্স কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমাণ রুগ্ন ব্যক্তির রক্ত ডাক্তারের কাঁধের পেশীতে ঢুকিয়ে দিল।

—এবারে রোগীর নাকের সিগ্নি ও গলার থু থু আমার সিগ্নি ও থুথুর সঙ্গে মিশিয়ে দিন। পাঁচ দিন ধরে সবাই অপেক্ষা করলো এই মানুষরূপী গিনি-পিকদের। না, পেলাগ্রার কোন চিহ্নমাত্র তাদের দেহে প্রকটিত হল না। বিন্দুমাত্র উপসর্গও দেখা দিল না।

এরপর ডাক্তার আরও যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন নিজেকে নিয়ে, তার বিশদ বিবরণ পড়লে আঁৎকে উঠতে হয়। তবে সব ব্যাপারেই তিনি বিজয়ী হলেন, সাফল্যলাভ করলেন। তার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। শুধু নিজে নয় স্ত্রীকেও এই অবিশ্বাস্য এক্সপেরিমেন্টের সামিল করে ছাড়লো। পেলাগ্রা রোগীর মলমূত্র পর্যন্ত এরা গলধঃকরণ করলেন এক সময়।

এরপর কয়েকমাস কাটা সত্ত্বেও কিন্তু তারা সুস্থই রইলো। পেলাগ্রা ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারলো না।

নিন্দুক ও বিরুদ্ধবাদীরাও হতবাক হয়ে গেল। ডাঃ গোল্ড বার্জার এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, পেলাগ্রা রোগ হয় একমাত্র প্রোটিন খাদ্যের অভাবে, আর কোন কারণেই নয়। এ রোগের প্রতিষেধক হল দুধ, মাংস ও ডিম খাওয়া।

অবশেষে নিন্দুকের জিহ্বা প্রশংসায় পরিবর্তিত হতে বাধ্য হল। এই বিজ্ঞানীকে তার আবিষ্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতেই হল একদা বিরোধী পক্ষকে। কু ক্লাক্স ক্লানের জীবন সংশয়ী ভীতিপ্রদ সাবধান বাণী এক সময় সহসা থেমে গেল। সকলের বন্ধু হয়ে গেল ডাঃ গোল্ড বার্জার। শত্রুরা ম্যাজিকের মত মিত্রতে রূপান্তরীত হয়ে গেল। ত্রাতারূপে পরিগণিত হল ডাক্তার।

এতদসত্ত্বেও ডাক্তার কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। না—পেলাগ্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। উচ্চমানের প্রোটিন খাদ্যের কথা বলা এক কথা আর সেই প্রোটিন খাদ্য উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করা অন্যকথা। যে-সব দরিদ্র লোকের কাছে একটি ডিম বা একটুকরো মাংস লাক্সারী স্বরূপ, কি ভাবে তাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় উক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়, সে কথা ভাবতে গিয়ে ডাক্তারের রাতের ঘুম চলে গেল।

বছরের পর বছর কেটে গেল। ডাঃ গোল্ড বার্জারের অধীনে চিকিৎসিত হতে এল ৫000 জীবন্ত মমী স্বরূপ পেলাগ্রা রোগী, তার মধ্যে নর-নারী শিশু সবই রয়েছে। মৃত্যু যাদের ছিল অবধারিত। ঐ যাদুখাদ্য প্রোটিন যখনই তাদের দেওয়া হল, প্রত্যেকেই তারা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

ডাক্তার গরীব রোগীদের পরিচর্যায় ও নিরাময়ের ব্যাপারে দৈনিক ষোল ঘণ্টা করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলেন।

এর বিষময় ফল দেখা দিল অচিরে। ডাক্তার তার পশ্চাৎদেশে ও কিডনীতে অদ্ভুত বেদনা অনুভব করতে লাগলো। তার কণ্ঠ দুর্বল হয়ে গেল। ফিস ফিসানীর উপরে তার কণ্ঠস্বর চড়লো না।

ওয়াশিংটনের নেভাল হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছে সে একটি ভয়াবহ সংবাদ দিল। সে একটি বিরল ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তীব্র রক্তাল্পতা রোগ তাকে তার পেলাগ্রা গবেষণা থেকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে রাখছে।

ডাক্তারদের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে ডাক্তার তার কাজ চালিয়ে যেতে মনস্থ করলো। কিন্তু তখন তার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে এসেছে।

১৯২৯-এর ১৭ই জানুয়ারী জর্জিয়ার এক ডাক্তারের, যে একদা তার পরম শত্রু ও বিরোধী ছিল তার একটি চিঠি এল তার হাতে :

—আপনাকে সানন্দে জানাচ্ছি যে, দক্ষিণাঞ্চল থেকে পেলাগ্রা রোগ ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা হাই প্রোটিন খাদ্য দিচ্ছি সরকারী অনুদান সাহায্যে, যাবতীয় দরিদ্র জনসাধারণকে। খুনী রোগ এখন পোষ মেনে গেছে। ডাঃ গোল্ড বার্জার, আপনার ধৈর্য শৌর্য ও অদম্য এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুরনো এক শত্রুর কাছ থেকে এ ধরনের প্রশংসাসূচক একটি চিঠি পাওয়াকে পরম সাফল্যতার নিদর্শনরূপেই ভাবলেন ডাঃ গোল্ড বার্জার। তিনি ফিস ফিসে কর্কশ কণ্ঠে এর জবাব বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার ক্যান্সার, যার কোন চিকিৎসা ছিল না, তা তাকে স্তব্ধ করে দিল কিছু উচ্চারণ করা থেকে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে এই নিরলস পরহিতব্রতী বিজ্ঞানী চিকিৎসক গিয়ে মিশলো সেইসব পেলাগ্রা রোগীদের সঙ্গে যারা বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল আর অদ্যাপি যে রোগ দক্ষিণাঞ্চলে আর কখনো দেখা দেয়নি বা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি এই মহান বিজ্ঞানী ডাক্তারের অবিশ্বাস্য রিসার্চের ফলে।

॥ প্লেগ-ডিটেকটিভ ॥

মার্কীন দেশের অ্যাটলান্টা নগরীর একটি নগণ্য চেহারার অট্টালিকায় অবস্থিত রয়েছে ইউ এস পাব্লিক হেলথ সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার নাম হল কমিউনিকেবল ডিজিজ সেন্টার। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মিরা দিবারাত্র প্রস্তুত থাকে তাদের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনে। এদের সংক্ষিপ্ত নাম সিডিসি।

এদের কাজটি কি? কাজ হল, যদি সংবাদ আসে মার্কীন দেশের যে কোন শহরে নগরে বন্দরে এক বিহ্বলকারী রোগ দেখা দিয়েছে, এমন কি সে রোগে আক্রান্ত যদি ৪।৫ জন মানুষও হয়, অমনি এই সিডিসি ডিটেকটিভরা দুরন্ত গতি সরকারী কোন বিমানে চড়ে রওনা হয়ে যাবে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে। বোমা নয়, সঙ্গে নেবে সিরাম, বহমান লেবরেটরী সরঞ্জাম, ও অপরাপর ক্লিনিকাল অস্ত্রাদি উক্ত বিচিত্র রোগের উৎস সন্ধানে।

প্রচুর মার্কীনবাসীর সে সময় বিশ্বাস ছিল যে, যেহেতু বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাদের হাতের কাছে রয়েছে মিরাকল সব ড্রাগ, নব নব ভ্যাকসিন সিরাম অতএব প্লেগ বা মহামারী শব্দটি এখন অচল, ওটা স্রেফ মধ্য যুগের একটা কথা মাত্র। অথচ তারা জানতো না যে, দ্রুতগামী প্লেন-এ যাতায়াতের মারফৎ মারাত্মক খুনী সব মাইক্রোবেরা দুনিয়াভর বিস্তৃতি লাভ করছে কয়েক ঘণ্টার মাত্র ব্যবধানে। বোম্বের কলেরা ভয় দেখাতে পারে হাজার হাজার মাইল দূরত্বের অপর গোলার্ধের লজ এঞ্জেলসকেও। পীতজ্বর আর কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানের মারক রোগ নয়, যেমন নয় বিউবোনিক প্লেগও।

১৯৬০-এ, ইউ. এস. পাবলিক হেলথ সার্ভিসের হিসেবানুযায়ী, প্রায় দেড় লক্ষ আমেরিকান মারা পড়েছে 'ফ্লাস প্লেগ' বা আচমকা মহামারীতে, এর মধ্যে রয়েছে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, সিট্টাকোসিস (সাধারণের কাছে যা প্যারট ফিভার নামে পরিচিত) এবং ভয়াল এনকেফেলাইটিস রোগে (সাধারণ মশার কামড়ে ব্রেন-স্ফীতিকারক মারক ব্যাধি এটি)।

বন্যা, ঝঞ্ঝা ও অপরিচ্ছন্নতাজনিত সংক্রামক ব্যাধিসমূহ মার্কীন দেশে যায় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এটা হয়েছে দুরন্ত জেঠ গতির বিমান চলাচলের ফলে। কোন দেশই আর কোন রোগাক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পায় না, যত রকম সাবধানতাই তারা অবলম্বন করুক না কেন।

বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত যে বছরে অবশ্যই ৮ থেকে দশ লক্ষ আমেরিকা-

বাসীর অবধারিত মৃত্যু ঘটতো যদি না প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান সিডিসির পরহিত ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ডাক্তার ও টেকনিসিয়ানরা (যাদের বলা হয়ে থাকে প্লেগ ডিটেকটিভ) অনলস ও সতর্ক তৎপরতায় মহামারীকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিত।

এশিয়াটিক ফ্লু মহামারী যা হাজার হাজার মানুষদের বধ করেছিল, প্রথম দেখা দেয় দূর প্রাচ্যে। অতঃপর সেটা গিয়ে উপস্থিত হয় দক্ষিণ আমেরিকা, অবশেষে দেখা দেয় মার্কীন মুলুকে। বলা বাহুল্য এ সবই বাহিত হয়েছে প্লেন ও জাহাজের দ্বারা। অসুখটি আজও সব দেশেই বর্তমান, তবে এখন আর মহামারী আকারে নেই, রয়েছে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত অবস্থায়।

মার্কীন দেশের পশ্চিমাঞ্চলে একবার দেখা গেল এনকেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব সেখানে সেচের প্রয়োজনে যেসব ডোবা কাটা হয়েছিল অকস্মাৎ দেখা গেল এক বিশেষ ধরনের মশা পালে পালে এসে জুটেছে সেখানে। আর সেই মশা নিয়ে আসছে উক্ত ভয়াল এনকেফেলাইটি রোগ। এই কালান্তক মশারা কোত্থেকে এসেছে এবং লক্ষ লক্ষ এই মশারা কি ভাবে এনকেফেলাইটিসে সংক্রামিত হয়েছে ভেবে বিহ্বল হয়ে গেল সিডিসি প্লেগ ডিটেকটিভরা। তবে রোগটাকে নিয়ন্ত্রণে আনাই বড় কথা। তাই স্থির হল ঐ সব ডোবাগুলোতে সরকারী বিমান থেকে ডিডিটি বোমা মেরে মশামুক্ত করা হবে।

মনুষ্য সমাজে জানিত আরেকটি মারাত্মক ভয়ংকর রোগ হল বিউবেনিক প্লেগ। এ রোগটিরও অবাধ গতি।

সিডিসির জনৈক মহামারী বিশেষজ্ঞ একদা বলেছিল, মহামারী রোগের মধ্যে এই প্লেগ-রোগ হল অন্যতম নিকৃষ্ট ব্যাধি। ভারতবর্ষে টানা বিশবছর ধরে এই কালব্যাধি প্রায় এক কোটি মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করে ছেড়েছে। যে কালে এই রোগের উৎস বা উৎপত্তি কি ভাবে হয় তা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারে-নি, সে সময়ে রাশিয়া, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে ও চীন দেশে গড় পড়তা এক লক্ষ করে মানুষ মারা পড়েছে এই ভয়াল ব্যাধিতে।

এক সময় বলতে গেলে এই রোগ দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর এ শতাব্দীর শুরুতে অকস্মাৎ বিউবোনিক প্লেগ দেখা দেয় হংকং-এ! পরে দেখা গেল সানফ্রানসিস্কোতে এ রোগের জীবাণু (bacillus pestis) প্রবেশ লাভ করেছে। বিমান ও জাহাজ মারফৎ হংকং থেকে হনলুলু হয়ে বিউবোনিক প্লেগ-এর অনুপ্রবেশ ঘটলো মার্কীন দেশের উক্ত নগরীতে। কোয়ারেন্টাইন ও স্যানিটেসান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিডিসি ডিটেকটিভরা এ রোগকে ঠেকিয়ে রেখে মহামারী পর্যায়ে বাড়তে দেয়নি।

জনৈক প্লেগ ডিটেকটিভ একটি কেস-হিস্ট্রির কথা উল্লেখ করে বলে যায় নিম্নোক্ত ঘটনাটি।

কালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের লক উড ভ্যালির এক গভীর জঙ্গলে একদা

অ্যাড্রু সাকাকস্ নামক ৪২ বছর বয়স্ক দারুণ স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ গুলি-ভরা রাইফেল কাঁধে ছোট ছোট প্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়লো। এটা তার নিয়মিত অভ্যাস, শিকারের চেয়ে টার্গেট প্র্যাকটিসই তার কাম্য। বিশুদ্ধ কিছু খাদ্য, কম্পাস ও একটা ফ্ল্যাসলাইট সঙ্গে নিয়ে আর পাঁচজন শিকারীর মতই সে বনের গভীরে ঢুকে গেল। শিকার তার পেশা নয়, নেশা। চাকুরীর একঘেয়েমী কাটাতে এটা একটা রিক্রিয়েশন বিশেষ। এই সাকাকসই সেবার আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের, সর্বশ্রেষ্ঠ মাইক্রোব হান্টিং-এর নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ালো।

বনের কিনারায় একটা নির্জন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে পায়ে হেঁটে ঢুকে গেল নিবিড় বনের মধ্যে। সময় তখন সকাল আটটা। সারাদিন কাটিয়ে প্রায় সন্ধ্যের মুখে সে এসে দাঁড়ালো উন্মুক্ত একটা সমতল তৃণভূমিতে। শিকারের পক্ষে দিনটাকে তেমন সফল বলা যায় না। একটা বনবিড়াল, বেশ কিছু খরগোস এবং তিনটা শিয়াল সে মেরেছে এবং যথারীতি সেগুলোকে সযত্নে মাটি খুঁড়ে কবরও দিয়ে দিয়েছে।

অদূরেই গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। মনের দিক থেকে তুষ্ট হলেও শরীরটা তার যেন কেমন কেমন করছে। মাথাটা কখনো শুণ্য কখনো ঝিমঝিম ভাব। অনেকটা স্যাম্পেন পান করা মৃদু মাতাল মাতাল ভাব। না, কোন অসুখ নয়। সারাদিন রোদে রোদে ঘোরার দরুণই বোধহয় শরীরটা এ রকম করছে। আরেকটা বিচিত্র ব্যাপারও সে লক্ষ্য করেছে। সারাদিন এই তৃণভূমির ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরে তাকে আসতে হয়েছে বার পাঁচ ছয়। সে সময় নজরে এসেছে এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে বারো-চৌদ্দটা লোমশ কাঠবেড়ালীর মৃতদেহ। না, সেগুলির মৃত্যুগুলি খেয়ে হয়নি। এমনিই তারা মরে পড়ে রয়েছে। ঘন বনভূমি থেকে পালিয়ে এসে তারা উন্মুক্ত এই তৃণভূমির ওপর এসে মরে গেছে। কিন্তু এ মৃত্যুর কারণটা কি ?···

সাকাকস্ মৃত কাঠবেড়ালীগুলো স্বাভাবিক কারণেই স্পর্শ করেনি। কিন্তু তার শরীরের ঝিমঝিমানি ভাবটাই তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো। দুপায়ের গোড়ালীতেও কেমন সুলসুলে বেদনা। নিশ্চয়ই কোন পোকামাকড়ের কামড়ে এটা হয়েছে। কিন্তু একি! পায়ে লাল দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে কেন! এলার্জি বা আমবাতের মত, প্রত্যেকটার মাঝখানে ছোট্ট কালো চুমটি পড়া!

নিদারুণ ভয় পেয়ে এবার সাকাকস্ টলতে টলতে ছুটে গেল অদূরের নিরালা রাস্তায় পার্ক করা গাড়ির দিকে।

জোর করা মনোবল নিয়ে কোনক্রমে গাড়ি চালিয়ে বিপজ্জনক মেঠো রাস্তা ধরে নিকটবর্তী শহর ও তার বাসস্থান এল রিওর অভিমুখে রওনা দিল।

মধ্য রাত্রের কিছু আগেই শরীরে এল জ্বর ও কাঁপুনি, সঙ্গে পেট খারাপ ও

বমি। পরদিন সকালে পুনরায় গাড়ি নিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হল স্থানীয় ওস্টিও-প্যাথ ডাক্তারের কাছে। দ্রুত পরীক্ষায় রোগ স্থির হল ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাকাকস্ এ রোগটির খপ্পড়ে পড়ে। ওস্টিওপ্যাথ ওর ম্যলেরিয়ার ইতিহাস জানতো, তাই এটা ভাবাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে। অতঃপর ডাক্তার প্রায় প্রলাপবকা রোগীকে পেনিসিলিন, কুইনাইন ও ম্যলেরিয়া সিরাম ইনজেসন দিয়ে দিল। কিন্তু সাকাকস্-এর এসবে কোন উন্নতি তো হল না বরং অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল।

পরদিন একটি নেভি অ্যাম্বুলেন্স অচৈতন্য সাকাকস্কে নিয়ে ভীষণ সাইরেন হর্ন বাজিয়ে চলে গেল করোনা নেভাল হাসপাতালে। এমারজেন্সি বিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন প্লেগ-টাইপ- রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার লেঃ কমাণ্ডার এল এম ফক্স। প্যাথলজিকাল বা ল্যাবরেটারী টেস্ট রেজাল্ট পাবার পূর্বেই ডাঃ ফক্স ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েড রোগের কথা নাকচ করে দিলেন রবার গ্লাভস পরা হাতে ডাক্তার দেখলেন সাকাকস্-এর কুঁচকী ও পায়ের গোড়ালীর কাছে প্রচুর কালো কালো দাগ। দুস্থানই দারুণভাবে ফুলে গেছে এবং শক্ত হয়ে উঠেছে।

—গুড গড! ডাক্তার ফক্সের একজন সহকারী সভয়ে বলে ওঠে এটা যেন বিউবোনিক প্লেগ বলেই মনে হচ্ছে আমার।

—হ্যাঁ ইউ আর রাইট! এটা বিউবোনিক প্লেগই বটে, ডাঃ ফক্স সম্মতি জানিয়ে বলে ওঠেন। এই বলে তিনি নিকটবর্তী টেলিফোনের দিকে চলে যান। ডাক্তার স্থিরনিশ্চয় যে সাকাকস্ ব্ল্যাক ডেথ এ আক্রান্ত হয়েছে। বাঁচা মরার প্রশ্ন আধা-আধি। ডাক্তার এই ভেবেও নিদারুণ উদ্বিগ্ন হলেন মানুষের চরম শত্রু এই রোগ খুবই দ্রুত বিস্তারী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ছেয়ে যেতে পারে এ কালান্তক রোগে।

পাগলের মত ডাঃ ফক্স যখন স্থানীয় ও স্টেট হেলথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে কতগুলো সাংঘাতিক ঘটনা উদঘাটিত করে ফেললেন। সাকাকস্ শুধুমাত্র উক্ত ওস্টিওপ্যাথের কাছেই যায়নি, অর্ধপ্রলাপ ও অর্ধ চৈতন্যের অবস্থায় সে পথে আরো জনা ২৫ নরনারীর সান্নিধ্যে ক্ষণকালের জন্যও গিয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছে তাদের কোন না কোনভাবে স্পর্শ করেছে। ফলে ঐ ২৫ জন মানুষ রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওতায় এসে বিউবোনিক প্লেগ বীজাণুর দ্বারা হয়ত আক্রান্ত হয়েও গেছে। সর্বনাশ। ঐ পঁচিশ জন নরনারী হল, ওস্টিওপ্যাথ ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, হাসপাতালের ইন্টার্নেরা, নার্সেরা, নিরীহ রাস্তার লোক, সাকাকসের কিছু বন্ধু। এখন এদের প্রত্যেককে খুঁজে বার করবার জন্য লোক চলে গেল দিগবিদিকে। এক সময় এদের সবাইকে সালফা এবং অপরাপর অ্যান্টি-বায়োটিকস দেওয়া হল। কারুকে হাসপাতালে কারুকে তাদের বাড়িতে, বা

অফিসে বা ব্যবসাস্থলে গিয়ে। আরও নিশ্চিত নির্ভয় হবার জন্য এইসব ২৫ জনের কাছাকাছি কারা এসেছিল সে রকম প্রচুর নরনারী শিশুদের প্রতিষেধক ইনজেকসন দিয়ে দিল স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের একটি বড়দল।

১৯৫৮-র ৩রা জুলাই গভীর অচৈতন্য অবস্থায়ই সাকাকস্ মারা গেল। ১৯৩৮-এর পর কালিফোর্নিয়াতে সেই সর্বপ্রথম ব্যক্তি প্লেগরোগ আক্রান্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওয়েস্ট কোস্ট প্লেগ ডিটেকটিভেরা কাজে লেগে গেল। কোমায় আক্রান্ত হবার পূর্ব মুহূর্তে প্রলাপের মুখে সাকাকসের বলা কয়েকটি অসংলগ্ন কথা নিয়ে গভীরভাবে বিচার বিবেচনায় লিপ্ত হল।

কথাগুলো হল :

"No Trees…see the dead things…up the old road…"

(গাছ-পালা নেই · মৃত বস্তুগুলো দেখুন… পুরনো রাস্তা থেকে কিছু এগিয়ে)

ভেনচুরা কাউন্টি অফিসিয়াল বা স্টেট পুলিশের হাতে এর বেশি কোন সূত্র ছিল না। তাই এটা নিয়েই তারা অগ্রসর হবার চেষ্টা করলো। ভয়ংকর সংক্রামক এই ব্ল্যাক ডেথ। ঐ হতভাগ্য সাকাকসের দেহে সংক্রামিত হয়েছে এক হয় পোকামাকড়ের কামড়ে অথবা রোগাক্রান্ত মৃত ইঁদুরের চামড়ায় থাকা অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটের মাধ্যমে, যখনই কোন লোক এই খুনে বীজাণুদের দ্বারা সংক্রামিত হয় তখনই অসংখ্য বীজাণু গিয়ে ফুসফুসে জমা হয়ে অপরাপর মানুষকে সংক্রামিত করতে থাকে।

প্রায় নিদ্রাহীন অবস্থায় প্লেগ ডিটেকটিভরা তদন্ত কার্যে লেগে গেল। প্রচুর মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল মৃত সাকাকস্-এর দৈনন্দিন জীবন ও আচার-আচরণ এবং অভ্যাসাদি সম্পর্কে।

এই ব্লাক ডেথ রোগটি ক্ষণে আবির্ভূত ক্ষণে নির্বাপিত হয়ে যায় একথা তাদের জানা। বহুকাল পূর্বে নিউ অর্লিয়ন্স শিকাগো এবং দেশের অপরাপর অঞ্চলে উক্ত বিউবোনিক প্লেগের মহামারীর কথা তারা বিস্মৃত হয়নি।

বিদেশী বন্দর থেকে আগত জাহাজ মারফৎ ও দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে সংক্রামিত ইঁদুরের পাল। ছোট্ট এক ধরনের মাছি যারা এই রোগের জীবন্ত সংক্রামক হিসেবে কাজ করে। এরা রুগ্ন ইঁদুর থেকে ক্রমান্বয়ে রোগ সংক্রমণ করে যায়। ঘোড়া থেকে বণ্যজন্তু-ও তারপর সাধারণ মেঠো কাঠবেড়ালীকে। কাঠ-বেড়ালীর ক্ষেত্রে উক্ত মাছিদের কামড় হয় কদিনের মধ্যেই মারাত্মক মৃত্যু।

মৃত্যুর কদিন পূর্ব পর্যন্ত সাকাকস্-এর চলাচলের সংবাদ পরীক্ষা করে আবিষ্কার করে তার উক্ত জঙ্গলে গিয়ে শিকারের কাহিনী। নির্জন সেই বনভূমির সীমান্তের সেই নিরালা রাস্তায় প্লেগ ডিটেকটিভরা ওর গাড়ির চাকার দাগ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়।

অতঃপর সায়েন্স ফিকসনের চরিত্রদের মত তারা শরীরের আগাপাশতলা সুরক্ষিত পোষাক ও মুখোশ পরে নিয়ে ডিটেকটিভরা একপা দুপা করে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই উন্মুক্ত তৃণ প্রান্তরে যেখানে তখন ছাড়িয়ে রয়েছে দেখা গেল কত শত কাঠবেড়ালীর মৃতদেহ এবং তাদের শব ঘিরে অসংখ্য মাছি গিজ গিজ করছে। রেডিও মারফৎ বার্তা পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে এল বিমানসমূহ পেটে ভর্তি করে নিয়ে কীট নাশক ঔষধ ও ডি ডি টি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই সব ভয়াল মাছির পাল ধ্বংস হয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

টেকনিশিয়ানরা যাবতীয় কাঠবেড়ালী ও শ'দুই একই কারণে মৃত খরগোসের মৃতদেহ বিশেষ এক চুল্লী মারফৎ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিল।

এভাবে সেবার মহামারি আতঙ্ক নিরসন করা হল। কিন্তু প্লেগ ডিটেকটিভদের বুঝি শান্তি নেই।

সাধারণের কাছে স্লিপিং সিকনেস রূপে অভিহিত ভয়ংকর এনকেফেলাইটিস রুখতে গিয়ে ১৯৬০ এ বিজ্ঞানীদের নাওয়া-খাওয়া বিশ্রাম ভুলে যেতে হল। যমে-মানুষে বিজ্ঞানিতে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল। সাধারণের প্রায় অজ্ঞাত মহামারী নিয়ন্ত্রকবাহিনী দেশের ৪৮টি স্টেটস্-এর শত সহস্র মশা উৎপাদন কারী স্থানসমূহের মানচিত্র এঁকে ফেললো।

১৯৫৯-তে একমাত্র নিউজার্সিতেই ২১ জন লোক এনকেফেলাইটিস এর কামড়ে প্রাণ হারালো। স্টেটের পর স্টেটে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এই মারক ব্যাধি, ১৯৩৮ ··১৯৪৭···১৯৫৯···

বহু স্টেট সাড়ে চার লক্ষ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করলো এনকেফেলাইটিস রোগবাহী মশাদের নিধনের জন্য। মশারা বুনো পখী থেকে ঘোড়া থেকে মানুষের দেহে এই রোগ ছড়ায়। এ রোগের উপসর্গ অনেকটা পোলিও বা মেনিনজাইটিসের মত। মাথার যন্ত্রণা, পাকস্থলীর সাংঘাতিক গোলমাল, প্রবল জ্বর, আক্ষেপ ও কোমা। শত শত বিমান ভর্তি ডিডিটি এবং কীটনাশক বোমা নিয়ে আক্রমণ শুরু হল মশক নিধনে।

এক সময় "ফ্লাইং স্কোয়ার্ডন" রূপ প্লেগ ডিটেকটিভরা উড়ে গেল অ্যাটলান্টা থেকে অ্যারাকানসাসের এক শান্ত পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামে। কারণ হল, সেখানে নাকি ডজন ডজন স্কুলের শিশু ছাত্র অদ্ভুত এক রোগে রাস্তায় ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ডাক্তারদের সন্দেহ যে এর জন্য দায়ী এক জোড়া পারাকীটস্ পাখি, যারা এসব শিশু ও বালকদের প্যারট ফিভার বা সিটাকোসিস রোগে ধরাশায়ী করে ফেলছে।

সকাল ১০ টায় সংবাদ পেয়ে এপিডেমিক ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিস বেলা একটার সময় প্লেগ ডিটেকটিভের একটি দলকে ঝটিতি বিমানযোগে পাঠিয়ে দিল সেই গ্রামের নিকটবর্তী এক ছোট্ট বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে।

ওরা পৌঁছে দেখলো বাড়তে বাড়তে ৪৩ জন বালক রোগী ভর্তি হয়ে গেছে হাসপাতালে। স্থানীয় লোক, বালকদের অভিভাবক প্রভৃতির অনাবশ্যক ক্রোধ ভীতি বিহ্বলতা, এবং তর্জন-গর্জনের মধ্যে পড়ে গেল প্লেগ ডিটেকটিভরা, যাইহোক সংক্রামিত ৪৩ টি বালকের রক্তের নমুনা এবং সন্দেহজনক সেই প্যারাকিট পাখিদ্বয়কে প্লেনে করে পাঠানো হল অ্যাটলান্টাস্থ লেবরেটারীতে। ডিটেকটিভরা স্থানীয় সমস্ত পোল্ট্রি ফার্ম ও গরু মহিষদের আনার পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো রোগটির উৎস নির্ণয়ের বাসনায়।

কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

টেলিফোনে খবর এল, উক্ত প্যারাকিট পাখিদ্বয় সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক।

স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। ডিটেকটিভরা সকাল ছটা থেকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেল সারা স্কুল বিল্ডিং-এ। সেখানকার খাদ্য…পানীয় …পোষাকাদি এবং পয় প্রণালী প্রভৃতির ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ চেষ্টা চালিয়ে গেল; তাতেও কিছু পাওয়া গেল না।

এর পর ডিটেকটিভদের একটি সংবাদ বা ঘটনা শুনে টনক নড়লো। দেখা গেল গ্রেড ওয়ান টু থ্রি র এই ৪৩টি শিশুদের ক্লাস ঘর সুব্যবস্থিত দোতলায় অবস্থিত। তিনতলা চারতলায় বালকদের কিছু হয়নি, তারা সম্পূর্ণ নিরোগ অবস্থায়ই রয়েছে; ৪৩টি শিশু গাগুলোন, বমি ও প্রচণ্ড ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় তাদের ডেস্ক থেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা সেই স্কুলবাড়ির দোতলার ঘরগুলো সম্ভাব্য ক্লুর জন্যে তন্ন তন্ন তল্লাসী চালিয়ে গেল প্লেগ ডিটেকটিভরা। মরা কোন প্রাণীদেহ প্রাপ্তির আশংকায় স্কুলের উঠোন বাগান খুঁড়ে ফেলা হল…না, তেমন কিছু সন্দেহজনক আবিষ্কৃত হল না।

অতঃপর সন্ধ্যের কিছু পূর্বে সুদূর অ্যাটলান্টা থেকে অবিশ্বাস্য এক সংবাদ এল :

"৪৩টি বালকের সবাই সংক্রামিত হয়েছে বিরল রোগ হিস্টোপ্ল্যাসমোসিস্ (Histoplasmosis). নিকটবর্তী সম্ভাব্য কোন গুহা বা গাছের ফোকরের দিকে তদন্ত কার্য করিয়ে নাও।

প্লেগটাইপে যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্লেগ ডিটেকটিভগণ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে ফেললো। দূষিত ধুলো, যার মধ্যে রয়েছে ঐ বিরল রোগ হিস্টোপ্ল্যাসমোসিস-এর বীজাণু, সেই ধুলো অবশ্যই বাতাস বাহিত হয়ে ঐ স্কুল বিল্ডিং-এর দোতলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে।

অবশেষে তারা বুঝতে পারলো কি জন্যে শুধুমাত্র দোতলার ছাত্রদেরই দেহে এ রোগের আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। ক্ষুদাতিক্ষুদ্র ছত্রাক জাতীয় বস্তু যা সাধারণত প্রবল হওয়ার মধ্যে ছয় ফিট উচ্চতা পর্যন্ত উঠতে পারে, সেই ধুলো ঘুরতে ঘুরতে দোতলার স্কুল ঘরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এ রোগ যেহেতু শুধুমাত্র শিশু বা

বালকদেরই আক্রমণ করে থাকে তাই উক্ত ধুলো শিক্ষক তথা বয়স্কদের আক্রান্ত করতে পারেনি।

সারারাত্রি ধরে চাঁদ যখন মেঘাবৃত হয়ে গেছে প্লেগ ডিটেকটিভরা স্কুল বিল্ডিং-এর নিকটবর্তী পর্বত সংকুল বনাঞ্চলের চড়াই পথে উঠে গেল। বিশালকায় সার্চলাইট জ্বলে উঠলো বনাঞ্চলকে প্রায় দিনের মত করে। কিন্তু কোথাও তারা কোন গুহার অস্তিত্ব পেল না। কে জানে এই অসংখ্য বৃক্ষ শ্রেণীর কোনটির ফোকরের মধ্য থেকে উক্ত বিষাক্ত ফাংগাসচূর্ণ উড়ে আসছে বিরল সেই রোগ সংক্রমণে।

তদন্তকার্য সফলতা লাভ করলো না। তাদের মনে পড়লো ১৯৫১-তে ইলিনইসের দুটি শিশু কয়েক ঘন্টার জন্য আটকে পড়েছিল একটি গাছের কোটরে। একদল উদ্ধারকারী তাদের নিয়ে আসে চরম অসুস্থ্য অবস্থায়। উপসর্গ: বমি, বাহ্যি এবং সামান্য প্রলাপ। রোগটি হল, হিস্টোপ্ল্যাসমোসিস।

পেরুর লিমাতে ৫৬ জন বালক ও বয়স্ক লোক আউলস্ গুহা নামক একটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে গিয়ে একই রোগে আক্রান্ত হয়।

আরকানসাসের এক গুহায় দিয়ে ২৪ জন যুবকও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। গুহাটি অচিরে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানেও সঠিক কারণটিকে খুঁজে না পেলেও, ক্লাশ ঘরে জালদিয়ে ঘিরে দিয়ে এবং অপরাপর প্রতিষেধক নিয়ে সেবার এ রোগকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।